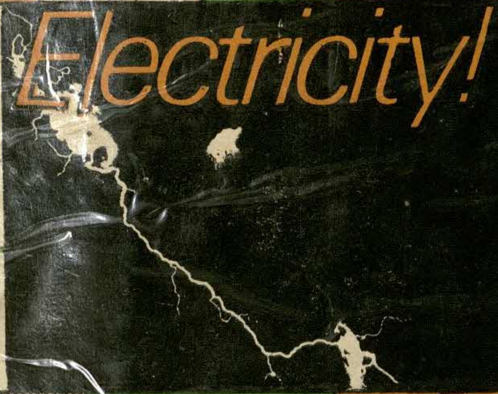


আবিষ্কারের কাহিনী



সুধাংশু পাত্র



আবিষ্কারের কাহিনী

[প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় একত্রে]

১০৭জন আবিষ্কারকের ও আবিষ্কারের কাহিনী

সুধাংশু পাত্র

পাত্র'জ পাবলিকেশন

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় ১৩৮৫

দ্বিতীয় সংস্করণ :
ভাদ্র ১৩৮৬

পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত

তৃতীয় সংস্করণ
১লা বৈশাখ ১৩৮৯

প্রকাশক :
শ্রীমানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশান
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীজয়দেব আড়ু
জয় তারা প্রেস
৩৫/সি, গোরাচাঁদ বোস রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

পঁচিশ টাকা

সূচীপত্র

[প্রথম খণ্ড]

[দ্বিতীয় খণ্ড]

[তৃতীয় খণ্ড]

প্রথম খণ্ড

আর্কিমিদিসের আবিষ্কার

অনেক-অনেক দিন আগেকার কথা।

তখনও ভগবান যীশু জন্ম নেননি ধরার বুকে। তাঁর জন্মের প্রায় আড়াইশ বছর আগে গ্রীস দেশে সাইরাকিউস নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা হিয়ারো ছিলেন বড্ড খাম খেয়ালি আর খুঁতখুঁতে। কাউকে বড় একটা বিশ্বাস করতেন না। তার ওপর তিনি ছিলেন আবার ভয়ানক অত্যাচারী।

রাজা হিয়ারো মাথায় যে মুকুটটি পরতেন, সেটি ছিল অত্যন্ত সেকেলে ধরনের। আদৌ পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর। ভাল মুকুট না হলে কি রাজাকে মানায়?

তাই ঠিক করলেন হিয়ারো খুব চমৎকার একটা মুকুট গড়াবেন। কিন্তু কাকে দেবেন এই কাজের ভার?

অনেক ভেবে চিন্তে একদিন ডেকে পাঠালেন রাজ্যের সর্দার স্যাক্‌রাকে। খবর পেয়ে ছুটে এলো বুড়ো স্যাক্‌রা। ধনুকের মত বাঁকা বেতো কোমরটাকে একটু সোজা করে জোড়হাতে দাঁড়াল রাজার পায়ের কাছটিতে। রাজা তাকে চিনতেন না। জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কে হে?

পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বুড়ো স্যাক্‌রা বলল : আজ্ঞে, আমি স্যাক্‌রাদের সর্দার হুজুরের আদেশে ছুটে এসেছি। রাজা বুড়োকে দেখলেন ভাল করে। বললেন : সাত দিনের মধ্যে আমার একটা সোনার মুকুট চাই। যেমন তেমন হলে চলবে না। এত সুন্দর হতে হবে যে, পৃথিবীর কোন রাজা মাথায় দেওয়া তো দূরের কথা চোখেও পর্যন্ত দেখেনি, এমন মুকুট।

ফোকলা মুখে হাসল বুড়ো সর্দার। রাজার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল : এ আর এমন কি শক্ত কাজ মহারাজ? হুজুর যাতে খুশী হতে পারেন তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

রাজা পুনরায় বললেন : মনে থাকে যেন, সময় মাত্র সাতদিন। নইলে তোমার গর্দান যাবে।

রাজাকে প্রণাম করে চলে গেল স্যাক্‌রাদের সর্দার। ঠিক সাতদিনের মাথায় হাজির করল ভারি চমৎকার একটা মুকুট। কি তার জৌলুস! সূর্যের আলোতে এমন ঝলমল করতে লাগল যে, রাজসভায় যারা বসেছিল তাদের সবার চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। স্যাক্‌রার তারিফ করল সবাই।

রাজাও হলেন বেজায় খুশী। কিন্তু তাঁর সে খুশীর ভাব বেশিক্ষণ টিকল না। নিমেষে মুখটায় অন্ধকার নেমে এল। স্যাক্‌রা সোনার সঙ্গে খাদ মেশায়নি তো?

সারাদিন আর সারারাত ধরে চিন্তা করলেন রাজা। পরদিন সকালে মন্ত্রীকে ডেকে বললেন : শুনেছেন বোধ হয়, গতকাল স্যাক্‌রাদের সর্দার আমাকে একটা মুকুট দিয়ে গেছে?

মন্ত্রী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। গোমড়া মুখে রাজা বললেন ; আপনি একবার পরীক্ষা করে দেখুন দেখি, মুকুটের সোনাটা খাঁটি কি না? একটু থেমে আবার বললেন শুনেছি স্যাক্‌রারা নাকি ভয়ানক ঠক। মায়ের গহনা থেকেও সোনা চুরি করে। তবে হ্যাঁ মুকুটটা ভাঙা চলবে না। ওটা আমার ভারী পছন্দ।

মন্ত্রী মহা চিন্তায় পড়লেন। পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন : ঠিকই শুনেছেন সম্রাট। তবে সোনাদানার কারবার তো আমি করিনা। আমি কেবল বুঝি রাজনীতির মার প্যাঁচ। রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিতদের উপর ভারটা চাপিয়ে দিন। স্যাক্‌রাদের কারচুপি যদি থাকে অবশ্যই তাঁরা ধরে ফেলবেন।

রাজা ভেবে দেখলেন মন্ত্রীর কথাই ঠিক। সেইদিনই ডেকে পাঠালেন রাজ্যের যত পণ্ডিতদের। পণ্ডিতরা মুকুটটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন আর প্রশংসায় মুখিয়ে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন : প্রশংসা

করতে আপনাদের ডাকা হয়নি আমি শুধু জানতে চাই মুকুটটার সোনা খাঁটি কি না?

এবার রীতিমত ভাবনায় পড়ল পণ্ডিতেরা। কারও কারও চোখের সামনে রাশি রাশি সরষের ফুল ফুটে উঠল। ঘন ঘন নস্য নিতে লাগলেন সবাই। মুহূর্তে এক পিপ নস্য কোথায় উড়ে গেল, কিন্তু বুদ্ধি খুলল না কারুরই। সর্বশেষে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন বুড়ো পণ্ডিতটি। কণ্ঠস্বরে একরাশ মধু ঢেলে দিয়ে বললেন: এ বড় কঠিন কাজ মহারাজ। যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, একমাত্র বিজ্ঞানীরাই এর সব সমাধান করতে পারেন।

রাজা তৎক্ষণাৎ দূর করে দিলেন পণ্ডিতদের, ডেকে পাঠালেন বিজ্ঞানী বন্ধু আর্কিমিদিসকে। রাজার মুখে সব কথা শুনে আর্কিমিদিসও থ' হয়ে গেলেন। খাঁটি সোনা চেনার উপায় তাঁরও জানা ছিলনা। তবুও সরাসরি না বলতে পারলেন না। তিনি ভালভাবেই জানতেন, রাজারা অনেকটা কসাইদের মত আদর দিয়ে প্রতিপালন করেন, আবার গলায় ছুরিও বসান। অনেক ভেবে বললেন আর্কিমিদিস: এমন বিদ্যে আমার নেই মহারাজ। কয়েকটা দিন সময় দিন, উপায় একটা খুঁজে বার করবই।

রাজা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন: তোমাকে আমি একমাস সময় দিলাম। সময়ের মধ্যে যদি বলতে না পার তাহলে শাস্তি তোমায় অবশ্যই পেতে হবে।

চিন্তিত মুখে বাড়ী ফিরলেন আর্কিমিদিস।

একমাস থেকে একটি একটি করে দিন কমতে লাগল। সমাধানের কোন পথ না পেয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা ভয়ানকভাবে বেড়ে গেল। সে কী ভাবনা! খেতে বসলে ভাবেন, এমন কি লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ভাবতে ভাবতে কয়েকদিনের মধ্যে শরীরটা শুকিয়ে একেবারে দড়ি হয়ে গেল।

রোজ একটা বড় চৌবাচ্চার জলে স্নান করতেন আর্কিমিদিস। সেদিন

স্নান করার সময়ও জলে বসে ভাবছিলেন মুকুটের কথা। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়ল চৌবাচ্চার জলের দাগের উপর। স্নানের আগে জলের দাগ যেখানে ছিল এখন অনেক উপরে উঠে গেছে। নিজের শরীরটাকে বেশ হালকা বলে মনে হচ্ছিল তৎক্ষণাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। ভাবলেন, কোন বস্তুকে জলে ডোবালে সে কিছু না কিছু জল অপসারণ করবেই। রাজার মুকুটটাকেও যদি জলে ডোবান যায় তাহলে সেও জল অপসারণ করবে। আবার ঐ অপসারিত জলের ওজন এবং মুকুটের ওজনের তুলনা করলে মুকুটের ঘনত্ব পাওয়া যাবে! খাঁটি সোনাকে জলে ডুবিয়ে তার ঘনত্ব নির্ণয় করে মুকুটের ঘনত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অবশ্যই বোঝা যাবে মুকুটে খাদ কতটুকু আছে।

আনন্দে চৌবাচ্চা থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলেন আর্কিমিদিস পরনের কাপড়ের কথা তাঁর মনে রইল না। বিবস্ত্র অবস্থাতেই ছুটলেন রাজসভায়। সারা রাস্তাটা বকতে বকতে চললেন 'ইউরেকা' 'ইউরেকা' অর্থাৎ "আমি পেয়েছি" "আমি পেয়েছি"। রাস্তার লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তাঁর দিগম্বর মূর্তি দেখে সবাই ভাবতে লাগল আর্কিমিদিস বুঝি পাগল হয়ে গেছেন।

রাজসভায় হাজির হয়ে খুশীতে একেবারে উপচে পড়লেন আর্কিমিদিস। তাঁকে দেখে রাজার মাথাটা লজ্জায় নুয়ে পড়ল। ভাবভোলা বন্ধুটিকে তিনি ভালভাবেই চিনতেন। তাই উচ্চ বাচ্য না করে পাশের এক কর্মচারীকে কী যেন সঙ্কেতে বললেন আর কর্মচারীটি সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাপড় এনে জড়িয়ে দিন আর্কিমিদিসের কোমরে।

অতি সহজেই রাজার মুকুটের মীমাংসা হয়ে গেল। অধিকন্তু এক মহাসত্যও ধরা পড়ল মানুষের চোখে। সত্যটি হল 'কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে জলে অথবা অন্য কোন তরলে ডোবালে বস্তু তার নিজ আয়তনের সমান জল কিংবা তরল অপসারণ করবে। নিয়মিত করার ফলে বস্তুর যে পরিমাণ ওজনের হ্রাস হয়, অপসারিত জলের ওজনও ঠিক ততখানি।

এই সত্য আবিষ্কারের ফলে আর্কিমিদিস জগতে অমর হয়ে আছেন। দু হাজার বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তবুও তাঁর দেওয়া সুত্রের এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। অথচ একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবিষ্কৃত হয়েছিল সূত্রটি।

আর্কিমিদিসের মৃত্যু কাহিনীটি বড় করুণ ও মর্মস্পর্শী। তাঁর জীবনের শেষভাগে স্প্রার্টার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী সাইরাকিউস অধিকার করল। তারা খোঁজ করতে লাগল আর্কিমিদিসকে। কিন্তু সারা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁর দেখা পেলনা।

একদিন শহর থেকে বহুদূরে একজন সৈনিক দেখতে পেল, গাছতলায় বসে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ খড়িমাটি দিয়ে আপনমনে কি সব হিজিবিজি লিখছেন। সৈনিকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল আর্কিমিদিসের কথা।

লোকটি একবারও মুখ তুললেন না! পূর্বের মতই অঙ্ক কষতে লাগলেন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সৈনিকের। খাপ থেকে তলোয়ারটা খুলে নিয়ে এগিয়ে এল কাছে। হাতখানা চেপে ধরে বলল: আমার কথার জবাব না দিলে এই মুহূর্তে তোমায় হত্যা করব। এবারও তাকালেন না লোকটি। বরং বিরক্ত হয়ে বললেন: সরে দাঁড়াও, আমার অঙ্ক মুছে যাবে।

চোখের পলকে লোকটির ধড় থেকে মাথা নেমে গেল। এই লোকটি আর কেউ নয় স্বয়ং আর্কিমিদিস। স্পার্টার রাজার কাছে সংবাদটি পৌঁছতে তিনি 'হায়' 'হায়' করে উঠেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ আর্কিমিদিসকে বলে, "স্থিতি বিদ্যার জনক।"

ঘড়ি আবিষ্কারের আগে

আজ থেকে প্রায় পাঁচ-শ বছর আগে ইতালি দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক মস্ত বড় বিজ্ঞানী। নাম তাঁর গ্যালিলিও। গ্যালিলিওর মত এত বড় বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। আর্কিমিদিসকে যেমন স্থিতিবিদ্যার জনক বলা হয়, তেমনই গ্যালিলিওকে বলা হয় গতিবিদ্যার জনক।

গ্যালিলিওর বয়স তখন সতের কি আঠার হবে। তিনি রোজ বিকেলে গির্জায় যেতেন প্রার্থনা করতে। সেকালে বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা ছিলনা। রাতে আলো পেতে হলে লণ্ঠনে তেল দিয়ে জ্বালতে হত, নতুবা মোমবাতির-সাহায্য নিতে হত। বড় বড় বাড়ীতে বিশেষ করে ঝাড় আলো জ্বালানোর রীতিই ছিল প্রচলিত। তাতে তেলের পরিবর্তে মোমবাতি বসাতে হত।

গ্যালিলও যে গির্জায় প্রার্থনা করতেন সেখানে ছিল একটা মস্তবড় ঝাড়। কড়ি-কাঠ থেকে ঝুলন্ত ঝাড় আলোটিতে পঁচিশটি মোমবাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল।

চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন গ্যালিলিও। সন্ধ্যা হতেই চাকর এসে ঝাড়টা নামিয়ে আলো জ্বেলে আবার উপরে তুলে দিয়ে গেল। লম্বা দড়িতে ঝুলছিল বলে নাড়াচাড়া পেয়ে ঝাড়টা ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত দুলতে লাগল আর এক কর্কশ শব্দ উঠতে লাগল ক্যাঁর—ক্যাঁর—ক্যাঁর। এই ঘটনার দৈনিক পুনরাবৃত্তি হত! বিচ্ছিরি শব্দটা শুনে প্রতিদিনের মত সেদিনও বিরক্ত হয়ে চোখ খুললেন গ্যালিলিও। ভাবলেন, যতক্ষণ আলোটা দুলতে দুলতে স্থির না হচ্ছে ততক্ষণ প্রার্থনা করা যাবে না। হাঁ করে তাকালেন উপরের দিকে। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন হঠাৎ কি হল, ঐ ঝাড়টার দোলার ছন্দ গ্যালিলিওর

মনকে আচ্ছন্ন করে বসল। যেন ধারনা হল, ঝাড়টা ওপাশে গিয়ে ফিরে আসতে প্রতিবারে একই সময় লাগছে। এই ধারণা ঠিক কিনা জানার জন্য গ্যালিলিও হাতের নাড়ী টিপে ধরলেন। নাড়ীর স্পন্দন হিসেব করে আরও আশ্চর্য হলেন। প্রতিটি দোলন সম্পন্ন করতে একই সংখ্যক বার নাড়ীর ধুকধুকানি হচ্ছে।

প্রার্থনা সেদিন মাথায় উঠল। গ্যালিলিও ছুটলেন বাড়ীতে। কোত্থেকে একটা সীসার বল যোগাড় করে সরু সুতোয় বেঁধে দোলাতে লাগলেন তারপর আনলেন ভারি হালকা উভয় ধরনের বল। সবগুলোকে তুলিয়ে তুলিয়ে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, সুতোর দৈর্ঘ্য ঠিক থাকলে ভারি কিংবা হালকা যে কোন ধরনের বলকে দোলাতে থাকলে একবার দোলন সম্পুর্ণ করতে একই সময় লাগে।

আমরা বর্তমানে যে ঘড়ির ব্যবহার করি, তার আবিষ্কার হয়েছে গ্যালিলিও ঐ সাধারণ পরীক্ষাটিকে কেন্দ্র করে। সে যুগেও মানুষ সময় নিরূপন করত খড়ি দিয়ে। কিন্তু সে ঘড়ি আজকের মত ছিল না। যাঁরা ভারি পণ্ডিত, তাঁরা তৈরী করে নিতেন ঘড়ি, বালি ঘড়ি কিংবা জল ঘড়ি। বড় মজার ছিল সে ঘড়ি। দিনের বেলায় আকাশে সূর্যকে দেখা গেলে একটা ফাঁকা জায়গায় লাটি পুঁতে রাখা হত। লাঠির ছায়া দেখে মানুষ সময় জেনে নিতেন। মেঘলা অথবা রাতের বেলায় সময় ঠিক করা হত বালি ঘড়ি কিংবা জল ঘড়ির সাহায্য।

তুটি পাত্র নেওয়া হত। একটাতে থাকত বালি অথবা জল। সেটিকে ছিপি বন্ধ করে মুখটা নীচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখা হত। ছিপিতে থাকত ছোট্ট একটি ছিদ্র আর তলায় বসান রাখা খালি পাত্রটা। ছিদ্র পথে বালি বা জল ঝুর ঝুর করে পড়ত খালি পাত্রে। তাতে আবার দাগ কাটা থাকত। কোন্ দাগ পর্যন্ত জল কিংবা বালি জমেছে তা দেখে সময় ঠিক করা হত। কখনও বা জলের টবে ফুটো যুক্ত একটি ঘটি বা বাটি ভাসিয়ে দিলে বিশেষ সময় অন্তে ফুটো দিয়ে জল ঢুকতে ঢুকতে জলে ডুবে যেত। এই ধরণের কত হরেক রকমের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন

ব্যবস্থাই সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারত না। গ্যালিলিওর দোলক আবিষ্কারের পরই পেণ্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কৃত হয়।

গ্যালিলিও বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। তাদের মধ্যে আবিষ্কারটি এককালে সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল সেটি হচ্ছে, পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমা সংক্রান্ত।

গ্যালিলিও ছিলেন ভাল একজন কারিগর। বুদ্ধি খরচ করে একদিন তৈরী করে ফেললেন একটি দূরবীন। তাঁর আবিষ্কৃত দূরবীনটিকে আজও আমরা বলে থাকি গ্যালিলিয়ান টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপের বাংলা নাম হচ্ছে দূরবীন—যা দিয়ে দূরের জিনিসকে কাছে দেখা যায়।

দূরবীন তৈরী করে গ্যালিলিও তাকিয়েছিলেন আকাশের দিকে—ঐ তারায় ভরা নীল আকাশ, যেন বিরাট এক নীল চাঁদোয়ার গায়ে অসংখ্য ফুলের চুমকি। অনেকের মতে অযুত বৈচিত্র্যে ভরা নীল আকাশটা ছেলেবেলা থেকেই গ্যালিলিওকে মুগ্ধ করত, আর তার প্রকৃত স্বরূপটা জানার জন্য মন তাঁর আকুলি-ব্যাকুলি হত। দূরবীন চোখে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই গ্যালিলিও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

আজ আমরা প্রত্যেকে জানি, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু গ্যালিলিওর সময় পর্যন্তও মানুষের ধারণা ছিল অন্যরকম। মানুষ ভাবত, পৃথিবী আছে স্থির আর তার চারপাশে বিধির অমোঘ বিধানে সূর্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নিয়ত পরিভ্রমণ করছে। অবশ্য গ্যালিলিওর আগে কোপার্নিকাস নামে একজন দার্শনিক পণ্ডিত এই ধারণার মূলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মানুষের চিরাচরিত ধারণার মূলে আঘাত করতে সাহস হন নি। গ্যালিলিও কোনরকম চিন্তা না করেই বলে বেড়াতে লাগলেন : পৃথিবীর মানুষ—তোমরা শুনে যাও সবাই! পৃথিবী সম্বন্ধে কোন ধারণা তোমাদের নেই। আমরা যা দেখি সব ভুল। সূর্য চারপাশে ঘুরছে না, পৃথিবীই ঘুরছে সূর্যের চারপাশে।

এমন অদ্ভুত কথা কোনদিন মানুষ শুনবে, এ যেন কল্পনারও অগোচর ছিল। কী বলছেন গ্যালিলিও? নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে না

মানুষ? পাগল হয়ে যাননি তো গ্যালিলিও? গ্যালিলিওর কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন সাধারণ মানুষ। সূর্য দেবতা বলে কথা। তাঁকেই নাকি উপহাস করছেন গ্যালিলিও? দেব রোষে দেশটা না ছারখারে যায়! গ্যালিলিও আবার পণ্ডিত বলে পরিচিত। কিন্তু যিনি দেবতাকে মানেন না তিনি পণ্ডিত হলেন কেমন করে? গ্যালিলিওর মুখে ছেলেমানুষের মত কথা শুনে কেউ ভয় দেখাল, কেউ গালিগালাজ করল, কেউ ভর্ৎসনা করল।

কিন্তু ধর্মযাজকেরা সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না গ্যালিলিওকে। তাঁরা রাজদরবারে গিয়ে গ্যালিলিও সম্বন্ধে সত্যমিথ্যে চার কথা বানিয়ে রাজা এবং রাজপুরুষদের কান ভারী করলেন। গ্যালিলিওর মুখ বন্ধ না করলে সারা রাজ্যে যে বন্যা, মড়ক, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নেমে আসবে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিলেন এবং একক পাপেও যে কোটি কোটি লোকের সর্বনাস হতে পারে সে সম্বন্ধে শাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করলেন।

ধর্মযাজকদের ব্যাখ্যা শুনে কুপিত হলেন রাজা। তৎক্ষণাৎ আদেশ করলেন: এই মুহূর্তে ধরে নিয়ে এস সেই শয়তান গ্যালিলিওকে। আমি এক্ষুনি তার বিচার করব।

রাজাদের পেয়ে লাঠিসোটা নিয়ে চররা ছুটল গ্যালিলিওকে ধরতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গ্যালিলিওকে পিঠমোড়া করে বেঁধে টেনে নিয়ে এল রাজসভায়। রাজা কটমট করে তাকালেন তাঁর দিকে। রাগে তাঁর সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন: প্রজাদের মুখে শুনলাম, তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছে সূর্য ঘোরে না পৃথিবীই ঘুরছে?

শান্ত ও সংযত সুরে বললেন গ্যালিলিও: আজ্ঞে মহারাজ? ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রাজার এবং রাজপুরুষদের। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে বললেন রাজা: তুমি কি বলতে চাও আমাদের সবার চোখ খারাপ, আর একা তোমার চোখই ভাল? এতকাল ধরে মানুষ যা দেখে আসছে, শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, সব ভুল?

গ্যালিলিও বললেন ঃ সবই ভুল। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে বলে আমরা স্র্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি।

রাজা আরও রেগে উঠলেন। বললেন ঃ তোমার বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। হয় তোমার কথা প্রত্যাহার করে নাও, নয় জেল-খানায় পচে মর।

নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন গ্যালিলিও। এক সময় রাজার আদেশে তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হল এবং একখানা সাদা কাগজ তাঁর সামনে ধরা হল। রাজা বললেন ঃ তুমি ঐ সাদা কাগজে সই কর—জীবনে এমন কথা আর কোনদিন উচ্চারণ করবে না।

বাধ্য হয়ে সই করে দিলেন গ্যালিলিও। একটু পরে যেন আপন মনেই বলে উঠলেন ঃ আপনারা বিশ্বাস করছেন না বটে, কিন্তু পৃথিবী সত্যিই ঘুরছে।

এমন বিপজ্জনক মানুষকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয় ভেবে রাজা তাঁকে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিলেন জেলখানায়। পরে প্রাণের ভয়ে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন গ্যালিলিও। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গেছিলেন এবং ছুর্বিসহ জীবন যাপন করতে হয়েছিল তাঁকে।

একটা বড় বিস্ময়ের কথা, যে বছর গ্যালিলিওর জন্ম হয়েছিল ঠিক সেই বছরই আর এক মহামানবের আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীতে তিনি মহাকবি সেক্সপিয়র এবং যে বছর গ্যালিলিও লোকান্তরিত হন সেই বছরই পৃথিবীর বুকে জন্ম নিয়েছিলেন মহাবিজ্ঞানী নিউটন। সেক্সপিয়র, গ্যালিলিও এবং নিউটন, এঁরা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

।। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ।।

এক সন্ধ্যায় বিজ্ঞানী নিউটন বসেছিলেন তাঁর সাধের বাগানটিতে। মনের ভেতরে কত হরেক রকমের চিন্তা। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। আর ভাবছিলেন পৃথিবীর কথা।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণে ভরে গেল দেশ। নিউটনের মাথায় এল আরও নানা চিন্তা। পৃথিবী যদি নিজ মেরুদণ্ডের উপর অনবরত পাক খাচ্ছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি না কেন? কেন আমরা ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছি না? যদি সে পাক খায়, তাহলে সূর্যের চারদিকে না ঘুরে অন্যত্রও তো ঘুরতে পারত?

এমনই কত এলোমেলো চিন্তা নিউটনের মনের কোণে ভিড় করছিল, আবার পরক্ষণে বুদবুদের মত কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় অদূরে ঝুপ করে একটা শব্দ উঠল। সেই শব্দে নিউটনের চিন্তারাশিও ছিন্ন হয়ে গেল। নিউটন দেখলেন, একটা পাকা আপেল গাছ থেকে খসে পড়ল মাটিতে। অনেকক্ষণ ধরে তিনি তাকিয়ে রইলেন ফলটির দিকে। এবার তিনি ভাবলেন অন্য কথা, আপেল কেন মাটিতে পড়ে? শূন্যে যখনই অবলম্বনচ্যুত হয়ে পড়ল তখন সে মাটির দিকে না এসে উপরে উঠে গেলেও তো পারত? অথবা উপরে নীচে কোথাও না গিয়ে শূন্যে ঝুলে থাকতেও পারত? কেন আকাশের দিকে ঢিল ছুঁড়লে পুনরায় পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে? সেও তো মহাকাশে বিলীন হয়ে যেতে পারত?

সে কী ভাবনা? কত দিন—কত রাত—কেটে গেল। অবশেষে

নিউটন ঠিক করলেন, নিশ্চয়ই পৃথিবীর নিজস্ব একটা অদৃশ্য আকর্ষণ বল কাজ করছে পৃথিবী পৃষ্ঠের বস্তুরাশির উপর। মমতাময়ি জননীর মত পৃথিবী তার বুকের উপর অবস্থানকারী অতি ক্ষুদ্র ধুলিকণা থেকে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ড, জীবজন্তু, গাছপালা সবাইকে আটকে রেখেছে। সে আকর্ষণ বল ছিন্ন করে কেউই বাহিরে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারছে না। নিউটন এই আকর্ষণ বলের নাম দিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

আরও মনে মনে ঠিক করলেন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিশ্বের প্রতিটি পদার্থ একে অপরকে আকর্ষণ করছে। সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আছে আকর্ষণ, চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়ে উভয়কে টানছে। কেবল দূরত্ব বেশী হওয়ার জন্য একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে না। দূরত্ব বজায় রেখে কেবল একে অপরের চারপাশে পরিভ্রকণই করে চলেছে। এই শক্তিকে বলা হয় মহাকর্ষ শক্তি।

আপেলের গল্পটা অনেকে কিংবদন্তীমূলক বলে মনে করে থাকেন। সে যাই হোক না কেন, মহামতি নিউটন মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সূত্রের আবিষ্কর্তা! নিউটন সম্বন্ধে এত বেশী গল্প প্রচলিত আছে যে, সবগুলো একত্রিত করলে বিরাট এক বই হয়ে যাবে। তোমরা বড় হলে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবে। পদার্থ বিদ্যা, জ্যোতি বিদ্যা এবং অঙ্কশাস্ত্রের গুরু তিনি। আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাঁরই হাতে।

॥ জলের কথা ॥

ক্যাভেণ্ডিস ছিলেন নাম করা বিজ্ঞানী। কিন্তু তাঁর মত লাজুক বড় একটা দেখা যেত না। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে লজ্জা, পথ হাঁটতে লজ্জা, কাজ করতে লজ্জা। লজ্জা যেন পেয়ে বসেছিল তাঁকে। মেয়েদের সামনে তিনি কখ্খনো বেরুতে পারতেন না। দূর থেকে কোন মহিলাকে আসতে দেখলে অথবা হঠাৎ কোন মহিলা সামনে পড়ে গেলে ছুটে এসে

দরজায় খিল দিতেন। এত ভয় ছিল তাঁর! বাঘ সিংহকে বুঝি মানুষ এত ভয় করে না।

এমন যিনি লাজুক তিনি আর করবেন কী? রাতদিন ঘরের কোণে বসে থাকতেন আর বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতেন। বড় একটা সখ ছিল তাঁর। গবেষণাগারে বসে বসে রাতদিন কেবল গ্যাসই তৈরি করতেন। তৈরি করতেন অক্সিজেন গ্যাস, হাইড্রোজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, এমনই কত হরেক রকমের গ্যাস! মাঝে মাঝে করতেন কী? দুটো তিনটে গ্যাস একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তার ভেতর আগুন জ্বালাতেন, কখনও বা প্রখর সূর্যালোকে ফেলে রাখতেন, আবার কখন গ্যাস মিশ্রনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাতেন।

একবার একটা খেয়াল চেপে বসল তাঁর মাথায়। দুভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেনকে একটা বদ্ধ কাচনলে প্রবেশ করিয়ে তার ভেতর চালিয়ে দিলেন বিদ্যুৎ। হঠাৎ আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, কাচ নলের গায়ে জমেছে বিন্দু বিন্দু জল।

জল এল কেমন করে? একবার নয়, দু বার নয়, বেশ কয়েক বারই পরীক্ষাটি করে দেখলেন। না; ভুল তাঁর হয়নি। দেখতে পেলেন দুভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেন মিশিয়ে মিশ্রণের ভেতর বিদ্যুৎ পাঠালে জলই উৎপন্ন হয়।

ক্যাভেণ্ডিসের সময় পর্যন্তও মানুষের ধারণা ছিল, জল একটা মৌলিক পদার্থ। অর্থাৎ জলকে বিশ্লেষণ করলে কেবল জল ছাড়া অন্য পদার্থ পাওয়া যাবে না। ক্যাভেণ্ডিসের এই পরীক্ষাটি মানুষের চিরাচরিত ধারণাকে ওলোট পালট করে দিল।

স্বীকার অবশ্য কেউ হঠাৎ করে নিলেন না। ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষাটি হাতে নাতে করে তবেই সন্দেহ মোচন করলেন সবাই। অতি উৎসাহীরা আবার জলের সঙ্গে অম্ল মিশিয়ে বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করলেন। সবিস্ময়ে তাঁরাও দেখলেন, দুটি তড়িদ্বারের একটিতে উঠলে হাইড্রোজেন আর একটিতে অক্সিজেন। উৎপন্ন হাইড্রোজেনের আয়তন সর্বক্ষেত্রেই

অক্সিজেনের দ্বিগুন হল। এবার সন্দেহ নিরসন হল সবার। জগৎ এই প্রথম জানতে পারল, জল কোন মৌলিক পদার্থ নয়। ওটি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক।

বিজ্ঞানীরা এখন যত্নবান হলেন জলের স্বরূপ নির্ণয়ে। অচিরে তাঁরা প্রমান করলেন, জল হাইড্রোজেনের একটি সুস্থিত অক্সাইড। যেহেতু হাইড্রোজেনের প্রতীক H এবং অক্সিজেনর প্রতীক O তাই হাইড্রোজেনের এই স্বাভাবিক অক্সাইডটির ফরমূলা ঠিক হল H_2O।

জলের ফরমূলা H_2O কে নিয়েও এক দেশে এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেবার ইংরাজ মিশনারীরা তুরস্কে গেলেন খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে। তখন তুরস্ক দেশের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় হামিদ। সেখানকার লোকে ইংরাজী জানতেন না। আবার শিক্ষার প্রসারও ছিল না তেমন সে দেশে। মিশনারীরা ভাবলেন, যদি দেশের লোককে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে খৃষ্ট ধর্মের মত এমন মহান ধর্মের প্রতি জনসাধারণ আকর্ষন বোধ না করে পারবেন না।

মিশনারীরা তখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। শিক্ষাদানের ব্যাপারে কোন পরিশ্রমিক তো গ্রহণ করলেনই না অধিকন্তু ছাত্রদের বিনা পয়সায় বইও সরবরাহ করতে লাগলেন। কিন্তু এ দেশে তো বই ছিল না! তাই উপায় না পেয়ে মিশনারীরা দেশ থেকে রাশি রাশি বই আনাতে লাগলেন।

কত হরেক রকমের বই আসতে লাগল। ধর্মশাস্ত্রের বই তো এলই, তাছাড়া এল কত দর্শনের বই, সাহিত্যের বই, ইতিহাসের বই বিজ্ঞানের বই—যেমন বইএর পাহাড় আসতে লাগল। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা এই সব বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো। বইতে খারাপ কিছু লেখা থাকতেও তো পারে অথবা বইএর নাম করে মিশনারীরা স্বদেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্রও তো আমদানি করতে পারেন! কিন্তু মজার কথা, কোন কর্মচারীই ইংরাজী জানত না। কেবল অক্ষর গুলো একটু আধটু চিনতে পারতো।

একদিন এক কর্মচারী একখানা বিজ্ঞানের বই দেখে চমকে উঠল।

বইতে বেশ কয়েক জায়গায় লেখা আছে H_2O। কর্মচারীটি ধরে নিল, H_2O রাজা দ্বিতীয় হামিদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের একটা সঙ্কেত। সঙ্গে সঙ্গে বইটি বগলে চেপে ছুটল রাজ দরবারে।

রাজা তখন পাত্র মিত্র নিয়ে সভা আলো করে বসে আছেন। কর্মচারিটি হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছল রাজসভায়। রাজাকে কুর্নিশ করে বইটা খুলে ফেলল তাঁর সামনে। চোখ দুটো গোল গোল করে বলল : সর্বনাশ হয়েছে মহারাজ। চারিদিকে শুধু চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র। রাজা কিছু বুঝতে না পেরে ভ্রু দুটো একবার কোঁচকালেন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : তার মানে? তুমি যা বলতে চাও, খোলসা করেই বল। দেরী হলে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে।

কর্মচারীটি বলল : আমি ঐ মিশনারীদের কথাই বলতে চাই মহারাজ। তারা আপনারা রাজ্য বাস করছে, আবার আপনারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

রাজা যেন একটু আঁতকে উঠলেন। এমনিতে তিনি মিশনারীদের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই কর্মচারীর কথা তাঁর বেশ মনে ধরল। মনের ভাবকে যথা সম্ভব গোপন রেখে বললেন : কোন প্রমাণ আছে তোমার কাছে?

দাঁতগুলো বার করে বলল কর্মচারী : প্রমাণ আমার হাতের কাছে মহারাজ। এই দেখুন –

বইখানির যেখানে H_2O লেখা ছিল সেইখানে আঙ্গুল দেখিয়ে আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল সে। এদিকে ওদিকে একবার তাকিয়ে আবার বলল : ওরা যত চালাক হোক না কেন, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

রাজা কর্মচারীর কথা আদৌ বুঝতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে বললেন : তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ভাল করে বুঝিয়ে বল তোমার বক্তব্য।

সবিনয়ে বলল কর্মচারী : এই দেখুন মহারজ, বইতে লেখা আছে H_2O।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন : তাতে হয়েছে কী ?

হেসে কর্মচারী বলল : অপরাধ নেবেন না মহারাজ, ওরা এই সঙ্কেতের মাধ্যমে আপনার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইছে। ক্রুদ্ধ রাজা সিংহাসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। পাত্র মিত্র যারা বসে ছিল তারা কাঁপতে লাগল থর থর করে! রাজা চিৎকার করে বললেন : তুমি কী বুঝেছ তাড়াতাড়ি খুলে বল। আমি এই মুহূর্তে মিশনারীদের শাস্তি বিধান করব।

এবার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল কর্মচারীটি : মহারাজ। আপনার নাম দ্বিতীয় হামিদ। হামিদ নামকে ইংরাজীতে লিখতে গেলে প্রথমে আসবে এইচ অক্ষর। এইচ এর নীচে দুই বসিয়ে তারা দ্বিতীয় হামিদকে অর্থাৎ আপনাকে বোঝাতে চাইছে। তার পাশে আবার শূন্য বসিয়ে আপনার অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এবং আপনাকে সরিবে দেওয়ার মতলব।

পাত্র মিত্ররা কর্মচারীরা বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। সমবেত ভাবে বলে উঠল : হ্যাঁ মহারাজ! আমরাও বিচার করে দেখলাম কর্মচারীর কথাই সত্যি। মিশনারীদের শাস্তি দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

রাজারা সাধারণতঃ একটু কান পাতলা গোছের হয়ে থাকতেন। বিশেষ করে পারিষদদের কথা কখনও ফেলতেন না। রাজা দ্বিতীয় হামিদ এবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে আদেশ দিলেন, রাজ্যে যত মিশনারী আছেন সবাইকে যেন অবিলম্বে জেলখানায় পুরে দেওয়া হয়। বিচার হবে পরে।

বন্দুক উঁচিয়ে ছুটল পুলিশবাহিনী। যেখানে যত মিশনারী পেল, সবার হাতে হাত কড়া পরিয়ে পুরে ফেলল জেলখানায়।

বেচারা মিশনারীরা! মানুষের ভাল করতে গিয়েও কারাবরণ করলেন। শেষে রাজরোষের কারণ বুঝতে পেরে দেশ বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী গুণীকে এনে প্রমাণ করলেন, H_2O অর্থে অপদার্থ রাজা দ্বিতীয় হামিদ নন—অতি সাধারণ একটি পদার্থ, জল তার নাম।

॥ সেলুলয়েড ॥

এক ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী।

ফরম্যালডিহাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থকে নিয়ে রোজ গবেষণা করতেন। টেবিলে সব সময় মজুত থাকত বেশ কয়েক বোতল ফরম্যালডিহাইড এবং আরও বহু রাসায়নিক পদার্থ।

একদিন সকালে তিনি গবেষণায় তন্ময় হয়ে আছেন। এমন সময় চাকর এসে বলল : স্যার ; আপনার খাবার !

মুখ না তুলেই বললেন বিজ্ঞানী : ঐ খানে রেখে যাও ; একটু পরে খেয়ে নেব। চাকরটি বিজ্ঞানীর স্বভাব ভালভাবেই জানত। স্মরণ করিয়ে না দিলে খেতে মনেই থাকে না। তাই সেদিনের প্রাতঃরাশ একবাটি ছানা চাকরটি তাঁর হাতের কাছে টেবিলে ঢাকা দিয়ে, কয়েকটা উপদেশ প্রদানের পর নিজের কাজে চলে গেল। তার কথাগুলো বিজ্ঞানীর কানে গেল কিনা বোঝা গেলনা।

জানালার কাছে অনেক আগে থেকে চুপচাও বসে ছিল এক হুলো বেড়াল। দৈনিক সকালে বোধ হয় বিজ্ঞানীর খাবারের কিছু ভাগ পেত সে। ইয়া গোঁফ জোড়া ফুলিয়ে আজও সে বসে ছিল ছানার প্রতীক্ষায়।

অনেকক্ষণ কেটে গেল তবুও বিজ্ঞানী খাওয়ার নাম করছেন না। বোধ হয় বিরক্ত হয়ে থাকবে হুলোটা। মালিকের অপেক্ষা না রেখে একাই সেই উপাদেয় বস্তুটির সৎকার করতে মনস্থ করল।

বিজ্ঞানীর কিন্তু ছানার দিকে আদৌ খেয়াল ছিল না। আপন মনে ফরম্যালডিহাইডের গুণাগুণ পরীক্ষা করে চলেছিলেন। হুলোটা পা চেপে চেপে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। তারপর 'ম্যাঁও' 'ম্যাঁও' বার দুই ডাক দিয়ে প্রকাণ্ড এক হাই তুলে বসে পড়ল সেখানে। বুঝিবা শেষবারের মত বিজ্ঞানীকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। তাতেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না বিজ্ঞানী। অগত্যা তাকে লাফিয়ে পড়তে হল টেবিলের উপর। কিন্তু

দুর্ভাগ্য তার! ছানাটাতো কপালে জুটলই না অধিকন্তু লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোতলগুলো উল্টে এমন এক ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠল যে বিজ্ঞানীরও তন্ময়তার ঘোর কেটে গেল। বিপদ দেখে বেড়ালটা লেজ তুলে লাগাল ভোঁ দৌড়।

বিজ্ঞানী প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেছিলেন। পরে ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে পেরে হায়—'হায়' করে উঠলেন। বোতলগুলো তো ভেঙ্গেছেই, ছানাটাও ফরম্যালডিহাইডে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ছানাটার জন্য অবশ্য বিশেষ দুঃখ হচ্ছিল না তাঁর। দুঃখ হল অকারণে অনেক টাকার ফরম্যালডিহাইড নষ্ট হয় গেল বলে। রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানী।

বেড়ালটা ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে "ম্যাঁও" "ম্যাঁও" করছিল। বিজ্ঞানীর যত রাগ সব পড়ল তারই উপর। ছুটে গিয়ে হাতের কলমটাকেই ছুঁড়ে মারলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কলমটা বেড়ালের গায়ে না লেগে কোথায় ছিটকে পড়ল। আরও ক্ষেপে উঠলেন বিজ্ঞানী! হুলো তখন একেবারে নির্বিকার। আড় চোখে বিজ্ঞানীকে একবার তাকিয়ে গা চাটতে লাগল। ভদ্রলোক আর কী করবেন? অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বোতলগুলোর দিকে।

এক সময় মনে পড়ল তাঁর ছানার কথা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ছানাটাকে সরিয়ে না ফেললে চাকরকে আবার কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

কিন্তু একি? ছানাটাকে তুলতে গিয়ে বিজ্ঞানী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। সিমেন্টের মত জমাট বেঁধে গেছে ছানাটা। হাত দিয়ে খুব টিপলেন; তারপর মেঝেতে আছাড় দিলেন। তবুও ভাঙ্গলো না। বিজ্ঞানী ভেবে দেখলেন, ছানার সঙ্গে ফরম্যালডিহাইড মেশালে সেটি জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে উঠে, ছানাটিকে আর ফেলে দেওয়া হলনা এবং চাকরের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল কিনা তাও কেউ বলতে পারেন না। তবে এই আকস্মিক ঘটনা থেকে বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করলেন সেলুলয়েড জাতীয়

জিনিস। কৃতিত্বটা বিজ্ঞানীর অথবা সেই দুষ্টু হুলোটার সে বিচার পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া গেল।

আজকাল সেলুলয়েডের জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। আবার একই পদ্ধতিতে তৈরী হচ্ছে বিদ্যুতের কুপরিবাহী বেকেলাইট জাতীয় সিমেন্ট। দুঃখের কথা এসব জিনিস কেনার সময় আমাদের বিজ্ঞানী বা বেড়াল কারও কথা মনে পড়ে না। আরও দুঃখের কথা বেড়ালটাকে কেউ একটা পুরস্কারও দেননি। আবার বিজ্ঞানীও হুলোটার জলযোগের জন্য কিছু ছানার বরাদ্দ করেছিলেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই।

॥ অ্যালুমিনিয়াম ॥

এককালে ইতালির আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে এক ধরণের জিনিস পাওয়া যেত। ভারি বাহারে ছিল তার রঙ। প্রাচীন রোমানরা জিনিসটির নাম রেখেছিলেন অ্যালুমেন।

তখনকার দিনে মানুষ অ্যালুমেনকে ব্যবহার করতো ওষুধ রূপে, কখনও বা রঙ তৈরির কাজে। মাটির অথবা ধাতব পাত্রের গায়ে অ্যালুমেনের প্রলেপ দিলে খুব ঝক্‌ঝকে ও সুন্দর দেখাত। রোমানরা দীর্ঘকাল ধরে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন অ্যালুমেনের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল তাঁদের।

রোমানদের পরও কেটে গেল শত শত বছর। কত দেশের কত জ্ঞানী গুণী এগিয়ে এলেন অ্যালুমেনের পরিচয় পাঠ করতে। না ; কেউ বলতে পারলেন না অ্যালুমেন কি বস্তু। শেষে এল বিলেতের নাম করা বিজ্ঞানী ডেভির কাল। তাঁরও দৃষ্টি পড়ল একদিন ঐ অ্যালুমেনের উপর।

শুভক্ষণে বসে গেলেন গবেষণা করতে। এবারও কেটে গেল কত দিন। অবশেষে পৃথিবীর মানুষ ডেভির কাছ থেকে জানতে পারল, অ্যালুমেন কোন মৌলিক পদার্থ নয়। ওটি অক্সিজেন এবং একটি নতুন ধাতু দিয়ে গড়া। সে ধাতুটির নাম আজও পৃথিবী জানেনা। অনেক ভেবে চিন্তে

ডেভি ধাতুটির নাম দিলেন অ্যালুমিনিয়াম। অর্থাৎ অ্যালুমেনের মধ্যে ধাতুটি থাকে বলে এই ধরণের নাম করণ।

মজার কথা হল, ডেভি ধাতুটির নাম করণ করলেন বটে কিন্তু আসল জিনিসটি যে কেমন, কেউ চোখে দেখতে পেলনা। কেবল মানুষ জানল, পৃথিবীর মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম নামেও একটি ধাতু আছে। বিজ্ঞানীদের উৎসাহ এবার ভয়ানক ভাবে বেড়ে গেল। যে কোন উপায়ে নিষ্কাশন করে দেখতে হবে ধাতুটি কালো না ধলো, ভারি না হালকা! ডেভি নিজেও বাদ পড়লেন না।

কিন্তু হায়! ডেভির কালও কেটে গেল। গড়িয়ে চলল বছরের পর বছর। কতদিন পরে কত গবেষকের গবেষণাকে অবলম্বন করে. অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে ওয়রস্টেডর ও হবলার নামে বিজ্ঞানী বহু বছরের তপস্যায় নিষ্কাশন করলেন একটু খানি অ্যালুমিনিয়াম। এই ধাতুটিকে দেখে আশ্চর্য হল মানুষ। এত সুন্দর চক্‌চকে ও হালকা এই ধাতু! ক্ষুধিতের দৃষ্টি ফুটে উঠল সবার চোখে। অ্যালুমিনিয়ামকে হস্তগত করতে পারলে সভ্যতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যাবে। কিন্তু আবিষ্কৃত হয়েও পৃথিবীর বেশীর ভাগ মানুষের কাছে অপরিচিত থেকে গেল। কেউ পারলেন না অ্যালুমিনিয়ামের সহজতম নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে। ওয়রস্টেডর ও হবলারের পদ্ধতিতে এ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করলে দাম পড়ত সোনা কিংবা প্ল্যাটিনামের চেয়েও বেশী। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হতে লাগল তবুও ধাতুটির শৈশবাবস্থা কাটলনা।

সে যুগে এ্যালুমিনিয়ামের কৌলিন্যের কথা মনে হলে আজকে হাসি পায়। অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করতেন কেবলমাত্র রাজরাজারা। শোনা যায় ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ে ভোজ সভায় নিজে ব্যবহার করতেন আলুমিনিয়ামের কাঁটা চামচ আর তাঁর অতিথিরা ব্যবহার করতেন সোনার।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ে বোনাপার্ট এই ধাতুটির

প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করতেন। বিজ্ঞানীদের প্রায়ই উৎসাহিত করতেন সস্তায় আলুমিনিয়াম নিষ্কাশন করার জন্য। মজবুত ও হালকা এই ধাতুটির দ্বারা যুদ্ধের সরঞ্জাম বানাবেন, এই ছিল আশা। নেপোলিনেয়র সে আশা পূর্ণ হয়নি।

বিজ্ঞানরাও বুঝেছিলেন ধাতুটির সম্ভাবনা প্রচুর। পৃথিবীর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে কত রকমের অ্যালুমিনিয়াম আকরিক। এমনকি ভূস্তরের মাটিতেই আছে শতকরা সাত ভাগের মত। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায় আলুমিনিয়ামের প্রধান আকরিক বক্সাইট। আছাড়া চুনি, পান্না, মরকত মণি, নীলকান্ত মণি, বৈদুর্যমণি, গোমেদ মণি প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন পাথর ও আলুমিনিয়ামের আকরিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

ধাতু নিষ্কাশনের সনাতন পদ্ধতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বক্সাইট বা অ্যালুমিনাকে কোক কয়লার সঙ্গে পোড়ালে হালকা ধাতু বলে অ্যালুমিনিয়ামের বাষ্প পাওয়া যায়, সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে অ্যালুমিনাই ফের‌ৎ পাওয়া যায় কিন্তু মূল ধাতুটি পাওয়া যায় না।

ধাতু নিষ্কাশনের আর এক হাতিয়ার হল বিশুদ্ধ আকরিকের বিগলিত অথবা ঘণীভূত দ্রবণকে বিদ্যুৎদ্বারা বিশ্লিষ্ট করা। কিন্তু এ হাতিয়ারও ব্যর্থ হয়েছিল তাঁদের। বিদ্যুৎ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে দেখা গেল, অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে উঠল অন্য জিনিস। উপায় না পেয়ে বিজ্ঞানীরা এক রকম ছেড়ে দিয়েই বসলেন।

কতদিন পরে আমেরিকার ও বার্লিন কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসে ধাতুবিদ্যা পড়াচ্ছিলেন জনৈক অধ্যাপক। কথায় কথায় আলুমিনিয়ামের কথা উঠলে অধ্যাপক দুঃখ করে বললেন: আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অ্যালুমিনিয়ামকে সস্তায় নিষ্কাশন করা গেল না। প্রচুর যদি উৎপাদন করা সম্ভব হত তাহলে মানব সভ্যতার অ্যালুমিনিয়াম ইতিহাসে উন্মোচিত হত এক নতুন দিগন্ত।

ঈষৎ হেসে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে তিনি পুনরায় বললেন: তোমরা যদি কেউ সস্তায় আলুমিনিয়াম নিষ্কাশন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে

পার তাহলে একদিকে যেমন রোজগার করবে প্রচুর অর্থ, অপরদিকে লাভ করবে জগৎজোড়া সুনাম। ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন কুড়ি বাইশ বছরের এক তরুণ। চার্লস মার্টিন হল তাঁর নাম। অধ্যাপকের উপদেশ তাঁর মনে দারুন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ভাবলেন, উপায় একটা তিনি বার করবেনই। সেইদিনই ঢুকলেই তিনি গবেষণাগারে।

কতদিন কেটে গেল, তাঁকেও বুঝি শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়! কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য্য উৎসাহ ও তাঁর অদম্য। বিগলিত অ্যালুমিনিয়াম বা তার ঘন দ্রবনকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় না বলে দ্রবণের সঙ্গে এটা ওটা মিশিয়ে বিদ্যুৎ চালাতে লাগলেন।

একদিন সবিস্ময়ে দেখলেন, ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারে থরে থরে জমে উঠেছে ধব্ ধবে্ সাদা এক ধরণের ধাতু। নিজের চোখকে যেন হঠাৎ বিশ্বাস হল না তাঁর। অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের আবিষ্কর্তা রূপে তিনি কি যশোমাল্য পরতে পারবেন?

ধাতুটিকে নিয়ে বেশ কয়েকবারই পরীক্ষা করলেন। না, অ্যালুনিয়ামই বটে। এবার নিশ্চিত হলেন তিনি! কিন্তু কি মিশিয়েছিলেন?

কতক্ষণ পরে মনে পড়ল তাঁর! বিশুদ্ধ অ্যালুমিনার সঙ্গে ক্রায়োলাইট এবং ফ্লোরস্-পার নামে অ্যালুমিনয়ামের অপর দুটি আকরিক মিশিয়েছিলেন। বুঝতে পারলেন অ্যালুমিনা সরাসরি বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় না। ক্রায়োলাইটকে মেশালে আগে ঐটিই বিয়োজিত হয়ে আলুমিনিয়াম উৎপন্ন করে। তারপর ক্রায়োলাইটের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ যত কমতে থাকে তাতেই সে অ্যালুমিনিয়ামকে করে নেয় অ্যালুমিনা থেকে এবং পুনরায় ক্রায়োলাইটে রূপান্তরিত হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে আলুমিনা সোজাসুজি বিয়োজিত না হয়ে ক্রায়োলাইটের মাধ্যমে বিয়োজিত হয়।

বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের সাধনা একদিন চার্লস মার্টিন হলের হাতে সিদ্ধিলাভ করল। কত ভাবে মানুষ নিয়োজিত করল অ্যালুমিনিয়ামকে গৃহস্থালী জিনিসপত্রতো বটেই, অ্যালুমিনিয়াম পেণ্ট তৈরী করে লোহার

উপর প্রলেপ দিয়ে লোহাকে মরিচার হাত থেকে রক্ষা করল। ওষুধ পত্রের এবং সিগারেটের মোড়ক তৈরী করল, বৈদ্যুতিক তারে লাগাল অ্যালুমিনিয়ামকেথার্মাইট পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম, গুঁড়োর সাহায্য নিয়ে রেল লাইনের পাতকে জোড়া লাগাল। শুধু কি তাই ! অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্য ধাতু মিশিয়ে যে সঙ্কর ধাতু তৈরি করল তা দিয়ে বানালে উড়োজাহাজের গাত্রাবরন, যুদ্ধাস্ত্র, অ্যালুমিনিয়াম ব্রোঞ্জ প্রভৃতি কত হরেক রকমের জিনিস।

চার্লস মর্টিন হলের এই আসামান্য কীর্তির জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল। একই সময়ে হেঁরো নামে এক ফরাসী বিজ্ঞানী ও হলের পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু মার্টিন হলের একটু পরে বলে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি। তবে তাঁর কৃতিত্বের কথা বিজ্ঞান চিরকাল স্মরণ করবে।

॥ পাইরোসের ম ॥

একদিন বিজ্ঞানী ষ্টুকে কাচ তৈরির উপাদান গুলো একসঙ্গে মিশিয়ে জ্বলন্ত উনানে পোড়াচ্ছিলেন। হাতের কাছে ছিল গবেষনার অন্যান্য সরঞ্জাম। কাজ করতে করতে এমনভাবে মেতে উঠলেন যে উনানের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন।

রাতের আঁধার তখন ঘনিয়ে উঠেছে। চাকর এসে অনেক ডাকাডাকি করতে চৈতন্য হল বিজ্ঞানীর। মনে মনে বোধ হয় বিরক্তও হয়ে উঠেছিলেন 'ষ্টুকে। ধমকের সুরে বললেন ঃ এত চিৎকার করছ কেন, ডাকাত পড়েছে বুঝি কোথাও !

লজ্জিত হল চাকরটি। সবিনয়ে বলল : আজ রাতে যে আপনার নেমন্তন্নে যাওয়ার কথা স্যার।

ষ্টুকের হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাড়ীতে আজ নিমন্ত্রণ। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী তাঁর বাড়ী বয়ে এসে অনেক পীড়াপীড়ি করে গেছেন। না গেলে অত্যন্ত ব্যথা পারেন তাঁরা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত ন'টা বেজে গেছে। আর দেরী করা উচিত নয় ভেবে তাড়াতাড়ি পোষকটা পাল্টে নিয়ে স্বহস্তে গবেষণাগারের দোর বন্ধ করে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন। উনানের কথা একবারও মনে পড়ল না তাঁর।

বন্ধুর বাড়ীতে গল্প গুজব চলল অনেক রাত পর্যন্ত। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী উভয়ে খুব খাতির করে খাওয়ানেন ষ্টুকে। বাড়ী ফিরতে রাত বারটা বেজে গেল। এত রাতে গবেষনাগারে ঢুকতে আর প্রবৃত্তি হলনা— সটান শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই উনানের কথা মনে পড়ল। যেই মনে পড়া অমনি গিয়ে ঢুকলেন গবেষণাগারে। দেখলেন, উনান কখন নিভে গেছে। যে জিনিসগুলি চাপিয়েছিলেন সেগুলো রূপান্তরিত হয়ে গেছে কঠিন এবং স্বচ্ছ এক পিণ্ডের আকারে। হায় হায় করতে লাগলেন ষ্টুকে। সামান্য একটি ভুলের জন্য কতকগুলো পয়সা অযথা জলে গেল।

কি আর করবেন ষ্টুকে? পিণ্ডটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আফসোস করতে লাগলেন। এক সময় পিণ্ডটা হাত ফসকে ঠুক করে পড়ে গেল মাটিতে। একটু বিস্মিত হলেন ষ্টুকে। ওটা কাচ বলেই ধারণা ছিল তাঁর। মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা।

ষ্টুকে এবার মাটি থেকে তুলে নিলেন পিণ্ডটাকে। তারপর মেঝেতে দিলেন সজোরে এক আছাড়! বিস্মিত ষ্টুকে দেখলেন, পিণ্ডটাতো ভাঙ্গলোই না অধিকন্তু বলের মত লাফিয়ে উঠল। রীতিমত চটে উঠলেন ষ্টুকে। তাঁর রোখ চাপল, যেমন করে হোক ওটিকে তিনি ভাঙ্গবেনই।

টেবিলের উপর পড়েছিল এক হাতুড়ি। তাই দিয়ে পিণ্ডটার উপর বসাতে লাগলেন দমাদম ঘা। না, কিছুতেই ভাঙ্গতে পারলেন না ষ্টুকে। একেবারে ক্ষেপে উঠলেন তিনি। মুখে কি বিড়বিড় করতে লাগলেন আর চালাতে লাগালেন হাতুড়ী। সর্বাঙ্গ নেয়ে উঠল ঘামে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, তবুও হাতুড়ী চালানোর বিরাম নেই। কি এক কাণ্ড হয়েছে ভেবে ছুটে এল চালানোর বিরাম নেই। কি এক কাণ্ড হয়েছে ভেবে ছুটে এল চাকর বাকর ছুটে এল পাড়া-পড়শীরা। অনেক কষ্টে তারা নিরস্ত করল ক্ষ্যাপা বিজ্ঞানী ষ্টুকে। বুঝি বা মাথায় জল ঢালতে হয়েছিল সেদিন। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতেই বিরক্তি ষ্টুকে পিণ্ডটাকে ফেলে দিয়ে এলেন রাস্তার জঞ্জাল স্তূপের মধ্যে।

কয়েকদিন পরে ষ্টুকের মাথায় এল এক নতুন চিন্তা। ভাবলেন ওটি কেমন ধরণের জিনিস? এমন আশ্চর্য জিনিস কোনদিন দেখেছেন বলে মনে হল না। লোহার মত শক্ত অথচ অ্যালুমিনিয়ামের মত হালকা। দেখতে ও আবার কাচের মত স্বচ্ছ।

জঞ্জালের স্তূপ সরিয়ে পুনরায় পিণ্ডটাকে নিয়ে এলেন গবেষণাগারে। নানা প্রকার অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রয়োগ করেও দেখলেন কোন কিছুই বস্তুটির সঙ্গে ক্রিয়া করছে না। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত করেও গলাতে পারলেন না।

বিজ্ঞানী ষ্টুকে বস্তুটির নামকরণ করলেন পাইরোসেরাম। আমেরিকার মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা এই অদ্ভুত ও কার্যকারী বস্তুটির সন্ধান পেয়ে একরকম লুফে নিলেন। পাইরোসেরাম আবিষ্কৃত না হলে মহাকাশযান এবং মহাকাশ পাড়ি জমান এত দ্রুত সম্ভব হত না।

।। গ্যালভানির আবিষ্কার ।।

অনেকদিন আগেকার কথা।

ইতালির বলোনা শহরে বাস করতেন এক অধ্যাপক। নাম তাঁর

লুইজি গ্যালভানি। অধ্যাপক স্ত্রী লুসিয়া ছিলেন অত্যন্ত রুগ্না যখন তখন অসুখে ভুগতেন। তাহলেও গ্যালভানি বড্ড ভালবাসতেন স্ত্রীকে। লুসিয়ার অসুখ করলে নিজেই তাঁর পরিচর্যা করতেন এবং রান্না করে খাওয়াতেন। বাড়ীতে চাকর বাকর রাখার মত পয়সা ছিলনা তাঁদের।

ইতালি দেশের লোক ব্যাঙের ঝোল খেতে বড় ভালবাসতেন।

আমাদের দেশে গাঁয়ের ছেলে মেয়েরা মাঠে একটা কই মাছ কুড়িয়ে পেলে যেমন খুশী হয়ে থাকে, ঠিক তেমনই খুশী হয় ওদেশের ছেলেমেয়েরা যদি মাঠে একটা সোনা ব্যাঙ কুড়িয়ে পায়। গ্যালভানি ব্যাঙের স্যুপ রান্না করে নিজে খেতেন আর স্ত্রীকে খাওয়াতেন।

একদিন টেবিলের উপর ছুরি দিয়ে একটা বড় সোনা ব্যাঙের চামড়া ছাড়াচ্ছিলেন গ্যালভানি। সেখানে আবার পড়েছিল বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরঞ্জাম। সেদিনের মানুষ কেবলমাত্র ঘর্ষণজাত তড়িতের সন্ধান পেয়েছিল। অনেক বিজ্ঞানীর মত গ্যালভানিও ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তড়িৎকে নিয়ে পরীক্ষা করতেন।

সেদিন কি একটা প্রয়োজনে গ্যালভানি চামড়া ছাড়ান ব্যাঙ এবং ছুরিটকে টেবিলে ফেলে রেখে বাহিরে বেরিয়ে এলেন। লুসিয়া ভাবলেন, স্বামীকে কষ্ট না দিয়ে ব্যাঙটা তৈরী করে নিজেই রান্নাটা চাপিয়ে দেবেন। নিজেকে একটু সুস্থ বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

ঘরে ঢুকে ব্যাঙটাকে তুলতে গিয়ে চমকে উঠলেন লুসিয়া। মরা ব্যাঙের পা দুটো থর থর করে কাঁপছে। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন লুসিয়া। বুঝিবা একটু ভয়ও পেয়েছিলেন।

বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটতে ছুটে গিয়ে ডেকে আনলেন গ্যালভানিকে। গ্যালভানিও ব্যাপার দেখে প্রথমটা থমমত খেয়ে গেলেন; অনেক ভেবে ঠিক করলেন, বিদ্যুতের জন্য এমন অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটছে।

কয়েকদিন ধরে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে মরা ব্যাঙকে নিয়ে পরীক্ষায় মেতে উঠলেন গ্যালভানি। মরা ব্যাঙগুলোর ছাল ছাড়িয়ে তাকে নুন জলে ডুবিয়ে লোহার রডের নীচে তামার তারে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন। কাছে

রাখলেন আর একটা লোহার রড। যাতে অল্প হাওয়া পেলে ব্যাঙের পা দুটো দুলে লোহার রডকে স্পর্শ করতে পারে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ব্যাঙের পা যত বারই লোহাকে স্পর্শ করছে ততবারই ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে। ব্যাঙের ভিজে পা লোহার রড এবং তামার তার এই তিনটি জিনিস মিলে একটা তড়িৎ কোষ উৎপন্ন করছিল বলে এমন অসম্ভব কাণ্ডটি ঘটেছিল।

গ্যালভানি কিন্তু এই ঘটনার ব্যাখ্যা সেদিন ঠিকমত প্রদান করতে পারেননি। তবে কী খেয়াল চাপল তাঁর মাথায়, যেখানে সেখানে রাস্তা-ঘাটে, জনসমক্ষে এবং স্কুল-কলেজে ছেলেদের সামনে মরা ব্যাঙ নাচীয়ে মজা দেখাতে লাগলেন। লোকে হাঁ করে দেখতো কেউ বা মনে করত গ্যালভানির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আড়ালে আবডালে অনেক ঠাট্টা করে বলতে লাগল, "ব্যাঙ নাচান অধ্যাপক।" গ্যালভানি ওসব কথায় আদৌ কান দিতেন না। কেবল মনের খেয়ালে ব্যাঙ নাচিয়ে খেলা দেখাতেন। এমন একটি পরীক্ষায় যে বড় রকমের গুরুত্ব থাকতে পারে, একথা কেউই ভাবেনি সেদিন।

তারপর কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। লুসিয়া একদিন মারা গেলেন। শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন গ্যালভানি। রাজনৈতিক ঝড় ঝাপটাও তাঁকে শেষ জীবনে ভয়ানক ভাবে ক্ষতবিক্ষত করল। প্রতিকূল পরিবেশে গ্যালভানি নিজেই ভুলে গেলেন পরীক্ষাটির কথা।

কিন্তু বিজ্ঞান ভুললো না তাঁর ব্যাঙ নাচানোর ঘটনাটিকে। গ্যালভানির মৃত্যুর অনেক-অনেক দিন পরে বিজ্ঞানীরা নতুন করে চিন্তা করতে বসলেন গ্যালভানির সেই ব্যাঙ নাচান পরীক্ষাটিকে নিয়ে। বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টায় তড়িৎ বিজ্ঞানের এক নতুন দিকের পরিচয় পেয়ে গেল মানুষ। বিজ্ঞানী ভোল্টা পরীক্ষাটি অনুসরণ করে আবিষ্কার করে বসলেন তড়িৎকোষ। একদিন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন রেশমি সুতোর ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে নামিয়ে আনলেন মাটিতে প্রমাণ করলেন, আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মানুষের তৈরি বিদ্যুতের কোন প্রভেদ নেই।

একে একে আবিষ্কৃত হতে লাগল কত তথ্য ! মানুষ পরিশেষে বিদ্যুৎকে ক্রীতদাসে পরিণত করে অসাধ্যকে সাধন করল। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এ সবের মূলে আছে গ্যালভানির পত্নীপ্রেমের সেই সুন্দর ও ছোট্ট কাহিনীটুকু।

প্ল্যাষ্টিক সার্জারী

আইভারসন নামে ছিলেন এক ডাক্তার। হাসপাতালে রোগীদের দেহে অস্ত্রোপচার করতেন। খুব নাম করা শল্যচিকিৎসক। কত দূর থেকে কত রোগী আসতো তাঁর কাছে।

একবার এক তরুণী এল। মুখটা তার বসন্তের দাগে ভর্তি। মুখের শ্রী বলতে একেবারেই নেই। অনেক কান্নাকাটি, অনেক অনুনয় করল মেয়েটি, যাতে সে তার মুখশ্রী ফিরে পায়। বড় দয়ার শরীর ডাক্তারের। সোজাসুজি না বলতে পারলেন না। কথা দিলেন, তার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেনই।

বেশ কয়েকদিন গত হয়ে গেল। ডাক্তার কেবল রাতদিন চিন্তা করলেন মেয়েটির কিছু উপকার করা যায় কি না ! কিন্তু কোন হদিসই পেলেন না।

একদিন রাস্তায় বেড়াচ্ছিলেন ডাক্তার আইভারসন। মনের কোণে ভাসছিল সেই তরুণীটির কুৎসিত ও করুণ মুখখানি। যেন একটু আনমনাও হয়ে পড়েছিলেন। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। আইভারসন হাঁটছেন আর ভাবছেন। হঠাৎ এক রেড ইণ্ডিয়ান যুবকের কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর চমক ভাঙ্গলো।

পথের একপাশে বসেছিল যুবকটি। ডাক্তারকে সম্বোধন করে বলছে ঃ হাতে উল্কি কাটাবেন স্যার ?

ডাক্তার কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে। যুবকটি উৎসাহ বোধ করল। পুনরায় বলল ঃ বিশ্বাস করুন স্যার, আমি ভালো উল্কি কাটাতে

পারি। পছন্দ না হলে উল্কি তুলে দেব।

ডাক্তার একটু বিস্ময় বোধ করলেন। বললেন: উল্কিকে তুলে দেওয়া যায় নাকি?

: যায় বৈকি। মৃদু হেসে জবাব দিল যুবক।

ডাক্তার কৌতুহলী হয়ে কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন: আমার দুহাতে উল্কি কাটিয়ে দাও! কিন্তু একটা হাতের উল্কি তুলে দিতে হবে। যুবকটি ঈষৎ হেসে ডাক্তারের দু হাতে উল্কি কাটাতে লাগল। এক সময় উল্কি কাটান শেষ করে একটা হাতের উল্কির উপর পাথর ঘষতে আরম্ভ করল। ডাক্তার যন্ত্রণায় বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তবুও তাঁকে বাধা দিলেন না বা একটুও মুখ বিকৃত করলেন না। পরন্তু পরম আগ্রহ সহকারে যুবকটির কার্য-কলাপ প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

উল্কির দাগ পরিষ্কার হওয়ার পর ডাক্তারের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বলল: কয়েকদিন পরে খুলে দেখবেন, উল্কির দাগ তো থাকবেই না অধিকন্তু ক্ষতের দাগটাও মিলিয়ে যাবে।

রেড ইণ্ডিয়ান যুবকটির কথা মত কয়েকদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলতেই অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার। ক্ষতস্থানে নতুন চামড়া গজিয়ে দাগটাকে একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এবার যন্ত্রপাতি নিয়ে গবেষণায় বসে গেলেন ডাক্তার। বুঝতে পারলেন, চামড়ারও কয়েকটা স্তর আছে। কোন ক্ষত যদি চামড়ার দ্বিতীয় স্তর অবধি গিয়ে থাকে তাহলে তাকে পরিষ্কার করে দিলেই স্বাভাবিক ভাবে নতুন চামড়া উৎপন্ন করে ক্ষতস্থানকে মসৃণ করে দেবে।

ডাক্তার তাঁর এই নতুন অভিজ্ঞতা প্রথম প্রয়োগ করেলেন, সেই বসন্তের দাগে ভর্তি মেয়েটির মুখের উপর। হাতুড়ে পদ্ধতি তিনি অবশ্য অনুসরণ করলেন না। দস্তুর মত মেয়েটিকে অজ্ঞান করিয়ে অস্ত্রোপচার করলেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর মেয়েটির মুখের ব্যাণ্ডেজ খুলতেই বিস্মিত হয়ে গেলেন ডাক্তার। যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর।

সেই থেকে প্লাস্টিক সার্জারীর সূত্রপাত। আজকাল এই চিকিৎসা পদ্ধতির এত উন্নতি হয়েছে যে, মানুষ কেবলমাত্র পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের দেহ সৌষ্ঠব ফিরিয়ে আনছে না, অকেজো হৃৎপিণ্ড কিংবা চোখকেও বদল করে দিচ্ছে।

॥ স্যাকারিন ॥

একদিন আলকাতরাকে পতিত করে পাওয়া গেল টলুইন নামে একটি যৌগিক পদার্থ। বিজ্ঞানীরা টলুইনের গুণাগুণ জানবার জন্য হলেন বদ্ধ-পরিকর। কত রসায়ন বিজ্ঞানী বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলন। যেমন করে হোক টলুইনের ধর্ম তাঁদের জানতেই হবে।

তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী ফালবার্গও বাদ গেলেন না। তিনিও রাতদিন মুখ গুঁজে গবেষণাগারে পড়ে থাকতেন আর এটা ওটা প্রয়োগ করে দেখতেন কোন ক্রিয়া হয় কিনা!

আলকাতরাকে আমরা সবাই জানি। ভয়ানক বিশ্রী পদার্থ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত এই পদার্থটি। রাস্তায় কিংবা অন্য কোথাও আলকতরা সামনে পড়ে গেলে জড় সড় হয়ে যাই জামা কাপড়ে লেগে যাওয়ার ভয়ে। এত কালো এবং বিশ্রী পদার্থ হলেও আলকাতরার অনেক গুণ। বিজ্ঞানীরা আলকাতরার কত ভালো গুণের যে পরিচয় পেয়েছেন তা লিখে শেষ করা যাবে না। বোধ হয় কবিরা এবং বিজ্ঞানীরাই আসল জহুরী। তাঁরাই কালোর মধ্যে রূপের খনি দেখেন আর কালো কয়লার মাঝে মণি আবিষ্কার করেন।

আলকাতরা পাওয়া যায় কেমন করে?

কাঠ বা কয়লাকে বায়ুবদ্ধ পরিবেশে পোড়ালে যে ধোঁয়া পাওয়া যায়, তাকেই ঘণীভূত করলে অন্যান্য কয়েক রকমের জিনিসের সঙ্গে পাওয়া যায় আলকাতরা।

অনেকদিন পর্যন্ত মানুষ আলকাতরার গুণের কথা জানত না। জঘন্য এই পদার্থটিকে তারা চিরকাল ঘৃণা করে এসেছে। খেয়ালী মানুষ যেদিন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আলকাতরাকে পতিত করল, সেদিন বুঝতে পারল এর রূপ কালো হলে কি হবে গুণে সে মহান। পতিত করতে গিয়েই প্রথম পরিচয় লাভ করল টলুইন।

একদিন সদ্য আবিষ্কৃত টলুইনের গুণাবলী নির্ণয় করার জন্য ফালবার্গ এত মেতে উঠেছিলেন যে খেতেও তাঁর মনে ছিল না। খাওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে যায় দেখে গৃহকর্ত্রী এসে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন। বাধ্য হয়ে ফালবার্গকে উঠতে হল। মুখটা প্যাঁচার মত করে বসে গেলেন খেতে।

বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল মন। মাথায় ঘুরছিল কেবল টলুইনের কথা। খাওয়ার আগে যে হাত ধুতে হয় সে কথাও ভুলে গেলেন বেমালুম ভাবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য! যাকে মুখে তোলেন সেই লাগে মিষ্টি। ফালবার্গ আদৌ মিষ্টি পছন্দ করতেন না বলে খেতে বসে খুব বকাবকি করলেন গৃহকর্ত্রীকে। বিরক্ত হলেন গৃহকর্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন। বললেন: তোমার মুখটাই আজ খারাপ আমি আজকের খাবারে একটুও মিষ্টি ব্যবহার করিনি।

ফালবার্গ বিশ্বাস করলেন না গৃহকর্ত্রীর কথা। দু-চার গ্রাস মুখে পুরে রাগে গর গর করতে করতে উঠে গেলেন গবেষণাগারে। আজকের খাবার খেয়ে তাঁর এত রাগ হয়েছিল যে গবেষণা করতেও তাঁর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

কেটে গেলে কতক্ষণ মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতে ভাবতে লাগলেন গৃহকর্ত্রীর কথা। তিনি যদি মিষ্টি ব্যবহার না করে থাকেন তাহলে এত মিষ্টি এল কোথা থেকে?

খুব করে চিন্তা করতে লাগলেন বিজ্ঞানী। আনমনে কখন ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা পুরে ফেললেন মুখে। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। একি! হাতের আঙ্গুলে এত মিষ্টি কেন? এবার বুঝতে পারলেন গৃহকর্ত্রীর দোষ একটুও নেই। যত দোষ সব তাঁরই। কেননা মনে পড়ল, হাত না ধুয়েই

তিনি খেতে আরম্ভ করেছিলেন। আপন অজান্তে তিনি নিশ্চয়ই এমন একটি জিনিস তৈরী করে ফেলেছেন—যা চিনির চেয়েও শত শত গুণ মিষ্টি।

টেবিলের উপর থরে থরে সাজান জিনিসপত্র গুলোকে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন পরীক্ষা। বিশেষ বেগ পেতে হল না। অল্প সময়ের মধ্যে টের পেলেন সেই আশ্চর্যজনক পদার্থটির। খুশী হলেন ফালবার্গ। টলুইন থেকেই পাওয়া এই মিষ্টি পদার্থটির নাম হল স্যাকারিন।

আজকাল স্যাকারিনের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। রুটি, বিস্কুট চকোলেট, লেমোনেড, সোডাওয়াটার, আইসক্রীম প্রভৃতিতে অল্প বিস্তর স্যাকারিন মেশানো হয়ে থাকে। ওষুধপত্রেও ব্যবহৃত হয় স্যাকারিন। যে সব রোগীর চিনি খাওয়া নিষেধ অথচ মিষ্টি না হলে খেতে পারে না, ডাক্তাররা তাঁদের স্যাকারিন খেতে নির্দেশ দেন। স্যাকারিন শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর নয়। উপকার করে না, আবার অপকার ও করেনা বড় একটা।

ব্লটিং পেপার

ইংলণ্ডে বার্কশায়ার নামে একটি জায়গা আছে। সেখানকার কোন এক কাগজ কলের মালিক একদিন ভয়ানক একটা ভুল করে বসলেন। কাগজ তৈরির জন্য আগে থেকে কাঠের মণ্ড প্রস্তুত করা ছিল। সেই মণ্ডকে কাগজ কলে পাঠানোর আগে তাতে মেশাতে হতো আরও এক ধরণের মণ্ড। তারপর ভারি রোলার চালিয়ে তাকে পাতলা করে কাগজ তৈরি করার কথা।

কলের মালিক সেদিন দ্বিতীয়বার মণ্ড যোগ করতে একেবারেই ভুলে গেলেন। কেবল কাঠের মণ্ডটাকেই পাঠিয়ে দিলেন কারখানায়।

যথারীতি কাগজ তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কাগজ কলের মালিক কাগজের নমুনা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন! এ কী চেহারা হয়েছে

কাগজের ? উপরটা একেবারে খস্‌খসে, লিখতে গেলে কালি চুঁইয়ে যায় ? কতকগুলো মণ্ড অকারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মালিকের গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অনেকগুলো টাকা নষ্ট হয়ে গেল আজ।

মালিক মনকে বোঝালেন ব্যবসায়ে লাভ ক্ষতি দুইই আছে। এখন এই কাগজগুলোকে অন্য কোন কাজে লাগান যেতে পারে কিনা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন।

একদিন হাতে কোন কাজ ছিল না। কলের মালিক সেই কাগজের একখানা টেনে নিয়ে বসলেন। প্রথমে মাড় ঘষে ঘষে দেখতে লাগলেন স্বাবাভিক কাগজের মত হয়ে গেলেই বাজারে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হল না। যতবারই কলম ঠেকালেন ততবারই দেখতে পেলেন লেখা কিছুতেই যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে কলম ফেলে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

এই সময়ে তাঁর নজরে পড়ল কাগজের কিনারাটা কলমের নিবে ঠেকে আপনা হতে কালি শুষে নিচ্ছে। কি ভেবে ভদ্রলোক এক ফোঁটা কালি এবার ফেলে দিলেন কাগজের উপর। দেখলেন কালিটা পড়া মাত্রই কাগজটা শুষে নিল।

ভদ্রলোকের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে গেল। এই কাগজকে লেখার কাজে ব্যবহার না করে কালি শোষণের কাজে ব্যবহার করলে কেমন হয় ? এমনিতে লেখার সময় কখনও কখনও কালি পড়ে গিয়ে কাগজকে বিশ্রী করে দেয়। কালি না শুকালে কাগজের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তাড়াতাড়ি লেখাও যায় না। এই শোষক কাগজের এক টুকরো লেখার কাছে থাকলে অনেক সুবিধে হবে।

মুখে হাসি ফুটে উঠল ভদ্রলোকের। নতুন ধরনের এই কাগজের গুণাগুণ বাজারে ফলাও করে প্রচার করলেন। দেখতে দেখতে বেড়ে উঠল চাহিদা। মাড় না দেওয়া কাগজ তিনগুণ দামে বিক্রি হয়ে গেল। নাম হল ব্লটিং পেপার। আশে পাশে অন্যান্য কলের মালিক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। ব্লটিং পেপার তৈরি করার ফরমুলা তাঁদের জানা নেই।

ইউরিয়া

এককালে মানুষের ধারণা ছিল, জৈব পদার্থ মাত্রই ঈশ্বরের সৃষ্টি। মানুষ কৃত্রিমভাবে তাদের প্রস্তুত করতে পারেনা। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন বার্জিলাসের মত নাম করা বিজ্ঞানী। তিনি তো পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করলেন, জৈব পদার্থ কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াই বিজ্ঞানীদের পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

বার্জিলাসের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাসী ছিলেন সব বিজ্ঞানী। তাছাড়া তাঁর মতবাদের সঙ্গে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টোটলের নামও যুক্ত। এত বড় বড় মানুষের কথা কেমন করেই বা অবিশ্বাস করা যায়? বোধ হয় এই কারণে বিজ্ঞানীরা নিরস্ত ছিলেন কৃত্রিমভাবে জৈব পদার্থ প্রস্তুত করতে।

কয়েকজন তরুণ ছাত্র বার্জিলাসের অধীনে গবেষণা করতেন, তাঁদের একজনের নাম ছিল উইলার। একদিন উইলার অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামে একটি যৌগিক পদার্থকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। কী খেয়াল হল তাঁর! পদার্থটির কিছু অংশ একটা পরীক্ষানলে নিয়ে গরম করতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ নাকে ভেসে এল ইউরিয়ার গন্ধ। বিস্মিত বড় কম হলেন না উইলার। উৎপন্ন পদার্থটিকে নিয়ে বারবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। না; ইউরিয়াই বটে। আপন অজান্তে কখন যে তৈরী হয়ে গেছে সে খেয়াল ছিল না তাঁর।

আমরা জানি, ইউরিয়া প্রাণীর মূত্রে অবস্থান করে। প্রাণীর মূত্র নিঃসন্দেহে জৈব পদার্থ। অথচ তাঁরই গুরুদেব বলে থাকেন, জৈব পদার্থ ঈশ্বর সৃষ্ট, তাকে তৈরি করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে। অকস্মাৎ সারা দেহ মনে এক প্রবল উত্তেজনা অনুভব করলেন উইলার। পরীক্ষানলটি নিয়ে ছুটে গেলেন গুরুদেবের কাছে।

বার্জিলাস তখন গবেষণাগারে বসে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছিলেন। উইলার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন : আপনার কথা ঠিক নয় স্যার, মানুষ জৈব পদার্থকেও কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে।

বার্জিলাস প্রথমটায় বিস্ময় বোধ না করে পারলেন না। তারপর ছেলে-মানুষের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজেই মন দিলেন।

উইলার কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। বললেন : বিশ্বাস করুন স্যার, এই পরীক্ষানলের মধ্যেই আছে ইউরিয়া। আমি এইমাত্র প্রস্তুত করেছি অ্যামোনিয়াম সায়ানেট থেকে।

: পাগল। ইউরিয়া মানুষে তৈরী করতে পারে নাকি?

অবিশ্বাসের স্বর বেজে উঠল বার্জিলাসের কণ্ঠে।

উইলার একটুও দমলেন না। বরং আরও দৃঢ়স্বরে বললেন : আমার কথায় বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করেই দেখুন।

হো হো করে হেসে উঠলেন বার্জিলাস। বললেন : তুমি নিতান্তই ছেলে মানুষ। কী নয় কী একটা তৈরি করেছ। যাও,—পাগলামো না করে কাজে মন দাওগে।

উইলার বার্জিলাসকে আরও বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বার্জিলাস যে সেই এক গোঁ ধরে বসলেন, তা থেকে এক চুলও নড়াতে পারলেন না।

এত সহজে হার মানলেন না উইলার। বয়সে তিনি তরুণ, উৎসাহ ও অদম্য। যা সত্য বলে জেনেছেন, তা তিনি প্রমান করবেনই। গুরুদেবের অবিশ্বাস দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে অকস্মাৎ পরীক্ষা নলটি বার্জিলাসের নাকে চেপে ধরলেন।

—আঃ! বিরক্ত বার্জিলাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কিন্তু গন্ধটা ততক্ষণে নাকে এসে লেগেছে। চমকে উঠলেন একটু। মনে হল ইউরিয়ার গন্ধই পেয়েছেন তিনি। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন উইলারের দিকে। তারপর এক সময় হাত থেকে পরীক্ষা-নলটিকে নিয়ে গন্ধ নিলেন। সেদিন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বুঝতে পারলেন, জৈব পদার্থ ইউরিয়াকে মানুষ কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে।

নিজের মতকে পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন বার্জিলাস। দেশে দেশে প্রচারিত হল ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থকেও মানুষ প্রস্তুত করতে পারে। দলে দলে বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য জৈব যৌগ প্রস্তুত করা যায় কি না পরীক্ষা করার জন্য। তাঁদের প্রচেষ্টায় একে একে আবিষ্কৃত হল কত জৈব অ্যাসিড, কত সুগন্ধি দ্রব্য, কত রঙ, কত ওষুধপত্র। বিজ্ঞানী বুখনার আবার আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন! কোন পদার্থকে গেঁজে ওঠার জন্য তিনি এক ধরণের গুঁড়ো বা আরক তৈরি করে ফেললেন।

বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। একদিন যদি মানুষ কৃত্রিম ভাবে একজন মানুষকে ল্যাবরেটারিতে তৈরি করে নেয় তাতেও আমরা ততখানি আশ্চর্য বোধ করব না, যতখানি সেদিন আশ্চর্য হয়েছিল মানুষ ইউলারকে ইউরিয়া করতে দেখে। অথচ ব্যাপারটা ছিল পুরো আকস্মিক। উইলার জৈব পদার্থ প্রস্তুত করার কোন চেষ্টাই করেননি কিংবা সে মনোভাবও তাঁর ছিল না। অথচ তাঁর আকস্মিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান জগতে এসেছে আলোড়ন। উইলারকে তাই চিরকাল বিজ্ঞান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

বসন্তের টীকা

এক গোয়ালিনী রোজ সকালে ডাক্তার জেনারকে দুধ দিয়ে যেত। ডাক্তার একদিন দেখলেন, গোয়ালিনীর হাতের আঙ্গুলে ফোস্কা পড়ার মত এক বিশেষ ধরণের দাগ। আচমকা সেই দাগটিকে দেখে একটু চিন্তিত হলেন ডাক্তার জেনার।

তাঁর চিন্তার একটা বিশেষ কারণ ছিল।

সে সময় সারা লণ্ডন শহর বসন্ত রোগে ভুগছে! শহরে এমন একটা পরিবার নেই, যেখানে বসন্তের করাল ছায়া স্পর্শ করেনি। অথচ এই গোয়ালিনীর বসন্ত হচ্ছে না। সে কি ঐ ফোস্কা পড়া দাগের জন্য?

কিছুদিন আগে আরও এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলেন ডাক্তার। যাঁর

হাতেও ছিল ঠিক এই ধরণের একটি দাগ। সে ভদ্রমহিলাও অনেকগুলি বসন্ত রোগীর মাঝখানে ছিলেন, তবুও বসন্ত তাঁকে আক্রমণ করতে পারেনি।

গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার: বলতে পার মা, তোমার হাতের ঐ দাগটা কিসের?

গোয়ালিনী তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল: ও কিচ্ছু না; গোয়ালাদের হাতের এমন দাগ প্রায়ই দেখা যায়। প্রথমে একটা ঘায়ের মত হয় তারপর চিরতরে রেখে দিয়ে যায় এই দাগ।

ডাক্তার কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের বসন্ত হয় না?

গোয়ালিনী বলল: না।

ডাক্তার জেনার কথায় কথায় জানতে পারলেন, গাইর বাঁটেই হয়ে থাকে বিশেষ ধরণের একটা ঘা, দুধ দুইতে গেলে সেখানকার পুঁজ হাতে লেগে ঘায়ের সৃষ্টি করে।

সারাদিন এবং সারারাত ধরে কত কী এলোমেলো চিন্তা করলেন ডাক্তার জেনার। পরদিন সকালে আবার এল গোয়ালিনী। জেনার তাকে অনুরোধ জানালেন, যেমন করেই হোক গাইর বাঁটের ঘা গুলো তাকে দেখাতেই হবে।

গোয়ালিনী হেসে বলল: সেকি আর সব সময় হয় বাবু? যখন গাইর বাঁটে ফোস্কা উঠবে তখন ডেকে নিয়ে যাব।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন ডাক্তার। একদিন সত্য সত্যই গোয়ালিনী এসে জানাল, খাটালে একটা গাইর বাঁটে ফোস্কা উঠেছে। ইচ্ছা করলে ডাক্তার দেখে আসতে পারেন।

এক রাশ আগ্রহ নিয়ে ছুটলেন ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার। দেখলেন গোয়ালিনীর কথাই ঠিক। বাঁটটা একটু নাড়াচাড়া করতে আরও বিস্মিত হলেন ডাক্তার। ঠিক যেন একটা বসন্তের গুটি। জেনার সেদিন ঐ গুটি থেকে কিছুটা পুঁজ সংগ্রহ করে ফিরে এলেন বাড়ীতে।

ডাক্তারের বাসায় থাকত ছোট্ট একটি ছেলে। টুকিটাকি কাজ করত

এবং ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ওখানে যেত। বড্ড ভাল বাসতেন ডাক্তার তাকে। ডাক্তার কার উপর পরীক্ষা চালাবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষে সেই বালকটিই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল। অনেক ভেবে চিন্তে ডাক্তার তাঁর সংগ্রহ করা পুঁজের কিছু অংশ ঢুকিয়ে দিলেন বালকটির দেহে।

কয়েকদিন পরে বালকের গায়ে এল ভয়ানক জ্বর। যেখানটায় পুঁজ ঢুকিয়েছিলেন সেখানে দেখা দিল একটা ফোস্কা—ঠিক যেন বসন্তের গুটি। আরও কেটে গেল কয়েকটা দিন। বালক ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল এবং তার গুটিও গেলে শুকিয়ে। এবার তার দেহে বসন্তের জীবাণু প্রবেশ করানোর কথা। ডাক্তার ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কিন্তু সেই বালকটি সাহস হারালো না। ডাক্তারকে বার বার অনুরোধ জানাতে লাগল রোগ-জীবাণু তার শরীরে অনু-প্রবেশ করানোর জন্যে। ডাক্তার দুরু দুরু বুকে একদিন বালকটির দেহে ঢুকিয়ে দিলেন তীব্র বসন্তের জীবাণু।

একদিন দুদিন করে গড়িয়ে যেতে লাগল দিন। গভীর আগ্রহে দিন গুনছেন ডাক্তার। সেই সঙ্গে একটা বড় রকমের ভয়েও আচ্ছন্ন তাঁর মন। কি জানি, যদি বালকটির কিছু হয়ে পড়ে! রাতেও চোখের পাতা দুটো এক করতে পারেন না। মায়ের মত সারারাত ছেলেটির শিয়রে বসে থাকেন।

ধীরে ধীরে বসন্ত রোগ আক্রমণের সম্ভাব্য দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়ে গেল। বালকটির বসন্ত হল না। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সেই সঙ্গে সারা দেহ মনে অনুভব করলেন এক অনাবিল আনন্দ। বুঝতে পারলেন ডাক্তার, গো-বসন্তের জীবাণু সীমিতভাবে সুস্থ শরীরে বসন্ত রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে। সেই থেকে আবিষ্কৃত হল বসন্তের টীকা। রক্ষা পেল পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ।

অবশ্য জেনারের সময় এই পদ্ধতি ততখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। পরবর্তীকালে পদ্ধতিটি জীবাণু বিশেষজ্ঞদের হাতে পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান এক নতুন যুগের সূচনা করেছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

আজ থেকে প্রায় তিন-শ বছরেরও বেশী সময় আগে হল্যাণ্ডের ডেলফট শহরে বাস করতেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। নাম তাঁর লিউয়েন হোয়েক। লোকে ভাবত, ভদ্রলোকের মাথায় একটু গোলমাল আছে।

একটা চশমার দোকান ছিল ভদ্রলোকের। খদ্দের না থাকলে কাচ ঘষে ঘষে লেন্স বানাতেন। আর বানাতেন ছোট বড় হরেক রকমের তামার পাত দিতে মোড়া নল। নলের মধ্যে লেন্স পরিয়ে তৈরি করতেন অদ্ভুত এক যন্ত্র, লোকে ভাবত, এ হচ্ছে বুড়ো মানুষের ছেলে খেলা। তারা আড়ালে আবডালে হাসতো আর ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

লিউয়েন হোয়েক কারও কথায় কান নিতেন না। নিজের খেয়ালে রাজ্যের যত সব ছোট জিনিস আছে সেগুলিকে লেন্সের সাহায্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। কখনও আপন মনে হাসতেন কখনও বা বিড়বিড় করে কি বকতেন। বুড়োর পাগলামি মনে করে লোকে দূর থেকে লিউয়েন হোয়েকের কাজকর্ম দেখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসত। কিন্তু তারা জানত না হিউয়েন হোয়েকের এই যন্ত্রই আদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র যদিও তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জ্যাকসন নামে এক ভদ্রলোক এই ধরণের এক রকম যন্ত্র বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র লিউয়েন হোয়েকের পাগলামো আরও বাড়িয়ে দিল। দোকান উঠল মাথায়। রাতদিন কেবল যন্ত্র-যন্ত্র আর যন্ত্র। প্রাণীর চামড়া, লোম, জল প্রভৃতি সব কিছুই তিনি ভাল করে দেখতেন। একদিন এক ফোঁটা পচা জলকে যন্ত্রের সামনে ধরতে অবাক হয়ে গেলেন লিউয়েন হোয়েক। জলের মধ্যে কিল বিল করছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। ভাল জলকে নিয়ে দেখতে পেলেন, সেখানে জীবের সংখ্যা বেশ কম। লিউয়েন হোয়েক সিদ্ধান্ত করলেন, জলের মধ্যে বাস করে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। পচাজলে এদের পরিমান খুব বেশী অথচ ওরা এত ছোট যে আমরা খালি

চোখে দেখতে পাই না। আরও বুঝতে পারলেন এই সব জীবের আকার, চলাফেরা সবই অদ্ভুত ধরণের। শারিরীক গঠন ও সবার এক নয়।

জীবগুলোর প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য একবার লিউয়েন হোয়েক বিশুদ্ধ জলকে একটা পরিষ্কার টবে রেখে কয়েকদিন খোলা জায়গায় বসিয়ে রাখলেন। পরে জলকে পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন, পূর্বের দূষিত জলের মত এখানেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব চলা ফেরা করেছে। লিউয়েন হোয়েকের ধারণা হল, টবের জলে আপনা হতেই জন্ম নিয়েছে এত হরেক রকমের অদৃশ্য জীবাণু।

লিউয়েন হোয়েক এবার তাঁর পরীক্ষার ফলাফলগুলো লিখে পাঠালেন রয়েল সোসাইটিতে। সোসাইটির সদস্যরা পাগলের পাগলামি ভেবে হেসে উড়িয়ে দিলেন প্রথমটায়। এক ফোঁটা জলে এত হাজার জীব আসবে কোথা থেকে? জীব আবার এত ক্ষুদ্র হতে পারে? তাঁর যন্ত্রটাই বা কেমন? যাকে চোখে দেখা যায় না, তাকে কেমন করে যন্ত্রে ধরা পড়ে?

কয়েকজন পণ্ডিত স্থির করলেন, পাগল লিউয়েন হোয়েকের পাগলামিটা একবার স্বচক্ষে দেখাই যাক। ভদ্রলোক যখন কথা দিয়েছেন যন্ত্র দিয়ে দেখিয়ে দেবেন, তখন সময় করে একবার দেখে আসতে আপত্তি কোথায়?

সেদিনও লিউয়েন হোয়েক বসেছিলেন তাঁর যন্ত্রপাতি সাজিয়ে। পণ্ডিতেরা সদলবলে হাজির হলেন তাঁর দোকানে। বললেন: আমরা সবাই রয়েল সোসাইটির লোক। আপনি কি সব অদ্ভুত পরীক্ষার কথা লিখেছিলেন, দয়া করে সে পরীক্ষাগুলো আমাদের সামনে করে দেখালে আমরা অত্যন্ত খুশী হবো।

হাসলেন লিউয়েন হোয়েক। তারপর সব পরীক্ষাগুলোই একে একে করে দেখালেন পণ্ডিতদের সামনে। অবাক হলেন পণ্ডিততেরা। যেন নিজের চোখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁদের! জলে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বাস করে? এ যে কল্পনারও অগোচর ছিল।

হতভম্ব পণ্ডিতেরা লিউয়েন হোয়েকের তৈরি একটা যন্ত্র এবং কিছুটা

দুষিত জল নিয়ে ফিরে এলেন সোসাইটিতে। রয়েল সোসাইটি থেকেই প্রচারিত হল লিউয়েন হোয়েকের অদ্ভুত আবিষ্কারের কাহিনী। দেশের মানুষেরা এবার হতবাক হয়ে গেলেন। দলে দলে তাঁরা ভিড় করতে লাগলেন চশমার দোকানে। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সবাই দেখে যেতে লাগলেন জলে বসবাসকারী সেই সব অদ্ভুত জীবদের। দেশের রাজারাণীও বাদ পড়লেন না। শোনা যায় একদিন রাশিয়ার জারও এসেছিলেন লিউয়েন হোয়েকের পরীক্ষা দেখতে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর লিউয়েন হোয়েক জলজ জীবদের নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি দেখেছিলেন, মানুষের মুখে, দাঁতে, খাদ্যনালীতে এই ধরণের জীবরা বাস করে। এও বুঝছিলেন এদের অনেকে মানুষের ক্ষতিও করে। আবার উপকারও কেউ কেউ করে।

পাগলামোয় মাঝে মাঝে তাঁর মাথায় ভর করত। কখন কখন নিজের মুখকে জীবাণু শূন্য করতে গরম কফি খেয়ে মুখ পুড়িয়ে ফেলতেন। জীবাণু হয়ত মরত, তবে কয়েকদিন ধরে তাঁকে দুর্ভোগেও বড় কম ভোগ করতে হত না।

প্রকৃত পক্ষে জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা লিউয়েন হোয়েকেই প্রথম আরম্ভ করেন। তাঁর পাগলামি যে বিশ্বের বিজ্ঞানকে এতখানি সমৃদ্ধ করবে একথা সেদিন স্বপ্নেও কেউ চিন্তা করেননি। বিজ্ঞানের রাজ্যে লিউয়েন হোয়েকের অবদানের তুলনা নেই।

পাস্তুরের আবিষ্কার

লিউয়েন হোয়েকের আবিষ্কার জীব বিজ্ঞানীদের ভয়ানকভাবে ভাবিয়ে তুলল। হাতে অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন তাঁরা। এবার শুধু জল নয় বিজ্ঞানীরা বাতাসকে নিয়েও আরম্ভ করলেন গবেষণা। ধীরে ধীরে জীবাণুদের রাজত্বের কথা জানতে পারল মানুষ। জলে বাতাসে

এমন কি আমাদের চারপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জীবাণু। মানুষের রোগের মূলেও আছে জীবাণুদের প্রত্যক্ষ যোগ। যত রোগ, তত রকমের রোগ জীবাণু।

আরও পরে জীবাণুদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন বিজ্ঞানীরা। প্রথম শ্রেণীর জীবাণুদের তাঁরা নাম দিলেন ভাইরাস। ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র যে, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এরা অনেক সময় ধরা পড়ে না। আজকাল যে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপের কথা আমরা শুনতে পাই, কেবলমাত্র ওতেই পাই ভালভাবে ধরা পড়ে ভাইরাসরা। সর্দি ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত প্রভৃতি রোগ ভাইরাস ঘটিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ব্যাকটিরিয়া। ভাইরাসের মত এত ক্ষুদ্র না হলেও সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এরাও ধরা পড়ে না। ওদের দেখতে হলে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। ব্যাকটিয়ারা কিন্তু সবাই ক্ষতিকারক নয়। ওরা অনেকে আমাদের অনেক উপকার করে। আমাদের পাকস্থলী, গলনালী, মুখ, নাক প্রভৃতি জায়গায় ওদের অনেক বাসও করে। ব্যাকটিরিয়া আবার তিন ধরণের—গোল, লম্বা এবং প্যাঁচালো। গোলদের কক্কাই, লম্বাদের ব্যাসিলাস এবং প্যাঁচালদের বলা হয় স্পাইরিলা। কলেরা রোগ জীবাণু কমা ব্যাসিলাস ব্যাকটিরিয়া শ্রেণীর।

তৃতীয় শ্রেণীর জীবাণু যারা, তাদের নাম প্রোটোজোয়া। ওদের আকার অন্যান্যদের চেয়ে বেশ বড়। খালি চোখে দেখা যায় না ঠিকই, তবে যে কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ওদের দেখতে অসুবিধা হয় না। ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগ জীবাণুরা এই শ্রেণীতে পড়ে।

জীবাণুদের সম্বন্ধে গবেষণা করে যাঁরা কালজয়ী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাদের মধ্যে লুই পাস্তুর অন্যতম। পৃথিবীর সর্ব দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পাঁচজন মানব হিতৈষী বিজ্ঞানীর যদি নাম করতে হয় তাহলে অক্লেশে লুই পাস্তুরের নামকে শীর্ষে স্থান দিতে হবে। গুণী যাঁরা তারা মন্তব্য করেন, মানব সভ্যতার আদি থেকে এ যাবৎকাল যত লোক যুদ্ধে মারা গেছে তার চেয়েও বেশী লোক বেঁচেছে পাস্তুরের আবিষ্কারের দ্বারা।

এত বড় জীবাণু বিশারদ যে পাস্তুর, তাঁর আবিষ্কারের পেছনেও আছে অনেক কাহিনী।

একবার ফ্রান্সে ভয়ানকভাবে গুটিপোকার মড়ক দেখা দিল। ফ্রান্স গুটিপোকার চাষ করে প্রচুর রেশম উৎপাদন করে। সেই রেশম আবার বিদেশে রপ্তানি করে রোজগার করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা, গুটিপোকার মড়ক আসতে সরকার থেকে চাষীরা সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কেমন করে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে দেশ!

অনেক ভেবে চিন্তে সরকার মড়ক প্রতিরোধের ভার পাস্তুরের উপর ছেড়ে দিলেন। পাস্তুর ছিলেন পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। কোন নাম করা জীববিজ্ঞানীর হাতে ভার দেওয়া হলনা বলে জনসাধারণ হলেন অসন্তুষ্ট। এখানে ওখান সর্বত্র চলতে লাগল সরকারের সমালোচনা।

পাস্তুর কিন্তু দমলেন না একটুও। তার নিরলসপ্রচেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ধরা পড়ল এক ধরণের অদৃশ্য জীবাণু রয়েছে গুটিপোকার মড়কের মূলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষেধক আবিষ্কার করে দেশকে দুদিনে রক্ষা করলেন পাস্তুর। তার গবেষণায় আরও ধরা পড়ল দুধ টকে দই হয়ে যায়, কিংবা মদ টকে গিয়ে পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আছে অদৃশ্য জীবাণুদের হাত। জীবাণু সম্বন্ধে এত বেশী গবেষণা পাস্তুরের আগে হয়নি।

আমরা আজকের দিনে যে সব টীকা নিয়ে থাকি তারও প্রচলন করে গেছেন পাস্তুর। যদিও টীকার প্রকৃত উদ্ভাবক ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার।

জেনারের মত পাস্তুরও বুঝেছিলেন, জীবিত কিংবা মৃত রোগ জীবাণুদের সীমিতভাবে শরীরে প্রবেশ করালে, শরীর সেই রোগেরই প্রতিরেধক ক্ষমতা লাভ করে। জেনার কেবলমাত্র বসন্ত রোগ জীবাণুর ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু পাস্তুর বললেন "একমাত্র বসন্ত নয়, অপর বহু সংক্রামক ব্যাধির ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য।"

পাস্তুরের কথায় সেদিন চারদিকে তুমুল আলোড়ন উঠেছিল। কেউ

বিশ্বাস করতে চাইলনা তাঁর কথা। পাস্তুর দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তার কথার যৌক্তিকতা তিনি সর্ব সমক্ষে প্রমাণ করতে রাজী আছেন।

অবিশ্বাসীরা পাস্তুরের ব্যবস্থা মেনে নিল। ঠিক হল, পাস্তুর পঞ্চাশটি ভেড়া নিয়ে পরীক্ষাটি করে দেখাবেন। প্রথমে পঞ্চাশটি ভেড়ার মধ্যে পঁচিশটাকে দেওয়া হল অ্যানথ্রাক্স রোগের টীকা। সেই পঁচিশটিকে আলাদাভাবে রাখা হল। তারপর পঞ্চাশটি ভেড়ার প্রত্যেকের দেহের প্রবেশ করান হল তীব্র অ্যানথ্রাক্স রোগ জীবাণু।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই যে পঁচিশটিকে টীকা দেওয়া হয় একটিও এই রোগে আক্রান্ত হল না। বলা বাহুল্য টীকা না দেওয়া পঁচিশটি ভেড়ার একটিও বাঁচল না।

এই থেকে টীকা দেওয়ার পদ্ধতি প্রচলিত হল এবং হাজার হাজার গবাদি পশু নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেল। মুরগিদের টীকা দেওয়া এবং শস্য ক্ষেত্রে পোকামাকড় মারার ওষুধ ছিটাবার ব্যবস্থা তিনিই প্রথম চালু করেছিলেন।

ক্ষ্যাপা কুকুর শেয়াল নেকড়ে প্রভৃতি প্রাণী লালায় যে এক ধরণের উগ্র রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে, এই সত্যও পাস্তুরের আবিষ্কার। ঐ সব প্রাণীরা মানুষকে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। জলাতঙ্ক রোগে মানুষ বাঁচে না। পাস্তুর ক্ষ্যাপা কুকুরের লালা থেকে একরকম সিরাম তৈরী করলেন। সেই থেকে জলাতঙ্ক রোগে আর মানুষ মরছে না!

পাস্তুরের কত যে আবিষ্কার আছে তা বলে শেষ করা যায় না। তার মত ব্যক্তিকে জন্মদান করে পৃথিবী নিজেই কৃতার্থ হয়েছে।

পেনিসিলিন

ডাক্তারের নাম স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

তাঁর একটা সখ ছিল রোগ জীবাণু প্রতিপালন করা। হাসপাতালে কাজ করতেন এবং কাজের ফাঁকে রোগ জীবাণুদের নিয়ে গবেষণা করতেন।

একদিন বাক্সের ঢাকনা খুলতে তাঁর চোখে পড়ল, বাক্সের মধ্যে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে এক ধরণের ছত্রাক। আর লক্ষ্য করলেন, যেখানে ছত্রাক-গুলো গজিয়েছে সেখানে রোগজীবাণুরা আদৌ বংশবিস্তার করতে পারেনি। এমনকি বহু জীবাণু ধ্বংসও হয়ে গেছে।

কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হলেন ফ্লেমিং। একদিন বুঝতে পারলেন, নানা ধরণের ছত্রাকের বীজ অদৃশ্যভাবে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। যখন তিনি বাক্সের ঢাকনা খুলে রোগ জীবাণুদের বপন করতেন, তখনই কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বিশেষ এক ধরণের ছত্রাক বীজ অবশ্যই উড়ে এসে বাক্সের মধ্যে পড়েছে এবং অনুকুল পরিবেশ পেয়ে বংশ বিস্তার করেছে।

ব্যাপারটা অতি সাধারণ। আমরাও আমাদের চারপাশে এমনই কত সাধারণ ঘটনা লক্ষ্য করে থাকি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা অতি সাধারণ বা তুচ্ছ ঘটনাকে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেন না। তাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন এবং কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইখানেই বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ।

ফ্লেমিংও সেদিনের সেই তুচ্ছ ঘটনাটিকে নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন। একসময় তাঁর মনে এল, এই অজ্ঞাত ছত্রাকটির নিশ্চয়ই রোগ নিরাময় ক্ষমতা আছে। তখন ঐ ছত্রাকটির কিছু অংশ তুলে নিয়ে মাংসের ক্বাথের মধ্যে প্রতিপালন করতে লাগলেন। অচিরে বুঝতে পারলেন, এটি একটি অতি বিরল ধরণের ছত্রাক। এদের বীজ বাতাসেই ঘুরে বেড়ায়। ফ্লেমিং ছত্রাকটির নাম করণ করলেন পেনিসিলিন নোটেটাম। এরা যখন বংশ বৃদ্ধি করে তখন এদের দেহ থেকে নির্গত হয় ঈষৎ হলুদ রঙের এক প্রকার রস। ঐ রসই রোগবীজাণুদের বংশবৃদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে।

মানুষের দেহে ঐ রস প্রবেশ করানোর আগে ফ্লেমিং কয়েকটা

খরগোসের দেহে ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন খরগোসদের কোন ক্ষতি হলনা। তারপর একদিন কাচের স্লাইডে রাখা রক্তের উপর প্রয়োগ করে বুঝতে পারলেন, রক্তের সঙ্গে কোন খারাপ ক্রিয়া হচ্ছে না। নিশ্চিন্ত হলেন ফ্লেমিং।

ফ্লেমিং কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন না। তাই মানব দেহে প্রবেশোপযোগী ওষুধ হিসেবে পেনিসিলিন তৈরি করতে ব্যর্থ হলেন। এর পর কেটে গেল আরও কয়েকটা বছর। দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর চলেছে তখন পুরোদমে। ইউরোপের হাসপাতালগুলো ভরে গেছে আহত সৈনিকে। বন্দুক, কামান এবং বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত সৈনিকদের ক্ষতস্থান দিন দিন বিষিয়ে উঠছে। তাদের কাতর চিৎকারে ইউরোপের আকাশ বাতাস স্তব্ধ। চিন্তিত হলেন রাষ্ট্রনায়কেরা আর চিন্তিত হলেন বিজ্ঞানীরাও। হতভাগ্য সৈনিকেরা হঠাৎ মারাও যায় না আবার তাদের সারিয়ে তোলার জন্য কোন ওষুধও আবিষ্কৃত হয়নি।

শেষে ঐ হতভাগ্যদের জন্য কিছু করা যায় কিনা এই উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলনের আহ্বান করা হল। ফ্লেমিংও যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। সেদিন যখন ঐ মুমূর্ষু সৈনিকদের কথা আলোচিত হচ্ছিল তখনই হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে আবিষ্কৃত পেনিসিলিন নোটেটাম নামক ছত্রাকটির কথা। বাড়ী এসে ঐ ছত্রাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলেন একটি নামকরা বিজ্ঞান পত্রিকায়।

প্রবন্ধটি যথা সময়ে প্রকাশিত হল এবং পত্রিকার একটি 'কপি' হাতে পড়ল 'চেইন' নামে জনৈক রসায়ন বিজ্ঞানীর। চেইন ছিলেন তৎকালীন ইংলণ্ডের বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী ফ্লোরির সহযোগী। তাঁরা বহুদিন থেকে মানবদেহে রক্তদুষ্টির ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু কোন সূত্রই তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানোর মত অবস্থা ছিল তাঁদের।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রবন্ধটি পেয়ে তাঁদের মন আনন্দে নেচে উঠল। নতুন উদ্যমে পেনিসিলিনকে নিয়ে মেতে উঠলেন তাঁরা। এতদিনে

বিজ্ঞান লক্ষ্মী মুখ তুলে তাকালেন তাঁদের দিকে। অজস্র অর্থব্যয় এবং বহু সহযোগীর নিরলস সাধনার ফলে একদিন আবিষ্কৃত হল ওষুধরূপে পেনিসিলিন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঐ দিনটির কোন তুলনা হয় না। আরম্ভ হল একটি নতুন যুগ। লক্ষ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যুর পথ হল রুদ্ধ। কত শত শত বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন আশ্চর্য গুণসম্পন্ন নবাবিষ্কৃত পেনিসিলিনকে নিয়ে গবেষণার জন্য। একদিকে আত্মপ্রকাশ করল কত ওষুধ আবার অপরদিকে নতুন কোন উপকারী ছত্রাকের সন্ধানেও বিজ্ঞানীরা হলেন যত্নবান। একদিন গবেষণা করতে করতে ওয়াকসম্যান নামে এক বিজ্ঞানী পরিচয় পেলেন মৃত্তিকাজাত এক ছত্রাকের। ঐ ছত্রাক থেকে ওষুধ তৈরি করে বিজ্ঞানীরা যক্ষ্মা রাক্ষসীকে ও বিতাড়িত করলেন পৃথিবী থেকে।

আকস্মিক ভাবে আবিষ্কৃত পেনিসিলিন নোটেটাম জাতীয় ছত্রাকের এত গুণের কথা সেদিন ফ্লেমিংও স্বপ্নে ভাবতে পারেননি। আর ভাবতে পারেননি ফ্লোরিও চেইন। নবযুগের অগ্রপথিক এই তিনজন বিজ্ঞানী পৃথিবীর সবারই নমস্য।

ক্লোরোফর্মের চেতনানাশক গুণ

বিজ্ঞানী নন,—এক ডাক্তার। নাম তাঁর সিম্পসন। একটি হাসপাতালে প্রসূতি সদনে কাজ করতেন তিনি। তাইতো বহু মায়ের পেটে অস্ত্রোপচার করতে হয় তাঁকে। মায়েরা অনেক সময় ডাক্তারের ধারাল সব অস্ত্রশস্ত্র দেখে মূর্ছা যেতেন। জীবনে মূর্ছা তাঁদের আর ভাঙ্গতো না। অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে ডাক্তার সিম্পসন বড় ব্যথিত হতেন।

একবার তাঁর মনে এল, অস্ত্রোপচারের সময় মায়েদের যদি কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান করে রাখা যেত তাহলে এত বিপত্তি ঘটত না। কিন্তু

কেমন করে তা সম্ভব হবে? ডাক্তার সিম্পসনের আবার রসায়নে জ্ঞান সীমিত। চেতনানাশক কোন ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন সিম্পসন। চেষ্টা করতে লাগলেন, চেতনানাশক কোন দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা!

দিন যায়। মনের গোপন ইচ্ছা মনে চেপে রেখে চারিদিকে কেবল সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যেখানে যত রাসায়নিক পদার্থ পেতেন সবই সংগ্রহ করে আনতেন এবং শুঁকে শুঁকে দেখতেন। কখনও বা দু চারজন বন্ধু বান্ধবকে সঙ্গে নিতেন। এমনি করে গড়িয়ে যেতে লাগল দিন মাস ও বছর।

একদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন সিম্পসন। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়ল দেরাজে রাখা একটি শিশির উপর। সদ্য আবিষ্কৃত ক্লোরোফর্মকে অভ্যাস বশে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। শিশিটা বোধহয় অনেকদিন ধরে পড়ে আছে। কেননা সারা শিশিটা ধুলোয় ভর্তি। কি মনে করে শিশিটাকে পেড়ে আনলেন দেরাজ থেকে। তারপর ছিপি খুলে ঘ্রাণ নিতে আরম্ভ করলেন। ভারি মিষ্টি গন্ধ—যেন নেশা ধরে যায় সে গন্ধে। বন্ধুদের দিকে শিশটা বাড়িয়ে বললেন, "দেখেছো, কেমন মিষ্টি গন্ধ। বারবার শুঁকতে ইচ্ছা হয়।"

বন্ধুরাও আগ্রহ ভরে শিশিটা নিয়ে একে একে শুঁকতে আরম্ভ করলেন। সত্যি তো, ভারি চমৎকার সে গন্ধ। প্রাণভরে আঘ্রাণ নিতে লাগলেন তাঁরা।

তারপর—সে এক কাণ্ড! সিম্পসন চেয়ার থেকে ধপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে আর গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। সিম্পসনের এই অবস্থা দেখে বন্ধুরা কিছুই করল না বরং হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলেন সবাই। মাতালের মত মুখ থেকে অসংলগ্ন কথা বার হতে লাগল তাঁদের। কিন্তু সেও আর কতক্ষণ! একটু পরে বন্ধুদেরও হল সিম্পসনের অবস্থা হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে গড়িয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন সবাই।

সিম্পসনের স্ত্রী ঘরের ভেতর কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বাহিরের ঘরে

দুমদাম শব্দ, হৈ হুল্লোড় এবং গোঙানির শব্দ শুনে ছুটে এলেন। ঘরে ঢুকে যা দেখলেন, তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেল। বড্ড ভয় পেলেন ভদ্র মহিলা। তিনি জানতেন, রাজ্যের যত বাজে জিনিসকে শুঁকে দেখার অভ্যাস আছে তাঁর স্বামীর। বদভ্যাসের ফলে তিনি বহুবারই মৃত্যুকে ডেকে আনতে চেয়েছিলেন। আজ এতগুলো লোকের প্রাণ হানির আশঙ্কা করে শিউরে উঠলেন ডাক্তারের স্ত্রী। মুখ থেকে একটি কথাও তাঁর বার হল না, মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। পা দু দুটোও কাঁপতে লাগল থরথর করে! ভদ্র মহিলা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সেইখানে।

এদিকে ডাক্তার সিম্পসন ক্লোরোফর্মকে অল্প সময় শুঁকেছিলেন বলে তাঁর সংজ্ঞা আগে ফিরে এল। বন্ধুদের অবস্থা দেখে একটুও ঘাবড়ালেন না। বরং মনটা আনন্দে ভরে উঠল। বুঝতে পারলেন, তাঁর এতদিনের প্রচেষ্টা আজই সফল হল। চেতনানাশক হিসাবে এই ক্লোরোফর্মই অদ্বিতীয়।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুযোগ একটা এসে গেল। জনৈক প্রসূতি প্রসব বেদনায় ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর উপর অস্ত্রোপচার না করলে নয়। সিম্পসন তাঁরই উপর প্রয়োগ করলে ক্লোরোফর্ম। মুহূর্তে যেন ঘুমিয়ে পড়লেন প্রসূতিটি। সিম্পসন তাঁর নিপুণ হাতে অস্ত্র চালালেন। যথা সময়ে মেয়েটির জ্ঞানও ফিরে এল। এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সিম্পসন। অবশ্য অনেকে মনে করে থাকেন, এই প্রসূতিটি ছিলেন তাঁরই আদরের ভ্রাতুষ্কন্যা।

সেই দিনটিও মানুষের ইতিহাসে একটি শুভদিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই শুভদিনের যিনি সূচনা করলেন, তিনি ডাক্তার সিম্পসন— এক সামান্য রুটিওয়ালার পুত্র। সারা জীবন ধরে সিম্পসন মানুষের কল্যাণের জন্য যে অনমনীয় মনোভাব এবং বিরাট পৌরুষের পরিচয় দিয়ে গেছেন তাও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

সিম্পসন যখন হতভাগিনী মায়েদের যন্ত্রণা লাঘবের জন্য ক্লোরোফর্ম

প্রয়োগ করতে লাগলেন তখন চারদিক থেকে উঠল প্রতিবাদ। বিশেষ করে ধর্মযাজকরা একেবারে বেঁকে বসলেন। তাঁরা বললেন, মেয়েরা সহ্যশীলা ধরিত্রীর অংশ সম্ভূতা। তারা কষ্টের ভেতর দিয়ে সন্তানের জন্ম দেবে এবং কষ্টের ভেতর সন্তান প্রতিপালন করবে। তবেই তো মা। মেয়েদের আরামপ্রিয় করে ধর্মের বিরোধিতা করছে সিম্পসন।

সিম্পসন প্রথমটায় বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু পরে ধর্মযাজকদের কথা তিনি মানলেন না। প্রকাশ্যে মায়েদের অজ্ঞান করিয়ে অস্ত্রোপচার করতে লাগলেন ক্রুদ্ধ ধর্মযাজকরা দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ করে সিম্পসনকে একঘরে করলেন প্রচার করলেন সিম্পসনের কাছে চিকিৎসার জন্য যে-ই যাবে সেই-ই হবে জাতিচ্যুত!

দমলেন না সিম্পসন একটুও। একদিকে ইংলণ্ডের অগণিত জনসাধারণ অপর দিকে তিনি একা। সুদীর্ঘ দশ বছরকাল তীব্র ভাবে সংগ্রাম চালালেন সিম্পসন। শেষে সমগ্র পৃথিবী স্বাগত জানালো সিম্পসনের মহৎ প্রচেষ্টাকে। এই বিরোধের অবশ্য মীমাংসা করেছিলেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া। আপন সন্তানের জন্মদান করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন ক্লোরোফর্ম। সেদিন বিরোধীরা বাধ্য হয়েছিল শামুকের মত নিজেদের জিভকে গুটিয়ে নিতে।

'ডাক্তার সিম্পসন' - বিশ্বের এক সেরা নাম। উন্নত শল্য চিকিৎসার প্রধান পুরোহিত তিনি। যদিও আজকের দিনে ক্লোরোফর্মের চেয়েও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ চেতনানাশক ওষুধের সন্ধান পাওয়া গেছে তবুও রোগীকে অজ্ঞান করিয়ে অস্ত্রোপচার করা যায়, এই কল্পনা একমাত্র ডাক্তার সিম্পসনেরই চিন্তা প্রসূত। প্রকৃত মায়ের সন্তান বলতে সিম্পসনদেরই বোঝায়।

তাপ গতি বিদ্যা

এমন একদিন ছিল, যেদিন বিজ্ঞানীরা মনে করত, তাপ এক রকম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ কণা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই পদার্থকণার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা ক্যালরিক। তাঁদের ধারণা ছিল, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ক্যালরিকের প্রবাহ হলে তাপের আদান প্রদান হয়। ক্যালরিক যে বস্তুতে প্রবেশ করে সে বস্তু হয় উত্তপ্ত এবং যে বস্তু থেকে বেরিয়ে আসে সে বস্তু হয় ঠাণ্ডা। এই ক্যালরিক এত সূক্ষ্ম যে, তাকে মানুষ দেখতে পায় না এবং ওর কোন ওজন নেই। ক্যালরিকের আদান প্রদানে তাই বস্তুর ওজনেরও কোন তারতম্য হয় না।

দীর্ঘকাল ধরে মানুষ পোষণ করে আসছিল উক্ত ধারণাকে। তাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নতুন কোন চিন্তা ভাবনার আদৌ চেষ্টা করেননি। হঠাৎ একদিন এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে উল্টে দিলেন একজন সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার।

ইঞ্জিনিয়ারটি মিউনিক শহরের অস্ত্রশালায় কামান তৈরি করতেন। একদিন কামানের নল তৈরির জন্য একখানা ধাতব পাতকে ছাঁদা করছিলেন ভদ্রলোক। এমন সময় একটি অতি সাধারণ ঘটনা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি দেখলেন, তুরপুন দিয়ে পাতকে ছাঁদা করার সময় তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। ক্যালরিক মতবাদটা জানা ছিল বলে এই ঘটনাটির কথা তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। ভাবলেন, তাপ যদি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণা হয় তাহলে ছাঁদা করার সময় এত তাপ এল কোথা থেকে? এর পর তিনি ধাতব পাতকে জলে ডুবিয়ে ছাঁদা করার সময় দেখলেন, জল ফুটতে আরম্ভ করল। ভোঁতা তুরপুন নিয়ে পরীক্ষাটি করে বুঝতে পারলেন, উৎপন্ন তাপের পরিমাণ এখানে অনেক বেশী।

ইঞ্জিনিয়ারটি এবার বুঝতে পারলেন, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে

ক্যালরিকের প্রবাহে তাপের আদান প্রদান হয়না, ঘর্ষণেই তাপের উৎপত্তি হয়। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক সংশ্লিষ্ট মহলে তাঁর আবিস্কৃত তথ্যটি প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। বললেন : বিজ্ঞানীদের ক্যালরিক মতবাদ ভ্রান্ত। ক্যালরিক নামের কোন পদার্থ পৃথিবীতে নেই। আসলে ঘর্ষণের ফলে তাপের উৎপত্তি হয়।

সবাই তো আর বিজ্ঞানকে নিয়ে মাথা ঘামায় না! যে শুনল, সে বলল "ক্যালরিক ফ্যালরিক কিচ্ছু বুঝি না বাপু। তবে জোরে জোরে দুটো বস্তুকে নিয়ে ঘষতে থাকলে গরম হতে দেখছি। পাথরে পাথর ঘষলে তো আগুন ছুটে বেরিয়ে আসে।

ওদের কথায় ইঞ্জিনিয়ারটি আরও উৎসাহ বোধ করলেন। এবার সর্ব সমক্ষে বলতে লাগলেন "শুনে যাও গো বিজ্ঞানীরা। তোমাদের দেওয়া ক্যালরিক মতবাদ একেবারেই ভুল।"

কিন্তু কে শোনে কার কথা? এত দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল ধারণা কি একটি ইঞ্জিনিয়ারের কথায় উল্টে যাবে? একরকম কানই দিলেন না বিজ্ঞানীরা।

ইংলণ্ডে সে সময় বিজ্ঞানী ডেভির ভয়ানক নাম ডাক। তিনি আবার ছিলেন অন্য ধরনের লোক। অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও বড্ড বেশী মাথা ঘামাতেন। কোন কিছুকে ফেলনা বলে মনে করতেন না। ইঞ্জিনিয়ারটির কথা শুনে ডেভি চিন্তা করতে স্বুরু করলেন, ঐ ক্যালরিক মতবাদের সার্থকতা কতখানি।

ডেভি করলেন কি, একদিন দুহাতে দু'খানা বরফের টুকরো নিয়ে জোরে জোরে ঘষতে লাগলেন। আশ্চর্য। বরফের ঘর্ষণে ও তাপের উৎপত্তি হল। ডেভি চিন্তা করলেন, বিজ্ঞানীদের দেওয়া ক্যালরিক মতবাদ অনুযায়ী বরফের মধ্যে ক্যালরিক প্রবেশ করতে পারে না বলেই ঠাণ্ডা। যদি এই মতবাদ সত্য হত তাহলে বরফে বরফে ঘর্ষণে তাপ সৃষ্টি হয়ে জল উৎপন্ন করতে পারত না।

ডেভি এবার সেই ইঞ্জিনিয়ারটির মতবাদকে সমর্থন করে একটি সূত্র

রচনা করলেন। সূত্রটি হল, ঘর্ষণের ফলে যে কোন বস্তুর অণু বা পরমাণুর গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এই বর্ধিত গতি শক্তিই বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চারিত করে। প্রকৃতপক্ষে তাপ একপ্রকার শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিজ্ঞানী সমাজে মুকুটমণি ডেভির কথা কেউ অবিশ্বাস করতে পারল না। বিজ্ঞানীরা তাপের এই দিকটা নিয়ে এবার আরম্ভ করলেন গবেষণা। কত বিজ্ঞানী কত অদ্ভুত ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরি করে বসে গেলেন গবেষণা করতে। শেষে সেই ইঞ্জিনিয়ার এবং ডেভির দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে আর একটি সত্যের আবিষ্কার করলেন জেমস প্রেসকট জুল। তাপ বিজ্ঞানে এই সত্যটি জুলের সূত্র নামে পরিচিত।

জুলের আবিষ্কারের পর তাপবিজ্ঞানে উদ্ভব হল আর একটি নতুন শাখা, সেই শাখাটি নাম হল তাপ গতি বিদ্যা। বিজ্ঞানীরা রচনা করলেন একাধিক সূত্র এবং সে সব সূত্রের ফলও হল সুদূর প্রসারী। আমরা আজকের দিনে যে সমস্ত তাপ ইঞ্জিনের সঙ্গে পরিচিত, সেগুলোর মূল নীতিই হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার সূত্রাবলী।

বিজ্ঞানের এই শাখার উদ্ভাবক, মিউনিক শহরের সেই ইঞ্জিনিয়ারটির নাম স্যার রাম ফোর্ড।

উরস্টেডের পরীক্ষা

১৮০০ সালের কথা।

কোপেন হেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক ছাত্রদের তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে পড়াচ্ছিলেন। যদিও সেদিনের তড়িৎ বিজ্ঞান আজকের মত এত সমৃদ্ধ ছিল না এবং এত বড় বড় আবিষ্কারও তখন হয়নি। তড়িৎ বিজ্ঞানের শিশুকালেই বলা যেতে পারে।

অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মত এই অধ্যাপকটিও বিদ্যুৎ

প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করতেন। তাই তৈরি করেছিলেন নানাবিধ যন্ত্রপাতি।

সেদিন ক্লাসে পড়ানোর সময়ও হাতের কাছে মজুত ছিল হরেক রকমের যন্ত্রপাতি। সেগুলির মধ্যে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, একটি লম্বা তামার তার এবং একটি কম্পাস ও ছিল।

পরীক্ষা করে দেখানোর পর অধ্যাপক তড়িৎ প্রবাহ সম্বন্ধে আরম্ভ করলেন বক্তৃতা। কিছুক্ষণের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দিতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলেন। কোন দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর যন্ত্রপাতির দিকে না তাকিয়ে এক রকম মুদ্রাদোষের মত এটা ওটা নাড়ানাড়ি করছিলেন। আপন অজান্তেই কম্পাসটা এনে ফেললেন তামার তারটির কাছে। বলা বাহুল্য কিছুক্ষণ আগে তারটিকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন বলে সে তারে তখনও বিদ্যুৎ ছিল।

ক্লাসের ঘণ্টা শেষ হল। অধ্যাপক বক্তৃতা শেষ করে এবার যন্ত্রপাতির দিকে নজর দিলেন। ততক্ষণে বেয়ারাও এসে দাঁড়িয়েছে যন্ত্রগুলো বহে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সে এক অপূর্বক্ষণ, অনন্ত মুহূর্তও বলা যেতে পারে। অধ্যাপক দেখলেন কম্পাসের কাঁটাটি উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত না থেকে তারের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে আছে। বিস্মিত বড় কম হলেন না অধ্যাপক। তিনি কেন, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ জানে কম্পাস চুম্বকের কাঁটা উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত থাকে। এখানে দ্বিতীয় কোন চুম্বক নেই যে কম্পাসের কাঁটাটি বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে যাবে?

এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক আরম্ভ করলে গবেষণা। বুঝতে পারলেন, তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রেরণ করলে, যতক্ষণ তারটিতে বিদ্যুৎ থাকে ততক্ষণ ঐ তারটিও একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয় এবং তার কাছে কম্পাসকে আনলে কম্পাসের কাঁটা উত্তর দক্ষিণে না থেকে তারের সমান্তরাল হয়ে অবস্থান করে।

এই অধ্যাপকের নাম উরস্টেড। ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার সময়

আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন চুম্বক ও তড়িৎপ্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক। অ্যাম্পিয়ার নামে একজন বিজ্ঞানী এই পর্যায়ে আরও গবেষণা করেন। উরস্টেড এবং অ্যাম্পিয়ারের পরীক্ষা ফলাফলকে কেন্দ্র করে তড়িৎ বিজ্ঞানে সূচিত হল একটি নূতন শাখা। যার পরোক্ষ ফল, বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ টেলিফোন প্রভৃতি কত হরেক রকমের যন্ত্র। যা নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে।

টেলিগ্রাফ

একছিলেন চিত্রকর।

রাত দিন কেবল ঘরের কোণে বসে থাকতেন আর আপন মনে ছবি আঁকতেন। একদিন কী খেয়াল হল তাঁর! ভাবলেন, যেখানে যত সেরা সেরা চিত্রশালা আছে সব জায়গায় একবার ঘুরে দেখবেন।

শিল্পীরা আবার একটু বেশী খেয়ালি হয়ে থাকেন তো! মাথায় ঝোঁক একবার চাপলে আর রক্ষে নেই। এই চিত্রকরও সেদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে।

লণ্ডন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি প্রভৃতি কত জায়গায় ঘুরলেন চিত্রকর। বছরও প্রায় ঘুরে এল। বিভিন্ন চিত্রশালা থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ঘরে ফেরার জন্য লণ্ডন থেকে এক জাহাজে চেপে বসলেন।

কেবিনের একপাশে ঠাঁই নিয়েছেন চিত্রকর। চোখে উদাস দৃষ্টি, মনে ঘরে ফেরার ব্যগ্রতা। মাঝে মাঝে আনমনাও হয়ে পড়েছিলেন। ঐ নীল আকাশের নীচে দিগন্ত প্রসারী নীল জলরাশি। সোনা সোনা রোদ্দুর ঝিক ঝিক করছে। মাথার উপর দিয়ে তীরের ফলার মত সারি সারি কি সব পাখী উড়ে চলছে। তাদের সাদা সাদা ডানায় রোদ পড়ে চক চক করছে। চিত্রকর তো? এমন সব সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে চোখ ফেরাতে পারলেন না। ছবি আঁকার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। কিন্তু হাতের কাছে সাজ সরঞ্জাম কোথায়? একটু মনমরা হয়ে পড়লেন চিত্রকর।

এক সময় তাঁর নজরে পড়ল, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছেন। সামনে তাঁর ছড়িয়ে আছে রাজ্যের যত বাজে জিনিষ। কতকগুলো লোহার টুকরা, তামার তার, এইসব। কৌতুহল হয়ে উঠলেন চিত্রকর। লোকটি পাগল নয় তো ?

অবশেষে কৌতুহল দমন করতে না পেরে চিত্রকর সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করলেন। বুঝতে পারলেন, লোকটি পাগল নয়। তাঁর বাড়ী ফ্রান্সে। পেশায় ডাক্তার, নাম জ্যাকসন। আরও জানতে পারলেন, ভদ্রলোক ডাক্তার হলে কি হবে চিকিৎসার দিকে একেবারে ঝোঁক নেই। বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্বন্ধে গবেষণা করতে ভালবাসেন। যাকে বলে গবেষণা পাগল চিত্রকর এবং গবেষক পাশাপাশি হলেন। দুজনেই পাগল কিনা ? তাই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে দেরী হলনা। চিত্রকর আবার অন্য জগতের বাসিন্দা। জ্যাকসনের কাছ থেকে যতই বিজ্ঞানের কথা শোনেন ততই আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেন। সমঝদার শ্রোতা পেয়ে জ্যাকসনের ও আগ্রহ বেড়ে যায়। একে একে পরীক্ষা করে দেখাতে থাকেন চিত্রকরকে। এক সময় লোহার তারে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে জ্যাকসন দেখালেন, লোহার তাপটা মুহূর্তে চুম্বকে পরিণত হয়ে গেল। আবার প্রবাহ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যেই লোহার তার সেই-ই আছে। চুম্বকের গুণ আর অবশিষ্ট নেই। বড্ড বিস্ময় বোধ করলেন চিত্রকর। জিজ্ঞাসা করলেন : লোহার তারটা যদি খু-ব লম্বা হত তাহলে কি হত।

জ্যাকসন হেসে বললেন : তার যতই লম্বা হোক না কেন, বিদ্যুতের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হতে খুব একটা দেরী হত না।

চিত্রকরের ভাব প্রবণতা বেড়ে গেল। উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকালেন জ্যাকসনের দিকে। যেন আপন মনেই উচ্চারণ করলেন : লম্বা তারের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে বিদ্যুৎ পাঠান যায়, শব্দ পাঠান যায় না ?

একটু পরে চিত্রকরের ভাব তন্ময়তা কেটে গেল। খুশীতে ভরে গেল তাঁর মুখমণ্ডল। হেসে পুনরায় বললেন : শব্দকে তারের মাধ্যমে চালান করে দিতে পারলে খুব মজা হত, তাই না ?

জ্যাকসন কিন্তু তার হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঃ কেন যাবে না ? আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন না !

কথাটা খুব মনে ধরল চিত্রকরের। বাড়ীতে ফিরে এসে আর ছবি অাঁকলেন না। তুলি, কাগজ, রং এর বদলে ঘরকে ভরিয়ে তুললেন স্ক্রু, পেরেক, লোহার তার, তামার তার, হাতুড়ী ইত্যাদি দিয়ে। বন্ধুরা মনে করল, বিদেশে গিয়ে চিত্রকরের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন জিজ্ঞাসা করল, ছবি অাঁকা ছেড়ে দিলে যে বড়।

চিত্রকর সংক্ষেপে উত্তর দিলেন বিজ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায় কিনা দেখছি।

চোখ কপালে তুলে বিদায় নিল বন্ধু।

অল্পদিনেই চিত্রকরের মধ্যে ঘটল অদ্ভুত পরিবর্তন। কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলেন না। নাওয়া খাওয়া একরকম ছেড়ে দিলেন। সবসময় কেবল খুটখাট আর ঠুকঠাক। বাড়ীর লোক বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এদিকে জিনিসপত্র কিনতে কিনতে চিত্রকরও ফতুর হয়ে যাওয়ার যোগাড়। বন্ধুরা, আত্মীয়েরা অনেক বোঝালেন। চিত্রকর কান দিলেন না কারও কথায়। শেষে পয়সার অভাবে নিজহাতে যন্ত্রপাতি তৈরি করতে আরম্ভ করলেন।

কেটে গেল আরও কতদিন। বন্ধু বান্ধবরা ছায়া মাড়াতে আসতনা। আড়ালে অবডালে বলে বেড়াতে লাগল, চিত্রকর এবার বিজ্ঞানী হতে চায়।

চিত্রকর ওসব কথায় কান দেননা। দিনরাত আপন মনেই কাজ করে চলেন। সে কী অতন্দ্র সাধনা ! হার মানলেন বিজ্ঞান লক্ষ্মী। বাধ্য হয়ে তাঁকে তাঁর জয়মাল্যখানি পরিয়ে দিতে হল চিত্রকরের গলায়। নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের মাধ্যমে তারের দ্বারা খবরের সঙ্কেত প্রেরণ করতে সমর্থ হলেন চিত্রকর। প্রথমে সে সঙ্কেত খুব বেশী দূরে পাঠাতে সক্ষম হলেন না। পুনরায় গবেষণা করতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর একদিন

"রিলে" পদ্ধতি আবিষ্কার করে অতি দূরকে ডেকে আনলেন আপনার কাছে! সুরু হল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

আনন্দিত চিত্রকর দাঁড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের সামনে। অনুরোধ জানালেন, প্রয়োজনানুযায়ী আর্থিক আনুকুল্য লাভ করলে তিনি বহু দূর দেশেও নিমেষের মধ্যে খবর পাঠাতে পারেন। পার্লামেন্ট এই মহান আবিষ্কারককে স্বাগত জানালেন। প্রথম কিস্তিতে মঞ্জুর করলেন ত্রিশ হাজার ডলার।

খুশী হয়ে চলে গেলেন চিত্রকর। লোকলস্কর নিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত খবর পাঠানোর জন্য লাইন টেনে নিয়ে গেলেন। এইটিই পৃথিবীর প্রথম টেলিগ্রাফের লাইন।

খবরের সংকেত প্রথম প্রেরণ করেছিলেন চিত্রকর নিজেই। সেই সংকেতটি ছিল "ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্ভব হল।" সাফল্যের সঙ্গে নিমেষের মধ্যে সংকেতটি চলে গেছিল ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোরে। দূরত্বকে সেদিন প্রথম বধ করল মানুষ। দেখতে দেখতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল টেলিগ্রাফ। চিত্রকর হলেন জগৎপূজ্য বিজ্ঞানী।

কিন্তু কী নাম সেই চিত্রকরের!

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক স্যার-স্যামুয়েল মোর্স।

টেলিফোন

ষোল বছরের এক তরুণ। বোষ্টন শহরে এক ধনীর বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকের কাজ করতেন। শ্যার স্যামুয়েল মোর্স তখন সবেমাত্র টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেছেন। তারের মাধ্যমে কেবলমাত্র খবরের সঙ্কেত পাঠিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। সে চাইছে কণ্ঠস্বরকে সোজাসুজি প্রেরণ করতে। কত বিজ্ঞানী বসে গেছেন গবেষণা করতে। আমাদের এই তরুণটিও বাদ পড়লেন না। তিনিও এগিয়ে এলেন অফুরন্ত উৎসাহ এবং গভীর আগ্রহ নিয়ে।

কিন্তু গবেষণাগার তাঁর নেই, নেই অর্থও। অনেক ভেবে-চিন্তে সেই ধনী ব্যক্তিটিকেই ধরে বসলেন,—যার বাড়ীতে তিনি শিক্ষকতা করেন। ভদ্রলোকের মনটা ছিল খুব ভাল। তরুণকে না বলতে পারলেন না। কিছু টাকাকড়ি দিলেন, সেই সঙ্গে নীচের তলার একখানা ঘরও।

এবার মেতে উঠলেন তরুণ। বাজার থেকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারী, লোহার এবং তামার তার, স্ক্রু, পেরেক, লোহার পাম প্রভৃতি কত জিনিষ কিনে ঘর ভরিয়ে ফেললেন। ভদ্রলোকের দেওয়া টাকা খরচ তো হলোই অধিকন্তু নিজের যা ছিল সঞ্চয় তাও ব্যয় হয়ে গেল।

দিন যায়। তরুণের এক মুহূর্তও গবেষণায় ছেদ পড়ে না। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যেতে লাগল তবুও তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না। শেষে গবেষণা করতে এত দীর্ঘদিন কেটে গেল যে, একদিন সেই ধনী ব্যক্তির ঘর ছাড়তে হল তাঁকে।

তরুণের তখন আর পয়সা কড়ির কিছুই অবশিষ্ট নেই। এক মাত্র মনের জোরকে সম্বল করে বোষ্টন শহরে একটা ঘর ভাড়া করলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁর সঙ্গে জুটলেন এক সহযোগী। তিনিও ছিলেন বয়সে তরুণ আর গবেষণা পাগল তরুণটির অকৃত্রিম বন্ধু। প্রচুর টাকা পয়সার মালিক ছিলেন বন্ধুটি।

উভয়ের প্রচেষ্টায় তাঁদের গবেষণা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। একদিন তরুণটি একখানা তামার তারের দুপাশে দুটো পাতলা লোহার পাত বেঁধে ভাল ভাবে তার জড়ালেন। তারপর তামার তারে বিদ্যুত পাঠিয়ে একপাশে একটা শব্দ করলেন। তারের অপরপ্রান্তে যদিও শব্দটির পুনরাবৃত্তি হল তবুও সেইটি এত ক্ষীণ যে তরুণটির একেবারে মনঃপুত হলনা। কিন্তু উৎসাহ লাভ করলেন দ্বিগুণ ভাবে। নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, মানুষের কণ্ঠস্বরকেও দূরে প্রেরণ করা যেতে পারে।

আর চলল গবেষণা পুরোদমে। কতদিন পরে সার্থক হল তাঁর পরিশ্রম। আবিষ্কৃত হল টেলিফোন। টেলিফোনে প্রথম কথা বলেছিলেন এই দুই তরুণ বন্ধু একটি বাড়ীর উপর তলায় এবং নীচের তলায় থেকে।

আবিষ্কর্তা সেই তরুণটির নাম "গ্রেহাম বেল।"

সেদিনের সেই টেলিফোন যন্ত্রটিকে মানুষ সাদরে গ্রহণ করতে পারে নি। কতই না ব্যঙ্গ করেছিল মানুষ। বাজে খেলনা বলে উপহাস করতেও বাধেনি কারুর। বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও হেসে বলেছিলেন, "লোকটা বলে কি? মানুষের মুখের কথা পাঠিয়ে দেবে শ-শ-মাইল দূরে পাগল বোধ হয় এদেরই বলা হয়।"

সব উৎহাসকে সেদিন নীরবে মেনে নিয়েছিলেন গ্রেহাম বেল। তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধনের মূল্য কেউ দেয়নি। কিন্তু আজ? বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে পরিগণিত। আবিষ্কর্তা গ্রেহাম বেল চিরস্মরণীর হয়ে থাকবেন।

ফনোগ্রাফ

বার বছরের এক বালক রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ ফেরি করত। একবার এক স্টেশন মাষ্টারের ছোট ছেলেকে নিজের জীবন বিপন্ন করে ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বলে কৃতজ্ঞ ষ্টেশন মাষ্টার বালটিকে টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ জুটিয়ে দিলেন। বেতন যদিও খুব সামান্যই তবুও অত্যন্ত খুশী হল বালক।

টেলিগ্রাফ অফিসে রাতে আসত খবরের কাগজের জন্য খবর। যাঁরা রাতে কাজ করতেন তাঁরা বেতন পেতেন বেশী। বালকটি দেখল, রাতে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে না পারলে পদোন্নতির আশা নেই।

রাতে যে কয়জন কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি রাতে প্রায়ই বেহুস হয়ে পড়তেন। বালকটি তাঁকেই গিয়ে ধরল। বলল: স্যার; রাতে আপনার কাজ করতে বড় অসুবিধা হয় জানি। যদি দয়া করে আমাকে সাহায্যকারী হিসেবে

গ্রহণ করেন তাহলে খুবই উপকৃত হই।

ভদ্রলোক বালকটির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মনোভাবটি কী একবার ভাল করে খুলে বলতো দেখি? বালক লজ্জা পেল যেন। মৃদুস্বরে বলল: দিনের বেলা কাজ করে বিশেষ কিছু শেখা যায় না। সেই কারণে রাতে একটু কাজ করতে চাই। আপনি শুধু বসে দেখলেন। আমি আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে দেব। তার বদলে আমি কোন পরিশ্রমিকও দাবী করব না।

ভদ্রলোক এবার আনন্দিত হয়ে উঠলেন। রাতে মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তেন বলে কাজের অনেক গণ্ডগোল হত। এমন সুযোগ পেয়ে যেন হাতে স্বর্গলাভ করলেন তিনি।

দিন যায়। দিনে রাতে সব সময়ই বালকটি কাজ করে চলে। এখন ভদ্রলোক অফিসে আর আদৌ আসেন না। কেবল মাসের শেষে মাহিনাটা নিয়ে যান। এদিকে কিছুদিন কাজ করার পর একটা বড় রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হল বালক। অসুবিধার কারণটি ছিল, যে ভদ্রলোক রাতে খবর পাঠাতেন তিনি একদিন বদলি হয়ে গেলেন! তাঁর জায়গায় যে নতুন লোকটি এলেন, তিনি এত তাড়াতাড়ি খবর পাঠাতেন যে বালকটি তাঁর সঙ্গে তাল মিশিয়ে চলতে পারত না। একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতে হত তাকে।

উপায় না পেয়ে বালক বুদ্ধি করে দুটি পুরোন মোর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র সংগ্রহ করল। খবর আসত টরে টক্কার মাধ্যমে। বালকটি একটা যন্ত্র খুব পাতলা কাগজের ফালি কেটে পরিয়ে দিয়ে যন্ত্রটার সঙ্গে জুড়ে দিল। খবর এলে ঐ পাতলা কাগজে আপনা হতে দাগ কেটে যেত। অবসর সমনে কাগজটি খুলে নিয়ে অপর যন্ত্রে পরিয়ে দিত বালক। তারপর ধীরে ধীরে কাগজকে টানলে শব্দের পুনরাবৃত্তি হত! আর অসুবিধায় পড়তে হল না তাকে। এই ভাবে কাজ করায় রাতও জাগতে হল না। বালকের নিপুণতা দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত কিন্তু আসল ব্যাপারটা কেউ জানত না।

কিছুদিন পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় এল। চারদিকে ভয়নাক সাড়া। খবর জানাবার জন্য প্রতেকটি আমেরিকাবাসী উদ্‌গ্রীব। বিভিন্ন মহল থেকে তখন খবরও আসছে প্রচুর। কিন্তু হায় রে হায়। বিধাতার কী খেয়াল, ঠিক সেই সময়ই বালকটির একটি যন্ত্র হঠাৎ বিগড়ে গেল। পরদিন কোন খবর দিতে পারল না বালক। চারিদিকে হুলুস্থুল। উপরওয়ালারা কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। শেষে যখন বুঝতে পারলেন তখন ছেলেমানুষির জন্য বালকটিকে যথেষ্ট তিরস্কৃত করলেন এবং তার দায়িত্বজ্ঞান হীনতার জন্য তাড়িয়ে দিলেন অফিস থেকে।

কপর্দকশূন্য বালকটি এবার টো টো করে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলো নিউয়ইয়র্ক শহরে। কত জায়গা ঘুরল, কিন্তু চাকরী কোথাও জুটল না। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আর পথের উপর পড়েই রাত কাটায়। একদিন শুনতে পেল নিউইয়র্ক শহরের বড় টেলিগ্রাফ অফিসের যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে। যেখান থেকে যত ইঞ্জিনীয়ার আসছেন কেউই সারাতে পারছেন না। অফিসের ম্যানেজার পড়েছেন মহাভাবনায়। বালকটি কালবিলম্ব না করে দেখা করল ম্যানেজারের সঙ্গে। ম্যানেজারকে বলল, আমি একটিবার যন্ত্রটাকে দেখতে চাই স্যার।

বিস্মিত ম্যানেজার তাকালেন বালকটির দিকে। মনে মনে ভাবলেন, এত পাকা পাকা ইঞ্জিনিয়াররা কোথায় তলিয়ে গেলেন আর শেষে কিনা এই বালক দেখতে চায়! দুঃসাহস তো বড় কম নয়! হাসিও বুঝি পেয়েছিল তাঁর।

ম্যানেজারকে নীরব থাকতে দেখে বালকটি পুনরায় বলল, আপনি যদি অনুমতি দান করেন, তাহালে আমি এক্ষুনি গিয়ে যন্ত্রটা দেখে আসি।

বালকের আগ্রহ দেখে একটু কৌতূহল অনুভব করলেন ম্যানেজার। চিন্তা করলেন, এত লোক যখন দেখে যাচ্ছে এবং কিছুই করতে পারছে না তখন এই বালকটিকেই বা দেখাতে আপত্তি কেন? ম্যানেজার আর একবার ভাল করে তাকালেন ছেলেটির মুখের দিকে। যেন একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের

ছাপ দেখলেন তার চোখে মুখে। দ্বিরুক্তি না করে ম্যানেজার নিজেই নিয়ে গেলেন বিকল যন্ত্রটির কাছে।

বালক বেশ কিছুক্ষণ যন্ত্রটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তারপর এক সময় যন্ত্রটিকে ঠিক করে দিল। ম্যানেজার বালকটির নৈপুণ্যে বিস্ময়বোধ না করে পারলেন না। এইটুকু বয়সে টেলিগ্রাফের যন্ত্র সম্বন্ধে এত জ্ঞান? আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বালককে এবং সেই দিনই তাকে নিযুক্ত করলেন অফিসের পরিদর্শকরূপে। এত কম বয়সে এত দায়িত্বপূর্ণ পদ এই বালকটি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ আলঙ্কৃত করেছেন কিনা জানা নেই।

এই বালকটির নাম টমাস আলভা এডিসন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে এক উজ্জল নাম। তাঁর মত এত বেশী জিনিষ আবিষ্কারের গৌরব পৃথিবীর আর কোন বিজ্ঞানী অর্জন করতে পারেন নি।

এডিসনের বয়স যখন বত্রিশ তখন তিনি আমেরিকায় আর একটি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতেন। এখানেও টেলিগ্রাম আসত প্রচুর। অল্লায়াসে টেলিগ্রামগুলো সংগ্রহের জন্যে পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা মনে এল তাঁর। বুদ্ধি খাটিয়ে এবার আর এক ধরণের যন্ত্র তৈরি করলেন এডিসন। একটা সিলিণ্ডারেও গায়ে পাতলা কাগজ জড়িয়ে রাখতেন। পরে বার্তা আপনা হতেই লিপিবদ্ধ হয়ে যেত সেই কাগজে। পরে সুবিধেমত সিলিণ্ডার থেকেই খবরের সঙ্কেত উদ্ধার করতেন।

সেই সময় হঠাৎ তার মনে এল যন্ত্রের শব্দকে যদি লিপিবদ্ধ করা যায় তাহলে মানুষের কণ্ঠস্বরকে বা ধরে রাখা যাবে না কেন? এই বিষয়ে বেশ কিছুদিন পরীক্ষা চালালেন এডিসন। তারপর একদিন একটা খুব পাতলা চামড়াকে গোল একটা আংটার সঙ্গে টান টান করে বাঁধলেন। চামড়ার তলায় শক্ত ভাবে আটকে রাখলেন একটা লোহার পিন। পিনের তলায় থাকল মোম মাখান কাগজ। চামড়ার উপরে মুখে নিয়ে জোরে বলে উঠলেন 'হু—উ—উ। সেই শব্দে চামড়াটা ওঠানামা করল এবং মোম মাখান কাগজের উপর পিনের দাগ পড়ল।

এডিসন কাগজটিকে আর একটা যন্ত্রের ভেতর দিয়ে টেনে আনতে

দেখলেন, অস্পষ্ট হলেও শব্দের পুনরুদ্ধার হল। সেই তারিখটি ছিল ১৮৭৭ সালের ১৮ই জুলাই।

এরপর এডিসন যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করে আবিষ্কার করলেন ফনোগ্রাফ। যা দিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আজ আমরা কত গান, কত বাজনা, কত বক্তৃতা রেকর্ড করে নিচ্ছি। পুরানো দিনের কত মনীষীর গলার স্বরকে আমরা ধরে রেখেছি। এসবই সম্ভব হয়েছে এডিসনের প্রচেষ্টায়।

বর্তমানে যন্ত্রটির উন্নতি হয়েছে অনেকখানি। কিন্তু সেদিন কি কেউ বিশ্বাস করেছিল। এডিসন যখন ফনোগ্রাফ আবিষ্কার করলেন তখন অনেকেই বলেছিলেন "আরে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও। যন্ত্র কখনও মানুষের কণ্ঠস্বর নকল করতে পারে, না গাধাতেও গান গায়? এসব পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।"

এডিসনের আবিষ্কার যে কত সে কথার জবার তাড়াতাড়ি দেওয়া যাবে না। খুঁটিনাটি ভাবে হিসেব করলে তার আবিষ্কারের সংখ্যা ছু শয়ের কোঠাও ছাপিয়ে উঠবে। সবচেয়ে জনপ্রিয় যেগুলি সেগুলি হল ফনোগ্রাফ, বায়োস্কোপ এবং বৈছ্যতিক বাতি। যদিও বৈছ্যতিক বাতির সঙ্গে বিজ্ঞানী ডেভির নাম জড়িত তবুও বৈছুতিক বাতির উন্নতি সাধনের জন্য এডিসন যা করে গেছেন তার তুলনা নেই।

এডিসনের জীবনের একটি কাহিনী ছিল। যখন ছেলে বেলায় তিনি ট্রেনে কাগজ ফেরি করতেন সেই সময় একদিন অসাবধানতাবশতঃ ট্রেনের কামরায় আগুন ধরে গিয়েছিল। ক্রুদ্ধ গার্ড সাহেব তার গালে এমন এক চড় কষে দিয়েছিলেন যে বালক এডিসন চিরদিনের জন্য কালা হয়ে গেয়েছিল।

কালা লোকের দারুণ অস্থবিধা। বড় হয়ে নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে দিয়েছিলেন যন্ত্রের মাধ্যমে। বধিরদের কানে যে যন্ত্রটি লাগান থাকে ওটি এডিসনের আবিষ্কার।

বোধ হয় দ্বিতীয় এডিসন পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন না।

বাষ্পের শক্তি ও রেল ইঞ্জিন

জেমস নামে ছেলেটি ছিল বড় রোগা। সারাক্ষণ বসে থাকত মায়ের কাছটিতে। রোগা বলে মা তাকে কাছ ছাড়া করতে পারতেন না। কোথায় ছেলেরা মারধোর করবে, কোথায় রাস্তায় কোন অঘটন ঘটাবে এই ভয়ে মা অনেক দিন পর্যন্ত স্কুলেও পাঠাননি ছেলেকে। আবার জেমস এর স্বভাবটা এমন ঘরকুনো ছিল যে অষ্টপ্রহর মায়ের চার পাশেই ঘুর ঘুর করে বেড়াত।

একদিন একটা বড় লোহার কেটলিতে জল গরম করেছিলেন মা। কেটলির মুখে ছিল বেশ ভারি একটা ঢাকনা। বালক জেমস বসেছিল কাছে। সবিস্ময়ে দেখল বালক, জল যখন ফুটতে আরম্ভ করল তখন সেই ভারি ঢাকনাটা জোরে উঠতে পড়তে লাগল। বয়স কম হলেও বালক বুঝতে পেরেছিল ভেতরের জলীয় বাষ্পের চাপের জন্য এই কাণ্ডটা ঘটেছে। তবুও শিশুমন অবাক না হয়ে পারেনি। বাষ্পের এত শক্তি?

বোধ হয় মনে মনে ঠিক করেছিল সেদিন, বড় হলে বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগাবে। তাই পরবর্তীকালে যিনি বাষ্পের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম ইঞ্জিন প্রস্তুত করেছিলে তিনি জেমস ওয়াট—সেদিনের সেই রোগা ছেলেটি।

জেমস ওয়াট উদ্ভাবিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন একদিন সারা ইউরোপে একটা মস্ত বড় আলোড়ন তুলেছিল। যদিও সে ইঞ্জিন আজকের মত ছিল না। আবার সেগুলি ব্যবহৃত হত একমাত্র কারখানার কাজে। ইঞ্জিন দিয়ে যে গাড়ী টানা যায় সে চিন্তা মানুষের মনে এসেছিল অনেকদিন পরে।

ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী চালালোর ব্যাপরটা বেশ মজার। রেল ইঞ্জিন একদিনে আবিষ্কৃত হয়নি! তার পেছনে আছে বহুজনের বহু তপস্যা। শেষে সবার অভিজ্ঞতাকে অনুসরণ করে কালজয়ী খ্যাতি লাভ করেছেন জর্জ ষ্টিফেনসন

ইঞ্জিনকে নিয়ে সর্বপ্রথম গাড়ী চালানোর যিনি পরিকল্পনা করেছিলেন

মা

তিনি বোধ হয় ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার নিকোলাস কুনো। কুনোর গাড়ীটি ছিল তিন চাকার। একদিন কুনো কয়েকজন যাত্রী নিয়ে চেপে বসলেন গাড়ীতে। ঘণ্টায় চার মাইলের মত বেগ নিয়ে চলতে আরম্ভ করল গাড়ী। কিন্তু দুর্ভাগ্য কুনোর। এক সময় গাড়ীটা ধাক্কা খেল একটা দেওয়ালের গায়ে। বয়লার গেল ফেটে। যাত্রীরা ছিটকে পড়ল দূরে। যদিও প্রাণে রক্ষা পেলেন সবাই তবুও এই বিপজ্জনক জিনিসটার কথা শুনে শিউরে উঠল সবাই। এমনকি সরকারও পর্যন্ত ভীত না হয়ে পারল না। ফলে গাড়ীটা তো বাজেয়াপ্ত হলই কুনোকেও যেতে হল জেলখানায়।

কুনোর পরে আর এক ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করেছিলেন একটা বিশেষ ধরণের গাড়ী। ইঞ্জিনিয়ারের নাম উইলিয়ম মার্ডক। কুনোর চেয়ে মার্ডকের গাড়ী ছিল অনেক উন্নত এবং এইটিকেই রেল ইঞ্জিনের প্রাথমিক রূপ বলা যেতে পারে।

মার্ডক কিন্তু দিনের বেলা গাড়ী চালাতে সাহসী হননি। নিশুতি রাতে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন, ঠিক সেই সময় বার করলেন গাড়ী। ইঞ্জিনের চোঙ দিয়ে গনগনে লাল আগুনের ফুলকি ঝরতে লাগল, প্রচণ্ড শব্দে রাস্তা কাঁপতে লাগল থরথর করে। আর সে কি ধোঁয়া!

বিকট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল গাঁয়ের লোকের। তারা সদ্য ঘুম ভাঙ্গা চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল। বুঝি কোন একটা দানব বেরিয়েছে পথে। ঘরের খিল বন্ধ করে মা মেরি এবং তৎপুত্র যীশুর নাম করতে লাগল সবাই।

এদিকে গাড়ীটা যখন শব্দ করতে করতে বড় গির্জার কাছে পৌছোল তখন পাদ্রী সাহেবেরও ঘুম ছুটে গেল। সেই ভয়ঙ্কর দানবটাকে দেখে ভাবলেন বুঝি শয়তান মশাল জ্বেলে পথ পরিক্রমা করছে। এবার আর রক্ষা নেই। পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য। মাথায় হাত দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন পাদ্রী সাহেব।

সকাল হতে মানুষ সন্তর্পনে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল। এখানে ওখানে জটলা বেঁধে গতকাল রাতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার ফিনা হাজার

গুণ বাড়িয়ে আলোচনা করতে লাগল। কাজকর্ম কোথায় পড়ে রইল স্বাভাবিক জীবন যাত্রাও হল ব্যাহত। কিন্তু কোথায় আত্মগোপন করল শয়তানটা ?

শেষে আবিষ্কৃত হল কাজটা শয়তানের নয়, মর্ডাকের। পাদ্রী সাহেব ভাবলেন, মার্ডকের দেহেই শয়তান ভর করেছে। ওঁকে শয়তান মুক্ত করতে না পারলে দেশের সর্বনাশ হবে। শয়তানের রোষ শান্তির ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে বসলেন পাদ্রী সাহেব।

এরপর কেটে গেল অনেকদিন। ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হল। ঠেলা গাড়ীতে করে কয়লা বহে আনতে সুবিধে হবে। কয়লার খনিতে কাজ করতেন এক ইঞ্জিনিয়ার নাম তাঁর জর্জ স্টিফেনসন। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন, তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি ইঞ্জিনের সাহায্যে এক সঙ্গে বহু কয়লা বহন করে নিয়ে যেতে পারেন।

কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন স্ট্রিফেনসন যদি কৃতকার্য হয় তাহলে অনেক খরচ বেঁচে যাবে। তাই নির্দেশ দিলেন স্টিফেনসন ইচ্ছে করলে ইঞ্জিন তৈরি করতে পারেন।

শ'-শ' টন কয়লা নিয়ে ছুটবে গাড়ী। কথাটা কিভাবে যেন রটে গেল। দূর দূরান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শক ভীড় করল পথের দুপাশে। অদ্ভুত যন্ত্রটাকে তারা দেখবেই।

এক সময় স্টিফেনসন চেপে বসলেন গাড়ীতে। হুস হুস করে ধোঁয়া ছাড়াতে ছাড়াতে এগিয়ে চলল গাড়ী। এক ঘোড়সওয়ার লাল নিশানা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল আগে আগে। রাস্তার দুপাশের জনতাকে সাবধান করাই ছিল উদ্দেশ্য। স্টিফেনসনও ভেবেছিলেন গাড়ীর গতির সঙ্গে ঘোড়া পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে সক্ষম হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ীর বেগ এত বেড়ে উঠল যে ঘোড়সওয়ারকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হল। নির্দিষ্ট সময়ের ঢের আগে ফেরার পথে নিয়ে এলেন শত শত যাত্রী।

এমন আশ্চর্যজনক গাড়ী সেদিন মানুষের কল্পনার বাহিরে ছিল।

একদিকে গাড়ী দেখে তাদের মনে এল বিস্ময় এবং অপরদিকে ভয়। এমন কি পার্লামেন্টের সদস্যরাও পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন খনি কর্তৃপক্ষ এবং স্টিফেনসন সবারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে! একযোগে মন্তব্য করল রাস্তায় ইঞ্জিন চলাচল করলে পথের ছুপাশে গ্রাম গুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গরু বাছুর বার হতে পারবে না পুকুরের জল হবে দূষিত ফসলও ফলবে না মাঠে।

স্টিফেনসনের সর্বনাসা বুদ্ধির জন্য সেদিন সারা দেশ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এখন অবশ্য এমন কথা কেউ ভুলেও উচ্চারণ করবেন না। পরন্তু একটা দিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলে কি পরিমাণ দেশের আর্থিক ক্ষতি এবং যাত্রীদের অসুবিধা হবে তারই হিসেব দাখিল করবেন।

কোথায় সেই ফুটন্ত জলের কেটলি আর কোথায় আজকের লৌহতুরঙ্গ! আশ্চর্য!

মোটর গাড়ী

মানুষ চায় গতি। পায়ে হেঁটে পথ চলার আবার অনেক কষ্ট। তাই আমরা দেখতে পাই সভ্যতা বিকাশের পর থেকে মানুষ চলার পরিশ্রম লাঘব করতে এবং গতি বাড়াতে নানা রকম চেষ্টা করে এসেছে। আদি যুগেও মানুষ বুদ্ধি করে চাকা তৈরি করেছিল। বুঝেছিল চাকাকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়া অনেকে সহজ। প্রথমে ঠেলাগাড়ী তারপর চাকার সঙ্গে গরুকে জুড়ল। আরও পরে গরুর বদলে ঘোড়া ব্যবহার করে গতিকে বেশ কিছুটা বাড়িয়ে নিল।

কিন্তু ঘোড়া পুষতে খরচ অনেক। অল্প খরচে অথবা বিনা খরচে দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া আসা করতে মানুষ অনেকে দিন থেকে কোন যানের কথা চিন্তা করেছিল। যার চালক কোন পশু না হয়ে নিজেই হওয়া যাবে। তারই প্রথম প্রয়াস সাইকেল নির্মাণ।

সাইকেলেও কষ্ট অনেক। কিছুদিন পরে সাইকেলের গতিও মানুষের পছন্দ হল না। সে আরও চায় গতি।

একদিন বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হল। মানুষ নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল ইঞ্জিন দিয়ে গাড়ী চালান যায় কিনা! গাড়ীতে যিনি ইঞ্জিন জুড়ে ছিলেন তিনি বোধ হয় ফ্রান্সের সেই ভদ্রলোক—নিকোলাস কুনো যাঁর নাম। সেটি ছিল তিন চাকার গাড়ী এবং চাকাগুলো ছিল নিরেট লোহার। রবারের টায়ার টিউবের পরিকল্পনা অনেক পরে।

নিকোলাস কুনোর যে কি পরিনাম হয়েছিল সে কথা আগেই জানানো হয়েছে। সেদিন ফ্রান্সের সরকার গাড়ীটিকে কেবলমাত্র বাজেয়াপ্ত করেননি, ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি যাতে এই ধরনের গাড়ী তৈরি না করেন তার জন্য কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। যদিও কুনোর সেই গাড়ীটি বর্তমানে সযত্নে রক্ষিত আছে ফ্রান্সের যাদুঘরে।

ফ্রান্সে গাড়ী তৈরি নিষিদ্ধ হলেও অপর দেশ শুনবে কেন? কোন দেশেই উৎসাহী মানুষের সংখ্যা কম নয়। তার উপর গাড়ী চড়ায় যে অনেক আনন্দ। জার্মান দেশের এই ইঞ্জিনিয়ার ডঃ নিকলাউস অটো একদিন কুনোর মতই বানিয়ে ফেললেন একটা তিন চাকার গাড়ী। ইঞ্জিনও বসালেন এবং গাড়ী চালিয়ে বেশ কিছুটা পথ পরিক্রমাও করলেন। সৌভাগ্যবান অটো সাহেব; তাঁর গাড়ী কিন্তু কোন দুর্ঘটনায় পড়ল না। দেখতে দেখতে অটো সাহেবের গাড়ীর খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং হু হু বিক্রি হতে লাগল গাড়ী। আজও কিছু কিছু অটো সাহেবের নামে চলে।

অটো সাহেবের পর যাঁর গাড়ী সুনাম করেছিল তিনি হচ্ছেন কার্লবেঞ্জ। ইনিও ছিলেন জার্মান দেশের লোক। শোনা যায় বেঞ্জ সাহেবের গাড়ীর প্রথম চালক তাঁরই দুজন বালক পুত্র। বেঞ্জ সাহেব গাড়ী তৈরি করলেও চালাতে সাহসী হননি। গাড়ীটি পড়ে ছিল ঘরে। একদিন বেঞ্জ সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুত্রদ্বয় বেরিয়ে পড়ে প্রায় দুশ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করে যখন ফিরে আসে তখন দেখে

বেঞ্জ সাহেব ফিরে এসেছেন বাড়ীতে।

গাড়ী আর ছেলেদের কাউকে না দেখে বেঞ্জ সাহেব মাথা খারাপ করে বসেছিলেন। ছেলেদের ফিরতে দেখে তাঁর মাথায় খুন চেপে গেল। তারপর ছেলেদের সে কি মার! মারের চোটে সাতদিন সাতরাত ধরে বিছানায় শুয়েছিল ছেলেরা।

কার্ল বেঞ্জের পর গাড়ীর উন্নতি সাধন করেন প্রসিদ্ধ জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ডেমলার সাহেব। প্রথম জীবনে তিনি অটো সাহেবের কারখানায় কাজ করতেন। পরে নিজেই একটি কারখানা খুলে বসেন। ডেমলার সাহেবেই প্রথম গাড়ীর জন্য পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করেন। আজকের মোটর গাড়ীর প্রকৃত রূপকার ডেমলার সাহেব। তাঁর আগে সব গাড়ীই ছিল তিন চাকার। একমাত্র ডেমলারই প্রথম চারটে চাকা ব্যবহার করেন।

ডেমলার সাহেবের গাড়ী এত ভাল হয়েছিল যে, দেশ বিদেশ থেকে এসেছিল প্রচুর চাহিদা। একা ডেমলার সে চাহিদা মেটাতে সক্ষম হলেন না। ডেকে আনলেন বেঞ্জ সাহেবকে। দুটি কারখানা এক হল। উভয়ের তত্ত্বাবধানে যে গাড়ী তৈরি হল তার নাম "মার্সিডিজ বেঞ্জ" গাড়ী। মার্সিডিজ ছিলেন ডেমলার সাহেবের মেয়ে।

মোটর গাড়ীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেন হেনরি ফোর্ড। এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম তাঁর। মাঠে কাজ করতেন আর গরু চরাতেন। ছেলেবেলা থেকে ছিল যন্ত্রপাতির দিকে ঝোঁক। পরিণত বয়সে তিনি এক মোটর কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হন।

অধ্যবসায় মানুষকে যে কতখানি বড় করে তার প্রমাণ হেনরি ফোর্ড। এমন সৌভাগ্যবান এই কৃষকপুত্র! যাঁর নাম পৃথিবীর সবদেশের লোকের মুখে মুখে আজও ঘুরছে।

সাইকেল

যেদিন মানুষ গাড়ীর চাকা তৈরি করল, সেদিন চাকার সঙ্গে জুড়ে দিল গরু, ঘোড়া কিংবা উটকে। সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। একদিন মানুষ ভাবল নিজের তৈরী গাড়ীর নিজেই হবে সারথি। সাইকেলের কল্পনা সেই দিনই মাথায় এল।

সাইকেলের ইতিহাস তাই সুদীর্ঘ কালের। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে বিভিন্ন জনে, বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আজকের সাইকেল, যার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার আবিষ্কার হয়েছে মাত্র একশ বছর আগে। সুদীর্ঘকাল ধরে সাইকেলের যেভাবে অনুশীলন চলেছিল তা যেমনই মজার তেমনই চমকপ্রদ।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এক ফরাসী ভদ্রলোক সাইকেল জাতীয় এক ধরণের গাড়ী তৈরি করেছিলেন। তাকে অবশ্য ঠিক সাইকেল বলা যায় না। তবে সামনা সামনি দুটি চাকাকে, একটা কাঠের দণ্ডের দুপাশে লাগিয়েছিলেন। দণ্ডের মাঝখানে বেঁধে দিয়েছিলেন এক রাশ ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি। কাঠের উপর বসে থাকা অসুবিধে বলে ন্যাকড়া জড়িয়ে "সিটের" ব্যবস্থা করেছিলেন।

সেই গাড়ীতে হাতল, ব্রেক, প্যাডেল, কিছু ছিল না। সামনে হাতলের বদলে এক টুকরো কাঠ বেঁধে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। কাঠ ধরে মাঝে মাঝে মাটিতে পা ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঠ্যালা দিতেন। ভদ্রলোক কিন্তু ঐ গাড়ী ছাড়া এক পাও হাঁটতেন না।

তাঁর অদ্ভুত যানটি দেখে অনেকে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে সারা ফ্রান্সে সাইকেল তৈরির হিড়িক পড়ে গেল। বুদ্ধিমানেরা আরও উন্নত ধরনের তৈরি করল, কেউ বা একটির পরিবর্তে দুটি আসন লাগল। তবে মাটিতে পা ঠেকিয়ে ঠেলে ঠেলে সাইকেলকে নিয়ে যেতে হত সবাইকে। এমন কি হাতলও ছিল না কারুর।

স্থাভারব্রন নামে এক ভদ্রলোক তৈরি করলেন বিশেষ ধরনের সাইকেল। এই সাইলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এর গতিবেগ। একটা হাতল অবশ্য লাগান হয়েছিল এবং চাকার নীচে জড়ান ছিল লোহার পাত। স্থাভারব্রনের সাইকেলের গতিবেগ বেশী হওয়ার জন্য অনেকের দৃষ্টি পড়েছিল সেদিকে। যাদের টাকাকড়ি আছে তারা এই ধরণের একটা সাইকেল যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। স্যাভারব্রনকে খুলতে হল সাইকেল তৈরির কারখানা। চড়া দামে বিক্রি করে বেশ দুপয়সা ঘরে আনলেন স্যাভারব্রন।

স্যাভারব্রনের গাড়িটির নাম কিন্তু সাইকেল ছিল না। লোকে বলত ডাণ্ডিহর্স বা বাবুঘোড়া। সে সময় ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই দুই জায়গায় সাইকেলের প্রচলন হয়েছিল বেশী। তবে ডাণ্ডিহর্সেও প্যাডেল ছিল না। পূর্বের মত মাটিতে পা দিয়ে সামনে ঠেলা দিতে হত। অর্থাৎ বলা যেতে পারে সাইকেল জন্ম লাভ করার পর প্রায় শত বছরেরও বেশী সময় ধরে কাটিয়েছে আঁতুড়ে ঘরে।

আধুনিক সাইকেলের প্রকৃত রূপদান করেন স্কটল্যাণ্ডের ম্যাকমিলান সাহেব। মানুষ অবশ্য স্যাভরব্রনের সাইকেল নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। সবচেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছিল বোধ হয় ঐ পা দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে সাইকেল চালনা করা। গাড়ী চড়ার বেশীর ভাগ আনন্দই ঐখানে মাটি হয়ে যেত। ম্যাকমিলান সাহেবই প্রথম প্যাডেল যোগ করে সাইকেলের প্রধান অসুবিধা দূর করেন। ম্যাকমিলান সাহেবের পর ভ্যানজেল সাহেব হাতল এবং প্যাডেলের আরও উন্নতি সাধন করলেন।

ততদিনেও সাইকেলের চাকার তলায় টিউব ও টায়ার পরান হয়নি। এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ডানলপ সাহেব। চাকার তলায় রবারের টায়ার পরান সম্বন্ধে একটি গল্পও আছে।

ডানলপ সাহেব ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের লোক। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন ঘোড়ার ডাক্তার। জনি নামে তাঁর এক ছেলে ছিল। ছেলেটি তখন স্কুলে পড়ত। ডাক্তার ছেলেকে বড় ভালবাসতেন। স্কুলটা একটু দূরে

বলে ডানলপ সাহেব ছেলেকে কিনে দিয়েছিলেন একটা সাইকেল। জনিও ভাল সাইকেল চালাতে পারত। একদিন জনি এসে বাবাকে ধরল : বাবা, আমার সাইকেলটাতে বড় বেশী ঝাঁকুনি লাগে। স্কুলে সাইকেল রেস হবে। তুমি একটা নতুন সাইকেল আমাকে কিনে দাও।

ডানলপ সাহেব ভাবলেন, জনিকে নতুন সাইকেল কিনে দিলেও ঝাঁকুনি কম লাগবে না। তার চেয়ে ঝাঁকুনি বন্ধ করার উপায় চিন্তা করা যেতে পারে। কয়েকদিন ধরে খুব করে ভাবলেন ডানলপ সাহেব। এদিকে সাইকেল রেসের দিনও এল এগিয়ে। জনির বায়নাও গেল বেড়ে।

অবশেষে সাইকেল রেসের আগের দিন ডানলপ সাহেব করলেন কী, বাগানে জল দেওয়ার জন্য যে রবারের পাইপটা ছিল তা থেকে এক টুকরো কেটে আনলেন। তারপর জনির সেই পুরান সাইকেলের চাকার তলায় নলটিকে শক্ত করে বেঁধে দিলেন। জনিকে বললেন : এবার সাইকেলে চেপে দেখ দেখি, ঝাঁকুনি কম হয় কি না?

সাইকেলে চেপে খুসী হয়ে উঠল জনি। বলল সে, এত সুন্দর আর এত আরাম কোন সাইকেলে হয় না।

বলা বাহুল্য. সাইকেল রেসে জনিই প্রথম হয়েছিল। অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় জনির সাইকেল এত জোরে ছুটেছিল যে, দর্শকরা উত্তেজিত না হয়ে পারে নি।

সেদিন ডানলপ সাহেবের মাথায়ও অন্য চিন্তা এল। তিনি একটা সাইকেল কারখানার সঙ্গে যোগাযোগ করে সাইকেলের তলায় টায়ার টিউব পরাতে লাগলেন। এবার একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করলেন ডানলপ। টায়ার টিউব কেবল সাইকেলের চাকায় পরান হল না, মোটর গাড়ীর চাকায়ও পরান হল।

সাইকেল ও মোটর গাড়ীর চালক মাত্রই জানেন, ডানলপ কোম্পানীর টায়ার ও টিউব বাজারের সেরা। এখনও দেশে দেশে এই কোম্পানী টিউব সরবরাহ করে থাকে।

উড়ো জাহাজ

পাখীরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। সুন্দর ডানা দুটি দিয়ে বায়ু সমুদ্রে সাঁতার কেটে যখন নীল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলে যায় তখন আমরা হাঁ করে তাকিয়ে দেখি। তার ডানার ছন্দ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে। মানুষেরও একদিন সখ হয়েছিল সে পাখীর মত উড়ে বেড়ায়। কিন্তু পাখীর মত তার তো ডানা নেই, তবে কেমন করে সে উড়বে?

এমন কল্পনা বোধ হয় মানুষের মনে সেই আদিকাল থেকেই ছিল। চেয়েছিল পাখীর মত ডানা জুড়ে দিয়ে মহাশূন্যে গা ভাসিয়ে দেয়। ইতালি দেশের প্রখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বোধ হয় এই পরিকল্পনাটির মূলে ছিলেন। একটা ছবিও তিনি এঁকেছিলেন। সেদিন সেই ছবি দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন অনেকে। প্রথমে বেসিমার নামে এক ভদ্রলোক লোহার ফ্রেমে কাপড় জড়িয়ে পাখার মত দুটি ডানা তৈরি করেছিলেন। তারপর ঐ ডানা দুটো দুহাতে বেঁধে চেষ্টা করলেন উড়তে। কিন্তু বেশী কৃতিত্ব তিনি দেখাতে পারলেন না। কেবল এক বাড়ীর ছাদ থেকে উড়ে গিয়ে অন্য বাড়ীর ছাদে পৌঁছালেন।

ব্যাকভিলে নামে আরও একজন ফরাসী ভদ্রলোক তৈরী করেছিলেন দুটো কৃত্রিম ডানা। সাহসে ভর করে একদিন তিনি গেলেন সীন নদী পার হতে। কিন্তু পার হতে পারলেন না। নদীর মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেলেন। আবার পড়বি তো পড় একখানা বজরার উপরে! বেচারা ব্যাকভিলে যদিও প্রাণে বাঁচলেন তবুও জখম বড় কম হলেন না।

এই ঘটনার পর মানুষ বুঝতে পারল ডানা জুড়ে ওড়ার চেষ্টাটা ভয়ানক বিপজ্জনক। কোনদিন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। তখন অন্য উপায় চিন্তা করতে লাগল মানুষ।

ফরাসী দেশের দুই ভাই অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে একদিন তৈরী করলেন একটা বেলুন। খড় কুটো জ্বালিয়ে ধোঁয়ায় ভর্তি করলেন বেলুনটা।

তারপর দুভাই ওতে চেপে বসলেন। গরম ধোঁয়া ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়ে হালকা বলে আকাশে উঠল বেলুন। বেশ কিছুদূর অনুকূল হওয়ায় চালিত হয়ে তাঁরা পুনরায় নেমে এলেন মাটিতে। যারা দেখল, তারাই হাত তালি দিয়ে উঠল। কি মজা। কি মজা!

দুভায়ের দেখাদেখি সারা ইউরোপে বেলুন তৈরির ধুম পড়ে গেল। কত লোক আকাশে উঠল, কত লোকে কত রকমের বিপত্তি ঘটাল, কারুর বা প্রাণ নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলল। একদিন রোজিয়ার নামে এক ভদ্রলোক ধোঁয়ার পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস পুরলেন। ধিক হতভাগা রোজিয়ার! আকাশে উঠতেই বেলুনে আগুন ধরে গেল। একটা পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে মারা গেলেন তিনি। এত বিপদ সত্বেও দমলেন না প্রস্তুতকারকরা। রোজিয়ার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে জেফ্রিস নামে এক মার্কিন যুবক বেলুনে চেপে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে গেলেন।

জেফ্রিসের পর কেটে গেল প্রায় শত বছর। তবু বেলুনের যুগ শেষ হল না। দুই অসমসাহসিক যুবক কক্সওয়েল এবং গ্লানিয়ার হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুনে চেপে প্রায় সাত মাইল উপরে উঠলেন। এত উপরে বাতাসে যে অক্সিজেনের ভাগ কম সে কথা তাঁরা জানতেন না উঠরে উঠে দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শেষে কক্সওয়েল বুদ্ধি করে গ্যাসটা বার করে দিতেন বেলুনটা ধীরে ধীরে নেমে এল মাটিতে। যাই হোক সে যাত্রা রক্ষা পেলেন উভয়ে।

যতদিন কাটতে লাগল, ততই বেলুনের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়তে লাগল মানুষের। বেলুনের সাহয্যে আকাশে ওঠা যায় ঠিকই, তবে ওকে একেবারেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অনুকূল হাওয়ায় ভর করে উড়ে চলে মাত্র। মাটিতে যেমন গাড়ী চালিয়ে যাওয়া যায়, সেই ভাবে বিশেষ যানকে ইঞ্জিনের সাহায্যে আকাশে ওড়ানোর কথা চিন্তা করতে বসলেন অনেকে।

অটো লিলিয়েন্থাল নামে এক ভদ্রলোক এই উদ্দেশ্যে গ্লাইডার তৈরি করলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্লাইডার ইঞ্জিন বসিয়ে প্রথম আকাশে ওড়ার

পরিকল্পনা তাঁরই। কিন্তু প্রথম দিনই উড়তে গিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে মারা গেলেন লিলিয়েন্থাল।

আকাশে ওড়ার এত বিপদ জেনেও মানুষ হার মানল না। বরং তার উৎসাহ আরও বেড়ে চলল। লিলিয়েন্থালের আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টি গেল সবার। এত সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে কোথায় ছিল ত্রুটি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাঁরা গ্লাইডারকে নিয়ে দেখতে লাগলেন অনেকে। শেষ জয়লাভ করলেন আমেরিকার সাইকেল দোকানদার দু'ভাই উইলবার রাইট। বিমান নির্মাণের ইতিহাসে এঁরা দু ভাই রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত। অটো লিলিয়েন্থালের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে গিয়ে এঁরাই প্রথম আকাশে ওড়ালেন বিমান। মানুষের দীর্ঘদিনের আশা সফল হল। পাখীর মত সেও ইচ্ছামত উড়ে চলল আকাশে।

রকেট

মানুষ এখন কৃত্রিম উপগ্রহে চেপে গ্রহে গ্রহে হানা দেওয়ার জন্য তৎপর। এরই মধ্যে সে চাঁদকে দেখে এসেছে। মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতির দিকে উপগ্রহ পাঠিয়েছে এবং পাঠাচ্ছে। মহাকাশে আবার এমন কতকগুলো উপগ্রহ স্থাপন করেছে, যেগুলো একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে অহরহ পৃথিবী পরিক্রমায় রত। এখন প্রশ্ন, মানুষ পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল উপরে কেমন করে কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

কোন ইঞ্জিনের সাধ্য নেই মহাকাশ যানগুলোকে এত উপরে উৎক্ষিপ্ত করে। তার প্রধান বাধা হল পৃথিবী তার বুকের প্রত্যেকটি পদার্থ এমনকি অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণাকেও আকর্ষণ করছে প্রবলভাবে। সে আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করতে হলে সেকেণ্ডে অন্তত সাত মাইলের মত গতিবেগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এত দুর্দান্ত বেগ কোন ইঞ্জিন দিতে পারে না। তাই অনেক

ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানীরা মহাকাশযানকে উৎক্ষিপ্ত করতে যে বাহনটি ঠিক করেছেন সেটির নাম রকেট। রকেটের বাংলা নাম হাউই।

রকেটের মধ্যে মধ্যে পুরে দেওয়া হয় বিস্ফোরক পদার্থ এবং তরল জ্বালানী। যখন ওকে অগ্নিসংযোগ করা হয় তখন দহনের ফলে উৎপন্ন হয় প্রচুর গ্যাস। সেই গ্যাস বাহিরে বেরিয়ে আসার জন্য রকেটের ভেতর চাপ দেয় প্রচণ্ড ভাবে। কিন্তু রকেটের পেছনে একটা ছোট ছিদ্র ছাড়া গ্যাস নির্গমনের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। গ্যাসগুলো যখন সেই ছিদ্র দিয়ে তীব্রবেগে বাহিরে বেরিয়ে আসে তখন বিপরীত মুখী প্রতিক্রিয়ার জন্য রকেট ছুটে চলে সোজা উপরের দিকে।

তবে রকেটে উপরে ওঠারও একটা সীমা আছে। জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে গ্যাস নির্গমন বন্ধ হয়ে যাবে এবং গতিও হ্রাস পাবে। পৃথিবীর আকর্ষণের আওতার বাহিরে মহাকাশযানকে ছেড়ে আসতে একটি রকেটের কর্ম নয়। সেই কারণে মহাকাশযানের তলায় অনেকগুলি রকেটকে সাজিয়ে রাখা হয়। এমন ব্যবস্থা থাকে যে প্রথমটির জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে দ্বিতীয়টিতে আপনা হতেই অগ্নি সংযোগ হয়ে যায়। তারপর দ্বিতীয়টি শেষ হলে তৃতীয়টি, তৃতীয়টি শেষ হলে চতুর্থটি ইত্যাদি। এইভাবে পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে কাটাতে হলে বেশ কয়েকটি রকেটের প্রয়োজন হয়।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রকেট ছাড়া মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার দ্বিতীয় কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি। এই রকেট কিন্তু আজকের আবিষ্কার নয়। অন্যান্যদের মত এর আবিষ্কারের ইতিহাসও সুদীর্ঘ।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত গ্রীক পুরাণে রকেটের উল্লেখ আছে। ভারতীয় পুরাণে যে সব অগ্নিবানের উল্লেখ আছে সেগুলোও এক ধরণের রকেট বা হাউই ছাড়া কিছু নয়। তবে দীর্ঘকাল ধরে রকেট যুদ্ধাস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার হয়ে এসেছে।

রকেটের সাহায্যে উপরে ওঠার প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন চীন দেশের একজন রাজা, নাম তাঁর ওয়ানহু। শোনা যায় তিনি ছিলেন

বড্ড খেয়ালি। একবার তাঁর মাথায় খেয়াল চাপল তিনি হাউইতে চেপে স্বর্গে যাবেন। সভাসদরা অনেক করে বোঝালেন। কিন্তু রাজা সেই যে এক গোঁ ধরে বসলেন তা থেকে এক চুলও নড়ান গেল না।

সেটা ইংরাজী ১৫০০ সাল। রাজার নির্দেশে তৈরী হল প্রকাণ্ড এক ঘুড়ি। ঘুড়ির নীচে থরে থরে সাজান হল একগাদা হাউই। রাজা ঘুড়ির উপরে চেপে বসতেই হাউইতে অগ্নি সংযোগ করা হল তারপর মুহূর্ত মধ্যে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিকে। রাজা উড়ে চললেন আকাশে।

তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে সবাই নীরব। মনে হয় রাজা ওয়ানহুর মৃতদেহটাই ফিরে এসেছিল পৃথিবীর বুকে। সে যাই হোক না কেন, রকেটের সাহায্যে আকাশে ওড়ার গৌরব প্রথম লাভ করেছেন ওয়ানহু।

অনেকের মতে, রকেট চর্চা প্রথমে চীনদেশে আরম্ভ হয়েছিল। চীন থেকেই একদিন ছড়িয়ে পড়ে ইংলণ্ড, ইতালী, জার্মান প্রভৃতি দেশে। তবে (১) সেযুগে সবাই রকেটকে ব্যবহার করেছিল (২) একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে।

আধুনিক কালে য়োজার বেকনই রকেটের উন্নত রূপদান করেন। তিনি ছিলেন জার্মান দেশের লোক। তাঁর পর কনরাড কাইজার নামে আর একজন জার্মানী রকেটের সাহায্যে দূরে খবর পাঠানোর জন্য উদ্যোগী হন। প্রকৃতপক্ষে রকেটের উন্নতিসাধন করেছেন জার্মানীরাই। এমন কি 'রকেট' এই নামটিও জার্মান প্রদত্ত।

রকেটের নবজন্ম লাভ হল বিংশ শতাব্দীতে রুশ, ফরাসী, মার্কিন এবং জার্মান দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণার দ্বারা। ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রকেটকে ক্ষেপণাস্ত্রের কাজে ব্যবহার হয়। মধ্যভাগে মানুষ যখন মহাকাশে ঘুরে বেড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করল তখন সবার দৃষ্টি পড়ল ঐ রকেটের উপর। তাঁরা ঠিক করলেন, একমাত্র রকেটই পারে পৃথিবীর আকর্ষণ বল ছিন্ন করতে।

রকেটকে নিয়ে আবার নতুন করে আরম্ভ হল গবেষণা। আজ রকেটের কৌলিন্য অনেকখানি বেড়ে গেছে। বাজিকর কিংবা যোদ্ধাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থান লাভ করেছে বিশাল এক কর্মক্ষেত্রে। মহাকাশে ভ্রমণ করতে হলে একমাত্র রকেটকেই বাহন করতে হয়। দ্বিতীয় কোন উপায় আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে রকেটের উন্নতির মূলে বিজ্ঞানী গজর্ডে'র অবদানই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ডায়নামো

এতকালে চুম্বক ও তড়িৎ এই দুই শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য অনেক বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন সে যুগের এক নামকরা বিজ্ঞানী স্যার মাইকেল ফ্যারাডে। ফ্যারাডে আবার ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেভির শিষ্য এবং অনেকদিন ধরে গুরুর সঙ্গে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণাও করেছিলেন।

একদিন ফ্যারাডে একটা ফাঁপা (১) সলিনয়েডের চারপাশে বেশ কয়েক পাক তামার তার জড়িয়ে তারের দুপ্রান্তকে একটা অ্যাম্‌মিটারের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। অ্যাম্‌মিটার হচ্ছে এমন এক যন্ত্র নিরূপন করা যায়। কাছে কয়েকটি চুম্বক ছিল, আর ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র।

এটা ওটা নিয়ে পরীক্ষা করার সময় কী খেয়াল হল তাঁর একটা চুম্বককে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে আরম্ভ করলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, তামার তার জড়ান সলিনয়েডের চোঙের উপর চুম্বক সমেত হাতটা যেতেই অ্যামমিটারের কাঁটা নড়ে উঠল। তবে তো বিদ্যুৎপ্রবাহ হচ্ছে। কিন্তু কোথা থেকে এল এই প্রবাহ। বিস্ময়বোধ বড় কম হল না। কারণ সলিনয়েডের সঙ্গে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের যোগ ছিল না।

অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা হলেও ফ্যারাডে পরীক্ষা নিয়ে মেতে উঠল।

দেখলেন চুম্বকটি সলিনয়েডের কাছে আনলে অ্যামমিটারে কাঁটার যে দিকে বিক্ষেপ হয়, দূরে সরিয়ে নিলে হচ্ছে বিপরীত দিকে। চুম্বককে এক জায়গায় ধরে রাখলে বা সলিনয়েডের উপরে রেখে দিলে কোন বিক্ষেপ হয় না। ভারি মজা পেলেন ফ্যারাডে।

কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের একটা বড় প্রদর্শনীতে ফ্যারাডে দেখালেন এই পরীক্ষাটা। সবাই দেখল, বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র ছাড়াও চুম্বকের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তড়িৎ সম্বন্ধে কতটুকুই বা বোঝেন? পরীক্ষাটি দেখে বিশেষ কেউ উৎসাহ বোধ করলেন না। ফ্যারাডে আবার মস্ত বড় বিজ্ঞানী। দেশজোড়া তাঁর নাম ডাক। এমন যে বিজ্ঞানী, তাঁর ছেলেমানুষি দেখে আড়ালে লোকে চোখ টিপে হাসল।

এক মহিলা, সে মনে হয় ফ্যারাডে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর রাখত না। পরীক্ষাটি তার আদৌ মনঃপুত হয়নি। ঠোঁট দুটি বাঁকা করে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, পরীক্ষাটি না হয় দেখলাম। কিন্তু কী কাজে লাগবে মানুষের?

স্থির দৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন ফ্যারাডে। তারপর অত্যন্ত শান্ত ও সংযত সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আপনারা কেন ছোট শিশুকে লালন-পালন করেন?

মহিলাটি ফ্যারাডের কথার কোন জবাব না দিয়ে সেদিন চলে গেছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী প্রদর্শনী দেখতে এসে সেই একই প্রশ্ন রেখেছিলেন ফ্যারাডের সামনে। একটি সাধারণ মহিলার মুখে যে কথা মানায়, একজন প্রধান মন্ত্রীর মুখে সে কথা আশা করেন নি ফ্যারাডে, একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন তিনি।

বিরক্তির ভাব মুখে এনে ফ্যারাডে উত্তর দিয়েছিলেন: এই তুচ্ছ পরীক্ষাটিকে আজ আপনি হেয় করছেন, কিন্তু এমন দিনও আসতে পারে যেদিন এই পরীক্ষাটিকে ভিত্তি করে আবিষ্কৃত হবে কোন একটি বিশেষ যন্ত্র। ততদিন যদি আপনি প্রধান মন্ত্রীর আসনে থাকেন তাহলে হয়ত

কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করতে পারবেন।

ফ্যারাডের কথা মিথ্যে হয়নি। মানুষ অচিরে বুঝতে পারল, কোন শক্তিশালী চুম্বকের কাছে তারের কুণ্ডলীকে ক্রমাগত ঘোরাতে থাকলে চুম্বক বলরেখা ছিন্ন হয় এবং তারে বিদ্যুতাবেশ ঘটে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ তৈরি করল ডায়নামো।

ফ্যারাডের সেই সামান্য পরীক্ষাটিই ডায়নামোর মূল সূত্র। একটা শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের কাছে তামার তারের কুণ্ডলী বা আর্মেচারকে কোন একটা ইঞ্জিনের দ্বারা প্রবলবেগে ঘোরাতে থাকলে যতই চুম্বকের বলরেখা ছিন্ন হবে ততই উৎপন্ন হবে বিদ্যুৎ।

ডায়নামো আবিষ্কারের ফলেই শিল্প জগতে এসেছে দারুন আলোড়ন। মানুষের সভ্যতাও ভিন্ন রূপ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ডায়নামো আবিষ্কারের পর ইঞ্জিনের যুগ বিদায় নিয়ে আরম্ভ হল বিদ্যুতের যুগ। আশ্চর্যের কথা এই যুগের বিদায়ও প্রায় আসন্ন—আরম্ভ হতে চলেছে পরমাণুর যুগ।

ফ্যারাডে তাই যুগস্রষ্টা বিজ্ঞানী। তিনি কিন্তু এ বিপ্লব দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর তিরোভাবের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে অত্যন্ত মন্থর গতিতে এসেছিল এই বিপ্লব।

রঞ্জন রশ্মি

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের খেলাঘরে কত হরেক রকমের জিনিস তুলে রাখে। কত পুতুল, কত রঙ-বেরঙের কাগজ, কত লাল-নীল-সাদা ন্যাকড়ার ফালি আর রাজ্যের যত ভাঙ্গাচোরা, ব্যবহার্য ও অব্যবহার্য জিনিস।

খেলা ঘরে বসে সেগুলি তারা আপন মনে নাড়াচাড়া করে, কখনও পুতুলদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের কাপড় পরায়, কোলে নিয়ে খাওয়াতে

বসে, আবার এক সময় ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। আমরা বড়রা তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসি আর মজা পাই।

বিজ্ঞানীরাও কতকটা ঐ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মত। খেলা পেলে ঘর সংসার, আহার বিহার সবই ভুলে যান। তাহলে কী করেন তাঁরা?

রাতদিন খেলাঘরে বসে এটা ওটা নাড়াচাড়া করেন, রাজ্যের যত জিনিস পরম যত্নে তুলে রাখেন, গাঁটের কড়ি খরচ করে অকেজো জিনিসগুলোকে কিনে আনেন, কখনও এটার সঙ্গে সেটা, তার সঙ্গে আর একটা এইভাবে মিশিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করেন কোথাও কোন পরিবর্তন হচ্ছে নাকি? যদি এক আধটু পরিবর্তন হয় তাহলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। ভাবতে বসেন—কেন হল, কেমন করে হল ইত্যাদি কত কথা।

যাঁরা এই সব কাজ করেন তাঁদের কারও বা একটা উদ্দেশ্য থাকে, কারুর তাও থাকে না—খেলা করেই তাঁরা আনন্দ পান বেশী, হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব কোন কিছুই তাঁদের মন ভোলাতে পারে না। সম্মান প্রতিপত্তি যশ, এ সবেরও কাঙ্গাল তাঁরা নন। দুঃখে তাঁরা ম্রিয়মান হয়ে পড়েন না, সুখেও তাঁদের কোন স্পৃহা নেই। মনটা শিশুর চেয়েও সরল, আর মাখনের চেয়েও নরম। বুকটা সাগরের চেয়েও প্রশস্ত, জ্ঞানের গভীরতায় অতলান্ত মহা সমুদ্রের মত। সোজা কথায় জ্ঞান পাগল তাঁরা।

সেবার হল কী? বিদ্যুতের যুগ তখন ভালভাবেই সুরু হয়ে গেছে। শহরে শহরে বিদ্যুতের বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, কল-কারখানা এবং ধাতু নিষ্কাশনেও মানুষ নিয়োগ করেছে বিদ্যুৎকে। ঠিক সেই সময় এক জ্ঞান পাগল, প্লুকর তাঁর নাম, একটা লম্বা ও মোটা কাচনলের দুমুখের একটিতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের তার অপরটিকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের চাকতি ঢুকিয়ে ঐ দুইটির মাধ্যমে নলের মধ্যে বিদ্যুৎ চালাতে লাগলেন। নলের মধ্যে বায়ু ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

কী খেয়াল হল তাঁর? নলের গায়ে একটা ছিদ্র করে ভেতর থেকে বায়ু বের করে আনতে আরম্ভ করলেন। এই কাজটি করতে গিয়ে ভয়ানক আশ্চর্য বোধ করলেন প্লুকর। বায়ুর চাপ যত কম হতে লাগল তত নলের মধ্যে আলোর পরিবর্তন হতে লাগল অতি অদ্ভূত ভাবে।

প্রথমত লক্ষ্য করলেন নলের মধ্যে বায়ুর চাপ একটু কম হতে তড়িদ্বারের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে উঠল। আরও কম হতে এক রক্তাভ আভা ধনাত্মক তড়িদ্বার থেকে ঋনাত্মক তড়িদ্বার পর্যন্ত ছেয়ে ফেলল। বেশী মাত্রায় বায়ুর চাপকে হ্রাস করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, আলোর রেখা ভিন্ন ভিন্ন টুকরায় ভেঙ্গে পরল। ভারি মজা পেলেন তিনি। অপরাপর বিজ্ঞানীও জেনে গেলেন ব্যাপারটা।

প্লুকরের পর ক্রুকস, ফ্যারাডে, মৈসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাটিকে আরও অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন, বায়ু নিষ্কাশন যখন শেষ সীমায় আসে তখন নল মধ্যস্থিত আলোর রেখাগুলি নল মধ্যস্থিত ক্রমশ: অদৃশ্য হতে হতে কোথায় বিলীন হয়ে যায় আর নলের দেওয়ালের গায়ে ঈষৎ সবুজ এক উজ্জল আলোর প্রভা ফুটে উঠে, এই আলো কেবল ঋণাত্মক তড়িদ্বার থেকেই নির্গত হয়।

এই আশ্চর্যজনক ঘটনার ব্যাখ্যা সেদিন কেউ দিতে পারলেন না। তাঁরা ধরে নিলেন, কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই রশ্মি ঋণাত্মক তড়িদ্বার বা ক্যাথ থেকে আপনা হইতে নির্গত হয়। জার্মান বিজ্ঞানী গোল্ডষ্টাইন অদ্ভুত ও আশ্চর্য রশ্মিটির নাম রাখলে ক্যাথড রশ্মি।

বিজ্ঞানীদের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা লেখা নেই। বরং যেখানে তাঁরা অসম্ভবের গন্ধ পান সেইখানে উৎসাহ অনুভব করেন তাঁরা বেশী তাই কত বিজ্ঞানী যে ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে এলেন হিসেব দেওয়া কষ্টকর।

উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ রঞ্জেনও আকর্ষণ অনুভব করলেন পরীক্ষাটির দিকে। মেতে উঠলেন ক্যাথড রশ্মিকে নিয়ে। পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেন আর গবেষণার ফলাফল লিখে রাখেন খাতায়।

একদিন একটা বড় কাচের বাল্বের দুপ্রান্তে দুটি তড়িদ্বার যোগ করে ক্যাথাড রশ্মির পরীক্ষা করছিলেন রঞ্জেন। বাহিরে যাওয়ার সময় বাল্বটিকে চালু অবস্থায় একটা বাক্সের ভেতর বন্ধ করে রেখে যেতে মনস্থ করলেন। কাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল বেরিয়াম প্লাটিনোসায়া-নাইড নামে রাসায়নিক পদার্থ মাখানো একটা পর্দা। পর্দাটার উপর লক্ষ্য পড়তেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন রঞ্জেন। পর্দায় ঝলমল করছে উজ্জল এক আলোর আভা। অথচ বাল্বের মধ্যে কোন দৃশ্যমান আলো নেই! তাহলে কোথা থেকে আসছে এই আলোর আভা?

কৌতুহলী হয়ে নিজের ডান হাতটা ধরলেন পর্দার সামনে। পর্দার উপর ভেসে উঠল এক কালো ছায়া। বিস্ময়ের পর বিস্ময়! ছায়াতে হাতখানা ভেসে উঠল না, দেখলেন কেবল ভেতরের হাড়গুলো।

রঞ্জেন বুঝতে পারলেন আকস্মিক ভাবে তিনি এমন এক আলোর রশ্মি আবিষ্কার করে ফেলেছেন, যার প্রকৃতি সাধারণ আলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাগজ, চামড়া প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সাধারণ আলো চলাচল করতে পারে না। কিন্তু এই আলো অবাধে ভেদ করতে পারে।

বাহিরে আর যাওয়া হল না রঞ্জনের। পরীক্ষা করে দেখলেন ক্যাথড রশ্মির নলে তড়িৎমোক্ষণ ঘটলে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়া-নাইডের পর্দা থেকে প্রতিভব আলো নির্গত হয়। এমনকি নলটিকে কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে ফেললেও রশ্মি নির্গমন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এই রহস্যজনক রশ্মিটির নামকরণ করলেন "এক্সরে" বা অচিন রশ্মি। বীজগণিতে যেমন অজ্ঞাত রাশিকে ইংরাজী X এক্স অক্ষর দিয়ে সূচিত করা হয়, ঠিক সেইভাবে এই অচেনা রশ্মিটকে এক্সরে নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

পরে অবশ্য এক্সরের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এর কল্যাণকর দিকটির সঙ্গে আমাদের সবার পরিচয় আছে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও রেডিয়াম

হেনরি বেকারেল নামে একজন মহান বিজ্ঞানী পটাসিয়াম-ইউরানিল সালফেট নামে ইউরেনিয়াম ধাতুর একটি যৌগিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করতেন। একবার একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেটকে কালো কাগজে জড়িয়ে তুলে রেখেছিলেন দেরাজে। আবার ভুলক্রমে এক টুকরা ইউরেনিয়াম ধাতু রেখে দিয়েছিলেন ঐ কাগজ জড়ান কাগজ প্লেটের উপর। একটি চাবিও পড়েছিল সেখানে। পরে একদিন প্লেটের কী একটা দরকারে ফটোগ্রাফিক প্লেটটাকে ডেভেলপ করতে গিয়ে দেখেন প্লেটের উপর ভেসে উঠেছে একটা চাবির ছবি।

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর হদিস পেলেন চাবিটার। সিদ্ধান্তে এলেন ইউরেনিয়াম ধাতুটা সর্ব অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক ধরণের অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে। ঐ রশ্মি অনায়াসে ধাতুর পাত ভেদ করে চলে যেত পারে, অন্ধকারেই ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্রিয়া করে।

ইউরেনিয়ামের এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে আরও পরীক্ষা চালালেন বেকারেল! দেখতে পেলেন, ঐ রশ্মি যখন (১) ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন বায়ু কিংবা গ্যাসকে আয়নিত করে ছাড়ে। এতদিনে মানুষ বুঝতে পারলে ক্যাথড রশ্মি এবং অচিন রশ্মির প্রকৃত স্বরূপ।

বেকারেলের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান ক্ষেত্রে এক দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। প্রায় সব বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম এবং তার যৌগিক পদার্থ-গুলোকে নিয়ে মেতে উঠলেন। একসময় ধরা পড়ল ইউরেনিয়ামের আকরিক পিচব্লেণ্ডির তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশী।

তেজস্ক্রিয়তা বলতে বোঝায়, এমন কতকগুলো মৌল পদার্থ আছে যাদের দেহ থেকে সব অবস্থায় অনর্গল ও অবিরাম ভাবে এক ধরনের অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি নির্গমন ক্রিয়াকে বলে তেজস্ক্রিয়তা

এবং যাদের দেহ থেকে রশ্মি নির্গত হয় তাদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম, প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ এই শ্রেণীতে পড়ে। তেজস্ক্রিয়তাকে ইংরাজীতে বলে রেডিও অ্যাকটিভিটি। শব্দটিকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন স্বয়ং কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ।

বেকারেলের সময় ফ্রান্সে এক গবেষণা পাগল দম্পতি বাস করতেন। সদ্য বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। নাম পিয়েরে কুরি এবং মারি কুরি। পিয়েরে একটা স্কুলে বিজ্ঞান পড়াতেন। যা বেতন পেতেন তাতে কোন রকমে টেনে টুনে সংসার চলত। বড় গরীব ছিলেন তাঁরা। তবু গবেষণার নাম শুনলে নেচে উঠত মন। বেকারেলের আবিষ্কারের পর তাঁরা ঠিক করলেন, পিচব্লেণ্ডিকে নিয়ে গবেষণা করবেন। কিন্তু পিচব্লেণ্ডি কিনতে পয়সা কোথায়? তাছাড়া গবেষণা করতে হলে একটা ঘরও দরকার। নিজেরা থাকেন একফালি একটা ভাড়া ঘরে।

একটুও দমলেন না কুরি দম্পতি। স্কুলে একটা ভাঙ্গা মেসিন ঘর ছিল। কোনদিন কেউ তার ছায়া মাড়াত না। অধ্যক্ষকে বলে সেই ঘরটিকে যোগাড় করলেন পিয়েরে। একজন বন্ধুর গাড়ী ছিল; তাঁকে অনুরোধ জানাতে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত পিচব্লেণ্ডির কয়েক গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

কুরি দম্পতি এবার মহাউৎসাহে আরম্ভ করে দিলেন গবেষণা। ঘরের মধ্যে বায়ু প্রবেশের একটুও পথ নেই। প্রচণ্ড ধোঁয়া আর বিশ্রী গন্ধ। কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগাড়। তবুও তাঁরা রাতদিন পড়ে থাকেন সেখানে।

শেষে জয় হল তাঁদের। অতি কষ্টে সংগ্রহ করলেন আর একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ পোলোনিয়াম। দেখা গেল পোলোনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা তিনশ গুণ বেশী।

কুরি দম্পতির আবিষ্কার ঐখানেই সীমাবদ্ধ রইল না। পোলো-নিয়াম পৃথক করে নেওয়ার পর যে তরল পদার্থটি অবশিষ্ট থাকল, তার

মধ্যেও দেখা গেল তেজস্ক্রিয়তার গুণ। আবার চলল গবেষণা। সুদীর্ঘ দেড় বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা আবিষ্কার করলেন রেডিয়ামকে। যার তেজস্ক্রিয়তা অনেক—অনেক গুণ বেশী।

তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ রেডিয়াম আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী! প্রকৃতপক্ষে রেডিয়াম আবিষ্কারের পরই পারমানবিক যুগের সুচনা। সেই থেকেই পরমাণুর একদিকে কল্যাণকর ধর্ম অপর দিকে ওর ভয়াবহতা বিভ্রান্ত করে তুলেছে পৃথিবীর মানুষকে।

অ্যাটম বোমা

তখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক।

তাঁরই সময় আরম্ভ হল দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর। জার্মানীর ভয়ে ইউরোপ ভূখণ্ডের বহু জায়গা থেকে বহু নামকরা বিজ্ঞানী আত্মরক্ষার জন্য এসে আশ্রয় নিলেন আমেরিকায়। আমেরিকাও তাঁদের সাদরে গ্রহণ করল। সেই সব বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন আইনস্টাইন, লিজে মাইটনার, অটোফ্রিস, এনরিকো ফের্মি, নীলস বোর জিলার্ড, টেলার প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীরা কেমন করে যেন টের পেলেন, জার্মান ও ইতালির বিজ্ঞানীরা পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক ধরণের অতি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। একদিন আইনস্টাইনই এই গোপনীয় খবরটি কানে তুললেন রুজভেল্টের। সাবধান করে দিলেন, মদমত্ত জার্মান যদি কোন শক্তিশালী মারনাস্ত্রের সন্ধান পায় তাহলে সারা বিশ্বের দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

কথাটা শুনে মহা ভাবনায় পড়লেন রুজভেল্ট। আইনস্টাইনের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, একথা তাঁর চেয়ে বেশী আর কে জানেন? পরমাণুর এই ভয়াবহ দিকটার কথা, আজও পরমাণু বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেননি অথচ

জার্মানীরা এরই মধ্যে গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছেন, আশ্চর্য তাঁরা?

রুজভেল্ট অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানীদের নির্দেশ দিলেন, তারাও যেন অবিলম্বে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটা মারনাস্ত্র তৈরি করেন। প্রচুর অর্থ সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।

এবার বিজ্ঞানীদের চিন্তিত হবার পালা। তাঁরা ভেবে দেখলেন, বোমা তৈরি করা একক বিজ্ঞানীর সাধ্যের বাহিরে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁর গভীর জ্ঞান আছে একমাত্র তাঁকেই দেওয়া যেতে পারে এই দুরূহ কাজের ভার। কিন্তু কে আছেন এমন চৌকস বিজ্ঞানী?

অনেক খুঁজে পেতে তারা ঠিক করলেন, এই কর্মকাণ্ডের প্রধান হোতা আমেরিকার মাত্র একজন বিজ্ঞানীকে করা যেতে পারে। তিনি হচ্ছেন রবার্ট ওপেন হাইমার। বিজ্ঞানীরা সমবেত ভাবে রুজভেল্টের কাছে তারই নাম প্রস্তাব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রুজভেল্ট দ্বিরুক্তি না করেই ওপেন হাইমারকে নেতা মনোনীত করলেন। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্বদেশের এবং বিদেশের যত নাম করা বিজ্ঞানী। প্রথম কিস্তিতে সরকার দুশ কোটি ডলার মুদ্রা অনুমোদন করলেন। লোক নিযুক্ত হল প্রায় পঁচাত্তর হাজারের মত।

এদিকে রবার্ট ওপেন হাইমার শুরু করলেন অমানুষিক পরিশ্রম। দৈনিক দু তিন ঘন্টার বেশী ঘুমাতে সময় পেতেন না। কোনদিন খাবার জুটত, কোনদিন তাও জুটত না, শরীর দিনে দিনে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। এত রোগা হয়ে গেলেন যে তার গায়ের কোট ও প্যান্ট ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ল। তবুও হাল ছাড়লেন না ওপেন হাইমার। তার নির্দেশে দেশের নানা জায়গায় গোপন কারখানা স্থাপিত হল এবং লোক নিযুক্ত হল আরো কয়েক হাজার। শিকাগো এবং ওকারীজে স্থাপিত হল পরমাণু বিভাজনের গবেষণা। পরমানু বোমা নির্মাণের জন্য প্রথমে বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম ও পরে প্লুটোনিয়ামকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন।

বহু বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা, প্রায় এক লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং অজস্র অর্থব্যয়ে একদিন ওপেন হাইমার লাভ করলেন একটি

পরমাণু বোমা। ঠিক হল লস আলমাসের কাছে একটি পাহাড়ের উপর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বোমাটির শক্তি পরীক্ষা করা হবে। ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিনই ওপেন হাইমার সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালেন। কিন্তু এ কী! বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সবাই। তারা যা কল্পনা করেছিলেন তার চেয়ে শত শত গুণে ভয়ঙ্কর এই বোমা। এত শক্তিধর হবে তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি।

প্রথমে অস্বস্তি পরে দুর্ভাবনায় আচ্ছন্ন হল রবার্ট ওপেন হাইমারের মন। এ কি করলেন তিনি? মানুষের মঙ্গল না করে তিনি সর্বনাশ ডেকে এনেছেন। সরকারের কাছে দাবী জানালেন, এমন বোমা ব্যবহার করা চলবে না। নীলস বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও ওপেন হাইমারকে সমর্থন জানালেন। কিন্তু তাদের কথায় কান দিলেন না রাষ্ট্রনায়কেরা।

ওপেন হাইমার পড়লেন মহা দুশ্চিন্তায়। লিখিত ভাবে সরকারের কাছে কতকগুলি দাবী উপস্থাপিত করলেন। তাঁর একটি দাবী ছিল, পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে এই মারণাস্ত্রের ভয়াবহতার কথা জানাতে হবে এবং জানাতে হবে বোমার প্রস্তুত প্রণালী বিধি।

মার্কিন সরকারের এবার সন্দেহ ভাজন হলেন ওপেন হাইমার। তাঁকে পুলিশী হেফাজতে রাখা হল এবং পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হল জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি নামক দুটি জনবহুল নগরের উপর। বিজ্ঞানের সে এক কলঙ্কময় অধ্যায়।

বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পরমাণু বোমার ভয়ঙ্কর রূপটা দেখে রাষ্ট্রনায়কেরাও শিউরে উঠলেন। ওপেন হাইমার এবারে তুললেন তীব্র প্রতিবাদ। তার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলালেন যত বিজ্ঞানী। তারা অনুরোধ জানালেন, ধ্বংসাত্মক কাজে পরমাণুকে নিয়োগ না করে কল্যাণকর কর্মে যেন নিয়োগ করা হয়। চারদিকে যখন তুমুল প্রতিবাদ আরম্ভ হল তখন সরকার বাধ্য হয়ে ওপেন হাইমারের কয়েকটা দাবী মেনে নিলেন। তবে সব দাবী তাঁর মানা হয়নি।

ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের নেতা জে. রবার্ট ওপেন হাইমারকে মানুষ চিরকাল মনে রাখবে।

ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফী

হাজার বছর আগেকার কথা।

এক মিশরীয় সওদাগর দলদল নিয়ে হেঁটে পার হচ্ছিলেন সাহারা মরুভূমি। সাহারায় দিনের বেলা প্রচণ্ড গরম। তার উপর আছে গরম বাতাস। তাই সওদাগর করতেন কী! রাতেই কেবল হাঁটতেন আর দিনের বেলায় মরুস্থানে সারি সারি খেজুর গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করতেন। তাঁবুটা ছিল অনেক দিনের পুরোন। এখানে সেখানে তাঁবুর গায়ে বেশ কয়েকটা ছিদ্রও হয়ে গেছিল।

একদিন বিকেল বেলা। সূর্যদেব তখন পশ্চিমাকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছেন। তাঁবুর লোকজন ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু সওদাগরের ঘুম অনেক আগে ভেঙ্গে গেছে। যাত্রার আয়োজন করবেন কি না ভাবছেন, এমন সময় চক অদ্ভুত দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। রোদ পড়ে যাওয়ায় একদল যাত্রী সারি বেঁধে উটের পিঠে এগিয়ে চলেছে আর ছিদ্রপথে তাদের ছায়া এসে পড়েছে তাঁবুর ভেতরের গায়ে। ছায়াগুলো সবই উল্টো, চলন্ত উটের সারির ছায়াও চলন্ত। দেখে চোখ ফেরাতে পারলেন না সওদাগর।

দেশে ফিরে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে বলেজিলেন সওদাগর। তাঁর নামটা কেউ জানেন না। তবে প্রবাদ আছে যে, সেই থেকে মানুষ বদ্ধ বাক্সের সামনে একটি ছোট্ট ফুটো করে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে।

ক্যামেরার আদি পুরুষ একটা কাঠের বাক্স ছাড়া আর কিছু ছিল না। বাক্সের সম্মুখে থাকত ছোট একটি ছিদ্র। আলো প্রবেশের ঐটুকু পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না। বাক্সের বিপরীত দেওয়ালে খাটিয়ে রাখা হত

একখানা ঘষা কাচের পর্দা। ফুটো দিয়ে যখন আলো আসত তখন কাচের পর্দার উপর দৃশ্য বস্তুর একটা প্রতিবিম্ব পড়ত। এই যন্ত্রটি করে কে যে আবিষ্কার করেছিলেন সেকথা কারও জানা নেই।

অনেকদিন পরে দেনিয়েলো বারবারো নামে একজন শিল্পী বাক্সের ফুটোটাতে একটা লেন্স লাগিয়ে যন্ত্রটির একটু উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই ক্যামেরাকে কোন একটা জায়গায় বসিয়ে রাখা হত। পর্দার উপর যে ছবি ফুটে উঠত তাই দেখে দেখে শিল্পীরা অসীম ধৈর্য্য নিয়ে কাগজ এঁকে ফেলতেন।

এইভাবে কেটে গেল আরও কতবছর। শিল্পীরা ভাবতে আরম্ভ করলেন, তুলি দিয়ে ছবি না এঁকে ঐ ক্যামেরার মাধ্যমে ছবিকে স্থায়ী করা যায় কিনা? অনেকের মনে চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। একদিন একজনের নজরে পড়ল সূর্যের আলো বহু বস্তুর বর্ণ পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়। ঘষা কাচের পর্দার উপর তেমন কোন জিনিস মাখান যায় না কী? যা সূর্যের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিবর্তন করে দেবে?

জার্মান বিজ্ঞানী স্থুল্যজে একদিন আকস্মিক ভাবে দেখতে পেলেন, সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে সূর্যালোকে রেখে দিলে কালো হয়ে যায়?

স্থ্যলজের এই তথ্যকে কাজে লাগালেন ফরাসী বিজ্ঞানী নিয়েপসে তিনি একটা কাগজকে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণ মাখিয়ে রেখে দিলেন ঘষা কাচের পর্দার উপর। ছবি তুলতে গিয়ে দেখলেন, স্থায়ী ছবি একটা পাওয়া গেল ঠিকই কিন্তু ছবিটি হয়েছে উল্‌টো। কাগজের উপর যেখানে আলো পড়েছে সেখানে কালো আর যেখানে আলো পড়েনি সেখানটা আছে অবিকৃত। আলোছায়ায় এই খেলা সেদিন বুঝতে পারেননি নিয়েপসে। বোধ হয় বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। উল্টো ছবির কোন সার্থকতা নেই ভেবে উক্ত পদ্ধতিটি পরিত্যাগ করে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সোজা ছবি প্রস্তুত করতে যত্নবান হয়েছিলেন।

কিছুদিন এ বিষয়ে গবেষণা করার পর সাফল্যও অর্জন করলেন নিয়েপসে। তিনি একটা তামার প্লেটের গায়ে একরকম বিটুমেন মাখিয়ে ক্যামেরার মধ্যে রেখে রোদে এক্সপোজার দিলেন। যেখানে রোদ পড়ল সেখানে বিটুমনটা শক্ত হয়ে তামার প্লেটে এঁটে গেল। যেখানে রোদ পড়ল না সেখানে নরমই থাকল। বেশ কয়েক ঘন্টা রোদ লাগান পর নরম বিটুমেন ল্যাভেণ্ডর তেল দিয়ে তুলে দিলেন। তারপর প্লেটের উপর ঢাললেন অ্যাসিড। যেখানে শক্ত বিটুমেন লেগে ছিল সেখানে তামার পাতের কোন ক্ষয় হলনা আর যেখানে বিটুমেন ছিলনা সেখানে পাত ক্ষয়ে গেল। ফলে পাতটা হল কোথাও উঁচু এবং কোথাও নীচু। এবার শক্ত বিটুমেনকেও তুলে দেওয়া হল। তামার পাতেকালি মাখিয়ে সাদা কাগজে ছাপ দিতে পাওয়া গেল দৃশ্যবস্তুর সুন্দর ছবি।

নিয়েপসের সঙ্গে আর এক চিত্রকর যোগ দিলেন। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের লোক—নাম দ্যগোরে। তাঁরা উভয়ে মিলে দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালালেন যাতে ছবির নকল না করে ক্যামেরার মধ্যে স্থায়ী চিত্র ধরে রাখা যায়। শেষে নিয়েপসে মারা গেলেন। দ্যগোরে আবিষ্কার করলেন ক্যামমেরার মধ্যে ছবি ধরে রাখার এই পদ্ধতিতে আর তামার পাতে কালি মাখিয়ে কাগজে ছাপ দিতে হল না।

এই ছবিরও একটা অসুবিধা থেকে গেল। দ্যগোরের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতেই ছবি হল পজিটিভ। একটি থেকে প্রিণ্ট করে একাধিক ছবি পাওয়া গেল না। তাছাড়া আরও একটা অসুবিধা দেখা গেল। ক্যামেরার সাহায্যে মানুষের ছবি তুলতে হলে, রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত পা না নেড়ে পাষাণ মূর্তির মত ক্যামেরার সামনে বসে থাকতে হত। দ্যগোরের পদ্ধতি তাই কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। চটপট ছবি হবে, দৃশ্যে বস্তুর সঙ্গে ছবির হুবহু মিল থাকবে তবেত না যন্ত্র!

চলল আবার গবেষণা। ট্যালবট নামে এক ইংরাজ বিজ্ঞানী উদ্ভাবন করলেন এক নতুন ধরণের ক্যামেরা। এই ক্যামেরাতে ফটোর জন্য যে কাগজ ব্যবহার করা হত, তাকে প্রথমে নুনজলে ভিজিয়ে শুকিয়ে

নেওয়া হত। তারপর সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মাখিয়ে ক্যামেরার মধ্যে রেখে রোদে এক্সপোজার দেওয়া হত। পুনর্বার কাগজটিকে নুন জলে ধুয়ে নিলে স্থায়ী ছবির নেগেটিভ পাওয়া যেত। নেগেটিভকে অনুরূপ একখা কাগজ চেপে এক্সপোজার দিলে পাওয়া যেত পজিটিভ। এই পদ্ধতিতে মানুষকে আর দীর্ঘ সময় ধরে ক্যামেরার সামনে বসে থাকতে হত না। ট্যালবটের ছবি তোলার পদ্ধতির নাম হল ফটোগ্রাফী।

ট্যালবট কেবল আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হননি। ফটোগ্রাফীর উন্নতির জন্য তিনি আজীবন গবেষণা অব্যাহত রেখে ছিলেন। তবু ও নিখুঁত তিনি করতে পারেন নি। এই পদ্ধতির একটা বড় ত্রুটি ছিল এই যে নেগেটিভকে সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপ না করলে ছবি নষ্ট হয়ে যেত। তাই ফটোগ্রাফার যেখানে ফটো তুলতে যেতেন সেখানে তাই ডার্করুমটাও সঙ্গে নিয়ে যেতে হত তাঁকে। তাছাড়া অত্যধিক পরিশ্রম করতে হত ফটোগ্রাফারকে। আর্চার নামে এক ইংরাজ শিল্পী অসুবিধা নিরসনের জন্য কাগজের বদলে কাচের প্লেট ব্যবহার করলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না।

ফটোগ্রাফীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেছেন ম্যাডক্স নামে জনৈক ফটোগ্রাফার। তিনিই সর্বপ্রথম দ্রবীভূত জিলাটিনের সঙ্গে ব্রোমাইড লবণ এবং সিলভার নাইট্রেট মিশিয়ে, সেই মিশ্রণকে কাচের প্লেটের উপর আস্তরণ দিয়ে শুকিয়ে নিলেন। ক্যামেরাতে ঐ প্লেট ব্যবহার করাতে পূর্বের অসুবিধাগুলো আর থাকল না। অর্থাৎ এই প্লেটকে খুশী ব্যবহার করা গেল এবং এক্সপোজার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলাপ করারও দরকার হল না। তারপর অনেকের দ্বারা ক্যামেরা এবং ফটোগ্রাফী উভয়েরই উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে বহুজনের প্রচেষ্টার ফল আজকের এই ফটোগ্রাফী।

নীল রঙ

বাংলার নীলকরদের অত্যাচার কে না জানে ? একদিন অসাধু ও দুর্নীতি-গ্রস্ত নীলকরদের অত্যাচারে সোনার বাংলা শশ্মান হতে বসেছিল। কত আন্দোলন, কত বিদ্রোহ যে হয়েছিল তার হিসেব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও নীলকররা এতটুকু দমেনি ; সমানে চালিয়ে গেছে ব্যবসা। তবে নীলকররা হঠাৎ এদেশ থেকে পালিয়ে গেল কেন ? সে কি বাংলার কৃষকদের জাগরণের ফলে।

না, ঠিক সে জন্য নয়। প্রধান কারণটা হল, অকস্মাৎ এক তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী কৃত্রিম ভাবে নীল রঙ প্রস্তুত করে ফেললেন। নীল গাছ থেকে প্রস্তুত করা নীল অপেক্ষা কৃত্রিম নীলের গুণাগুণ উৎকৃষ্ট হওয়ায় কৃত্রিম নীলেরই চাহিদা হল বেশী। তাছাড়া কৃত্রিম নীল অনেক সস্তায় পাওয়া গেল। নীলকররা দেখল, আর ব্যবসা জমবে না। তাই রাতারাতি তল্পিতল্পা বেঁধে সাগর পাড়ি দিল।

এখন নীল রঙ আবিষ্কারের কাহিনীটি কিন্তু ভারী সুন্দর। উইলিয়াম হেনরি পার্কিন নামে এক রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন। রাতদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতেন ল্যাবরেটারিতে সময়মত নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল গবেষণা আর গবেষণা। কৃত্রিম ভাবে কুইনিন প্রস্তুত করতে পারেন কি না সে চেষ্টাই করেছিলেন তিনি।

সে সময় কুইনিন তৈরী হত সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কিন্তু সিঙ্কোনা গাছ সর্বত্র জন্মায় না। তাই সিঙ্কোনা গাছ থেকে কুইনিন তৈরি করে দেশের বিরাট চাহিদা মেটান যাচ্ছিল না। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন অপরাপর জৈব পদার্থের মত কুইনিনকে ও কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত করতে। হেনরি পার্কিনও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

পার্কিন নানাভাবে চেষ্টা করেও সফল হতে পারছিলেন না। ধৈর্য

চ্যুতির পরিবর্তে আগ্রহ-ই দিন দিন বেড়ে চলল তাঁর। যেমন করে হোক কুইনিন তৈরি করবেন-ই।

বাড়ীর কর্ত্রী ছিলেন একটু বেশী রকমের খিটখিটে। তাছাড়া বিজ্ঞানীর সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ও তাঁকে আরও বিরক্ত করে তুলেছিল। অনেক সময় অনেক বকাবকিও করতেন। কিন্তু সে সব কথা বিজ্ঞানীর কানে ঢুকত কিনা সন্দেহ। মাঝে মাঝে এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন যে, ঘরের মধ্যে একটা বোমা বিস্ফোরণ হলেও মনে হয় টের পেতেন না।

একদিন হল কী! গৃহকর্ত্রী রণরঙ্গিনী মুর্তি নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। মুখটা পাকা আপেলের মত লাল, চোখ থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আগুনের ফুলকি। খুব এক চোট বকাঝকা করলেন। কিন্তু পার্কার গবেষণায় এমন তন্ময় ছিলেন যে, তাঁর উপস্থিতি আদৌ টের পেলেন না। গৃহকর্ত্রীর রাগ দ্বিগুণ হল। উত্তেজিত হয়ে টেবিলের উপর সাজান শিশি বোতল গুলোকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেললেন মেঝেতে। ঝন ঝন শব্দে চৈতন্য ফিরে এল বিজ্ঞানীর। দেখলেন স্বয়ং যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছেন গৃহকর্ত্রী আর তাঁর সাধের শিশি-বোতল গুলো ভেঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে।

মুহূর্তে বিজ্ঞানীর মুখটা পাংশুবর্ণ ধারণ করল। আশাহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মেঝের দিকে। চোখ দুটো বিষাদে মলিন বুকে পুঞ্জীভূত বেদনা। তবুও ভয়ে প্রতিবাদের ভাষাও উচ্চারণ করতে পারলেন না।

একতরফা কিছুক্ষণ বকে, রাগে গর গর করতে করতে গৃহকর্ত্রী এক সময় দুমদাম পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিজ্ঞানী ও আসন ছেড়ে মেঝেতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। হঠাৎ এক জায়গায় লক্ষ্য পড়তে তিনি আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। এত সুন্দর নীল রঙের ছড়াছড়ি! এল কোত্থেকে?

এত বড় কাণ্ডটার কথা মুহূর্ত মধ্যে বিস্মৃত হলেন। আবার স্বস্থানে ফিরে এসে আরম্ভ করে দিলেন গবেষণা। এবার কুইনিনের জন্য নয়-ঐ নীল রঙটার জন্যই। বেশী বেগ পেতে হল না। অচিরে আবিষ্কার করে

ফেললেন। অ্যানিলিন মভ নামে পাকা নীল রঙ। অন্তরের গভীর দুঃখ ভেসে গেল আনন্দের বন্যায়, অভিশাপ দেখা দিল আশীর্বাদ রূপে।

পরের দিকে কুইনিনও কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত হয়েছে। তবে প্রস্তুত কারক হেনরি পার্কিন নন। কৃত্রিম ভাবে নীল রঙ তৈরি করেই তিনি অমর হয়ে আছেন।

রবারের আঠালোভাব দূরীকরণ

রবার এক রকম গাছের আঠা। মালয় উপদ্বীপে এই গাছের চাষ ব্যাপক। দক্ষিণ ভারতে ও রবারের গাছ জন্মে। রবার যখন গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তখন তার মধ্যে থাকে ভয়ানক আঠালো ভাব। আর শক্ত ও করা যায় না কিছুতেই।

আজ থেকে প্রায় একশো বছরেরও বেশী সময় আগে, রবারের আটালোভাব দূর করে ওকে শক্ত ও মজবুত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। কারণ তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, রবারকে শক্ত করতে পারলে মানুষের বহু প্রয়োজন আসবে।

চার্লস গুডইয়ার নামে ছিলেন এক বিজ্ঞানী তিনিও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন রবারের পেছনে। বহু রাসায়নিক পদার্থ মেশাতেন, কখনও বা এটা ওটা মিশিয়ে গরম করতেন কিন্তু কিছুতেই রবারের আঠালো ভাব দূর করতে পারতেন না।

একদিন গুডইয়ার সাহেব রবারের সঙ্গে কিছুটা গন্ধক মিশিয়ে রেখেছিলেন একটা পাত্রে। কাছে ছিল একটা জ্বলন্ত উনুন। অন্য মনস্ক গুডইয়ার কি করতে গিয়ে হাতে লেগে পাত্রটা (১) গড়াতে গড়াতে পড়ল ঐ জ্বলন্ত উনুনের উপর। হায় হায় করে উঠলেন গুডইয়ার। অনেকগুলো জিনিস তাঁরই অসাবধানতার ফলে অকারণে নষ্ট হয়ে গেল।

উনুনটা নিভে গেছিল। পরে উনুন ধরাতে গিয়ে তার চোখ দুটো

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এতদিন যে জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছিলেন আজ তা দৈবক্রমে আবিষ্কার (২) হঠাৎ উল্টে গেলে এবং পাত্রে রক্ষিত গন্ধক ও রবার মিশ্রণের কিছু অংশ হয়ে গেল। দেখতে পেলেন, রবারের আঠাল ভাব দূরীভূত হয়ে একেবারে পাকা পোক্ত হয়ে গেছে। আনন্দের আতিশর্যে তিনি লাফিয়ে উঠলেন।

যেহেতু আগুনে পুড়ে ব্যাপারটার সুরাহা হয়েছিল বলে গুডইয়ার সাবে পদ্ধতির নাম রাখলেন "ভালকানাইজেসান।" রোমানরা আগুনের দেবতাকে বললেন "ভালকান।" তাই অগ্নি দেবতার নামানুসারেই উপরোক্ত নামকরণ।

আজও আমরা "ভালকানাইজেসান অব্ রবার" বা রবারের আটালো-ভাব দূরীকরণের পদ্ধতিকে গুডইয়ার সাহেবের পদ্ধতিই বুঝি। তবে এখন রবারকে ও কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হচ্ছে।

চলচ্চিত্র

বিশ্বের সার পদার্থের তিল তিল সংগ্রহ করে বিধাতা গড়ে তুলছেন তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে। অকৃপণ হাতে তাকে দিয়েছেন অনেক। যদিও বুদ্ধিটা একটু বেশী দেওয়ার জন্য কোন কোন ক্ষেত্র কৃপণতাও যে না করেছেন এমন নয়। মানুষের বুদ্ধির কাছে বুঝি বিধাতাও হার মানেন। সে ধরে ফেলেছে বিধাতার কারচুপি। জানতে পেরেছে কোথায় তার খুঁত এবং স্রষ্টার উপরেই টেক্কা দিয়ে চুটিয়ে ব্যবহার করেছে নিজের ত্রুটিগুলিকে।

প্রথমে ধরা যেতে পারে আমাদের ঐ নীলপদ্মের মত সুন্দর একজোড়া চোখের কথা। যার স্পর্শে পৃথিবীটা এত সুন্দর ও মোহময় মনে হয়। কুসুমে কীটের মত চোখের একটা ত্রুটি আছে। সেই ত্রুটিটি হচ্ছে, কোন জিনিস আমাদের চোখের সমানে উপস্থাপিত করলে তার ছবি মস্তিষ্কে

অনুভূতি জাগাতে বেশ একটু সময় নেয়। যদিও সময়টা নিতান্তই অল্প – এক সেকেণ্ডের প্রায় সাত ভাগের একভাগ মাত্র। মানুষ ধরে ফেলেছে, যদি সামান্য সময়টুকুর মধ্যে একটি দৃশ্য বস্তুকে সরিয়ে আর একটা বস্তুকে উপস্থিত করা যায় তাহলে আমাদের চোখ ঐ পরিবর্তনটুকু ধরতে পারে না।

চোখের এই ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আবিষ্কার করেছে চলচ্চিত্র এবং টেলিভিসন, যদিও এগুলির কোনটি একদিনে আবিষ্কৃত হয়নি। আবিষ্কারের পেছনে আছে সুদীর্ঘকালের বহু মানুষের প্রচেষ্টা।

এখানে আলোচ্য বিষয় চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, খুব দ্রুতিগতিতে পরপর কতককগুলো ছবিকে যদি পর্দায় উপস্থাপিত করা যায় তাহলে একটা ছবির সঙ্গে আর একটা ছবির পার্থক্য বোঝা যায় না। মনে হবে আমরা একটা অবিচ্ছিন্ন সচল ছবি দেখছি। সেই কারণে পর্দায় প্রতি সেকেণ্ডে প্রোজেক্টয়ের সাহায্যে প্রায় ছাব্বিশটি স্থির ছবিকে দেখান হয়ে থাকে।

মানুষ যখন ক্যামেরার সাহয্যে চিত্রকে স্থায়ী করতে সমর্থ হল তখন অনেকের মনে চিন্তা এল, আমরা যেমন ঘুরে বেড়াই, হাত পা নাড়ি, কথাবার্তা বলি, সেই ভাবে ছবিকেও যদি সচল এবং সবাক করা যেত তাহলে কি মজাটাই না হত!

এই পরিকল্পনাটা বোধ হয় কালিফার্নিয়া ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্টাতা লেল্যাণ্ড সাহেবের মস্তিষ্ক প্রসূত। ঘোড়ায় চড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন মাইব্রিজ নামে সুদক্ষ এক ফটোগ্রাফারকে একদিন জানালেন আপন পরিকল্পনার কথা। সেদিন তিনি কেবলমাত্র বলেছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে তার একটা সচল ছবি তুলতে।

মাইব্রিজ বেশ কয়েকদিন ধরে চিন্তা করছিলেন। শেষে উদ্ভাবন করেছিলেন এক অভিনব উপায়।

মাইব্রিজ করলেন কী! চব্বিশটি ক্যামেরা নিয়ে একটা মাঠে সমদূরত্বে পর পর বসিয়ে রাখলেন। সবগুলি ক্যামেরার শাটারের

সঙ্গে বাঁধলেন একগাছি করে সরু সুতো। সুতোর অপর প্রান্তগুলো সোজা-সুজি টেনে নিয়ে মাঠের ও প্রান্ত ছোট ছোট খুঁটি পুঁতে টান টান করে বাঁধলেন। তারপর লেল্যাণ্ড সাহেবকে নির্দেশ দিলেন ঘোড়ায় চড়ে ছুটে যাওয়ার জন্যে।

লেল্যাণ্ডের ঘোড়া যখন ছুটে গেল তখন তার ক্ষুরের আঘাতে সুতো পটপট করে ছিঁড়ে গেল এবং শাটারগুলো খুলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য ঘোড়ার পিঠে লেল্যাণ্ড ক্যামেরার লেন্সের সামনে আসতেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

এই বিশেষ উপায়ে সেদিন মাইব্রিজ চব্বিশটি ক্যামেরা দিয়ে গতিশীল অশ্বের বিভিন্ন অবস্থানানুযায়ী ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তবে উদ্ভাবনের প্রকৃত গুরু টমাস আলভা এডিসন। তিনি দুটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। একটির নাম কিনেটোগ্রাফ এবং অপরটির নাম কিনেটোস্কোপ। প্রথম যন্ত্রটি ব্যবহার করতেন চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য, দ্বিতীয়টি প্রদর্শনের জন্য।

জর্জ ইষ্টম্যান নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী এডিসনের সময়েই আবিষ্কার করেছিলেন সেলুলয়েডের তৈরী ফিল্ম। এডিসন সেই ফিল্মকেই কাজে লাগালেন। একটা বাক্সের মত যন্ত্র তৈরী করে তার মধ্যে রোলারে জড়িয়ে রাখলেন ফিল্ম। বাক্সের সামনে থাকল একটি ছিদ্র এবং তাতে লাগালেন লেন্স, পাশে থাকল হাতল। হাতল ঘোরালে রোলারের ফিল্ম খুলে গিয়ে আর একটি রোলারে জড়িয়ে যায়। দর্শকরা উপযুক্ত দর্শনী দিয়ে ছিদ্রের সামনে বসত। সামনে মাত্র দুটি ছিদ্র থাকতো বলে দুজনের বেশী দর্শক একসঙ্গে ছবি দেখতে পারত না।

এডিসনের এই যন্ত্র বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেই কারণে চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য এবার অনেকে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। শেষে জয়যুক্ত হলেন টমাস আরমাট নামে এক বিজ্ঞানী। বাক্সের বদলে তিনি পর্দার উপর চলচ্চিত্র দেখাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। তারই পদ্ধতিতে প্রথম যাত্রা বা থিয়েটারের ধরণের মুকাভিনয় প্রদর্শিত হয় এবং দর্শকরা আরও আকর্ষণ বোধ করেন। অবশ্য এই মুকাভিনয় কোন

কাহিনীমূলক ছিল না।

দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থা চলেছিল। কিন্তু একই জিনিস সব সময় মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে না। নিত্য নতুনের পিয়াসী সে। সেই একই ধরণের কাহিনীশূন্য মূকাভিনয়, যেন ঘেন্না ধরে গেল মানুষের।

এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটালেন এডউইন পোর্টার নামে একজন ক্যামেরাম্যান। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পোর্টার "দি গ্রেট রবারি" নামে একটি কাহিনীকে নিয়ে তৈরি করলেন চলচ্চিত্র। আবার মানুষ নতুনের স্বাদ পেল। দলে দলে আসতে লাগল পোর্টারের ছবি দেখতে।

এবার এগিয়ে এলেন ব্যবসায়ীরা দর্শকদের চাহিদা মেটাতে। তারা ভাল ভাল ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে জনপ্রিয় কাহিনীগুলির চিত্ররূপ দিলেন। সেই সময়টায় বেশীর ভাগ চলচ্চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হত কালিফোনিয়ার হলিউড নামে একটি জায়গায়। কারণ ও ছিল হলিউডে বৃষ্টিপাত খুব কম হত। বছরের অধিকাংশ দিনে পাওয়া যেত রোদ। ব্যবসায়ীরা দেখলেন, ছবি গ্রহণ করার এত সুন্দর পরিবেশ আর কোথাও নেই। দলে দলে ছুটলেন তাঁরা হলিউডে। সেই থেকেই হলিউড শিল্পের রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। যদিও বর্তমানে জাপানই তৈরি করছে সব চেয়ে বেশী ছবি।

চলচ্চিত্র শিল্পে প্রথম আধুনিকতার ছাপ দেস ডি, ডব্লিউ, গ্রিফিথ তাঁর "দি বার্থ অফ এ নেশান" নামক ছবিতে। তবুও এতদিন পর্যন্ত ছবিকে সবাক করা হয়নি। কেবল ছবির নীচে কোন কোন জায়গায় অল্প কথায় কাহিনীর পরিচিত পর্দায় দেখান হত। যাতে দর্শকদের বুঝতে অসুবিধা না হয়।

সবাক চিত্র প্রস্তুত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে গোড়ার দিকে। প্রথম সবাক চিত্রটির নাম "দি জাজ সিঙ্গার"। প্রকৃত পক্ষে এতদিনেই পূর্ণ হল মনের বাসনা।

সবাক চলচ্চিত্র অবশ্যই একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। অল্প খরচে মানুষের অবসর বিনোদনের এবং একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতে চলচ্চিত্রের

জুড়ি নেই। কোন কোন দেশ আবার চলচ্চিত্রকে করেছে শিক্ষার বাহন। আমাদের দেশেও সাধারণকে শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে বহু চিত্র নির্মিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যদিও চলচ্চিত্রের খারাপ দিকটাও কম নয়।

কোথায় এডিসনের ঘাড়ে করে বয়ে বেড়ানো খেলনা বায়োস্কোপ আর কোথায় আজকের সবাক চিত্রে। বিজ্ঞানের রাজ্যে সবই অদ্ভুত।

কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম

ইউরোপে তখন প্রথম বিশ্বমহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। মহাসমরের উদ্যোক্তা জার্মানীর শক্তির বহর দেখে সারা পৃথিবী স্তব্ধ। কোথায় পেল জার্মানী এত শক্তি আর কোত্থেকেই বা যোগাড় করল এত তেল, অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

জার্মানীতে খনিজ তেলের যথেষ্ট অভাব একথা মিত্রশক্তি জানতেন অথচ তেল না হলে যুদ্ধ চালান অসম্ভব। পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হল তারা যেন জার্মানীকে এক ফোঁটাও তেল সরবরাহ না করে। মিত্রশক্তি ভাবলেন এবার বাছাধনরা কেমন জব্দ! তেলের অভাবে একদিন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতেই হবে। হাতে না মেরে ভাতে মারা যাবে জার্মানীকে।

কিন্তু হায় রে হায়! দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চলার পর জার্মানীরা আত্মসমর্পন করা তো দূরের কথা এতটুকু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে বলেও মনে হল না। কী আর করেন মিত্রশক্তি! শেষে সর্বশক্তি নিয়োগ করে অনেক কষ্টে জার্মানীকে বশে আনলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও একটা প্রশ্ন থেকে গেল। ওরা কোথায় পেয়েছিল এত তেল, আর বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত করার জন্য এত অ্যামোনিয়া-নাইট্রিক অ্যাসিড? তারা কী আগে থেকে এগুলো সংগ্রহ করে রেখেছিল?

অনুসন্ধান করে জানা গেল, মিত্রশক্তি যে তেল সরবরাহ বন্ধ করবে এই সহজ বুদ্ধিটা জার্মানীদের ছিল। তাই তাঁরা কৃত্রিম ভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন তেল এবং অ্যামোনিয়াকে।

তেলের উপাদানগুলি হল কার্বন এবং হাইড্রোজেন। কিন্তু এই দুই মৌলিক পদার্থ সাধারণভাবে যুক্ত হয়ে তেল গঠন করতে পারে না। তাই পৃথিবীর মানুষকে তেলের জন্য খনির উপর নির্ভর করতে হয়। খনিজ তেলের চাহিদা সব দেশেই প্রচুর। যে দেশে প্রচুর পেট্রোলিয়ামের খনি আছে সে দেশকে ধনীর দেশই বলতে হবে।

জার্মানীরা করেছিলেন কী! কয়লার উপর দিয়ে উচ্চ-তাপে এবং অনুঘটকের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন চালনা করে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন পেট্রোলিয়াম। পৃথিবীর অপরাপর দেশ একথা চিন্তাই করেনি তখনও। আর আমোনিয়া ?

অ্যামোনিয়ার উপাদান হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন। এই দুটি গ্যাসও সাধারণ ভাবে ক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া গঠন করতে পারে না। বিজ্ঞানী হেবার জলীয় বাষ্প থেকে হাইড্রোজেন এবং বাতাসের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর তিন আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন নাইট্রোজেন মিশিয়ে, মিশ্রণকে দু'শ বায়ুমণ্ডল চাপে পিষ্ট করে ৫৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লৌহ অনুঘটকের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনযুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া গঠন করে নিয়েছিল।

অনুঘটক হচ্ছে এমন পদার্থ যা নিজে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না অথচ ক্রিয়াকে দ্রুততর অথবা মন্দীভূত করে।

বিশ্বের মানুষ সেদিন অবাক হয়ে গেছিল জার্মানীর বুদ্ধি দেখে। এও বুঝেছিল, নিছক মন্দ বলে আমরা যা বুঝি তার মধ্যেও কিছু ভাল থাকে। সেদিন প্রয়োজনের তাগিদেই তৈরি হয়েছিল কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম এবং অ্যামোনিয়া। এমনকি স্বার্থ প্রণোদিত ও বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই দুই আবিষ্কারের ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। যে দেশে তেলের খনি নেই সে দেশ কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম প্রস্তুত করে নিজের চাহিদা মেটাতে পারে। আর অ্যামোনিয়ার ব্যবহার যে কত ব্যাপক তা অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। কেবলমাত্র অ্যামোনিয়ার যৌগ থেকে যদি আজও অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে হত তাহলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারা যেত না।

ট্রানজিষ্টার

ইংরাজী ১৮৮৬ সালে জার্মান বিজ্ঞানী উইঙ্কলার একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। নিজের মাতৃভুমির নামানুযায়ী পদার্থটি নামকরণ করেন জার্মেনিয়াম। এই পদার্থটির পরিমাণ পৃথিবীতে খুবই কম। বোধ হয় সেই কারণেই জার্মেনিয়ামের আবিষ্কার হতে এত দেরী হয়।

আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও জার্মেনিয়ামকে নিয়ে চলেছিল দীর্ঘকাল গবেষণা। গবেষকরা বুঝতে পারলেন পদার্থটি সিলিকন ও টিনের সগোত্র। তড়িৎ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে দেখা গেল, জার্মেনিয়াম তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর মত উত্তম তড়িৎ পরিবাহী নয় আবার কাচ, অভ্র প্রভৃতির মত এত কুপরিবাহীও নয়। বিজ্ঞানীরা তখন ওকে চিহ্নিত করলেন অর্ধ পরিবাহী রূপে।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পরে জার্মেনিয়ামকে নিয়ে নতুন করে গবেষণা সুরু হয়। বিজ্ঞানীরা এবার চেষ্টা করলেন জার্মেনিয়ামকে রেডিও ভাল্বের মত কার্যকারী করতে। অবশ্য বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ওকে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা বহুদিনের। এমনকি বেতার তরঙ্গের গবেষণা কালে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, মার্কনি প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের ও জার্মেনিয়ামের

উপর দৃষ্টি পড়েছিল এবং দীর্ঘ দিন তাঁরা গবেষণা ও করেছিলেন।

রেডির ভাল্বের পরিপূরক হিসাবে জার্মেনিয়ামকে নিয়ে প্রথম ট্রানজিষ্টার তৈরি করেন ডঃ জন বার্ডিন ও ডঃ ওয়াল্টার ব্রাট্রাইন নামে দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী। তাঁদের আবিষ্কৃত ট্রানজিষ্টার ছিল এক টুকরা জার্মেনিয়াম কেলাসের মধ্যে দু টুকরা সরু তার! তার দুটির সংযোগস্থলের ব্যবধান ছিল অতি অল্প। এক মিলিমিটারের দশভাগের মত! এই ট্রানজিষ্টার রেডিও ভাল্বের পুরোপুরি চাহিদা মেটাতে পারেনি। তবে অনেকখানি সক্ষম হয়েছিল।

১৯৪৯ সালে বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ সকলেই ট্রানজিষ্টার সম্বন্ধে উন্নত মত পোষণ করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে জার্মেনিয়ামের তৈরি ট্রানজিষ্টার রেডিও ভাল্বের উপযোগী করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে তিনি প্রচুর গবেষণাও করেছিলেন।

১৯৫১ সালে সকলের গবেষণাকে কেন্দ্র করে আবিষ্কৃত হল প্রকৃত ট্রানজিষ্টার। সার্থক হল বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা। রেডিও ভাল্বের বদলে ব্যবহৃত হল ছোট ও হালকা ট্রানজিষ্টার।

এখন ট্রানজিষ্টারের আরও উন্নতি হয়েছে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নানা জাতীয় ট্রানজিষ্টার। অনেকে জার্মেনিয়ামের বদলে সিলিকনকে নিয়ে ট্রানজিষ্টার তৈরির কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু জার্মেনিয়ামের একটা বড় গুণ হল, ওর মত এত বিশুদ্ধ আর তেমন কোন পদার্থকে পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন হাজার কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে মাত্র একটি অন্য পদার্থে পরমাণু মিশে থাকে কিনা সন্দেহ।

ট্রানজিষ্টারের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। সব দেশই তৈরি করছে ট্রানজিষ্টার। তবে জাপান সবচেয়ে অগ্রণী। আজকাল টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রেও ট্রানজিষ্টার ব্যবহারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা কার্যকারী হবে। ফলে অল্পমূল্যে পাওয়া যাবে টেলিভিসন গ্রাহক যন্ত্র।

উচ্চতা মাপক যন্ত্র

এক ছিলেন রাজা।

প্রজাদের দেখতেন আপন ছেলের মত। তাদের সুখ দুখের খবর সংগ্রহ করার জন্যে রাজা রোজ রাতে মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন রাজ্যের এখানে ওখানে।

রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক দূরে রাজধানীর এক প্রান্তে বাস করত শ্রমিকেরা। তারা দিনের বেলায় আসত রাজবাড়ীতে কাজকর্ম করতে আর সন্ধ্যে বেলায় মজুরী নিয়ে ফিরে যেত ঘরে।

একদিন রাতে রাজা মন্ত্রী দুজনে শ্রমিকের পোষাক পরে হেঁটে যাচ্ছিলেন ওদের পাড়ার ভেতর দিয়ে। আদুল গাঁ, হাঁটু পর্যন্ত একটা ময়লা কাপড়, কাঁধে একখানা তেল চিটচিটে গামছা। চিনতে পারে কার সাধ্যি!

সেদিন আবার আকাশে ছিল চাঁদ—দিনটাও ছিল ভয়ানক গরম। পথের ধারে উঁচু একটা ঢিবির উপর দেখলেন তাঁরা কতকগুলো লোক জটলা বেঁধে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছে। রাজা ও মন্ত্রী ওদের কথাবার্তা শোনার জন্যে কান খাড়া করে একটা ভাঙ্গা পাঁচিলের পাশে চুপটি করে বসে রইলেন। ভাবলেন, এতগুলো লোক এক জায়গায় যখন জুটেছে তখন নিজেদের সুখদুঃখের কথা নিশ্চয়ই আলোচনা করবে।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরে একজন শ্রমিকের গলা ভেসে এল। সে তার দলের অন্যদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল ওগো ভায়েরা! তোমরা শোন, রাজার অন্যায়ের কথা।

দলের লোকগুলো কোলাহল আরম্ভ করে দিল। রাজা ও মন্ত্রী ভ্রু কুঁচকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন লোকটির কথা শোনার জন্য। এক সময় থেমে গেল কোলাহল লোকটি আরম্ভ করল: তোমারা যাই বল না কেন, আমার মনে হয় রাজার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

সমস্বরে সবাই জিজ্ঞাসা করল: কেন ভাই?

লোকটি বিষাদভরা গলায় বলল : আমরা সারাদিন রাজবাড়ীতে হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটছি, আর ঐ রাজ কর্মচারীরা কিছুই করছে না। সারাটা দিন কেবল কলম ধরে বসে থাকে। তাতেই রাজা তাদের দিচ্ছেন আমাদের চারগুণ মজুরী। বল, ভাইসব। রাজার অন্যায় হচ্ছে না?

দলের সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল লোকটিকে। কেউ কেউ বলল : ঠিক ধরেছে ভাই—ঠিক ধরেছ।

লোকটি এবার মুচকি হেসে বলল : আরও শোন, রাজার অবিচারের কথা। রাজ কর্মচারীরা যাই হোক কলম ধরে বসে থাকে কিন্তু মন্ত্রিমশাই কিচ্ছুটি করেন না। রাতদিন কেবল রাজার পাশে ঘুর ঘুর করেন আর প্রসাদে বসে রাজভোগ খান! আশ্চর্যের কথা, তিনি পেয়ে থাকেন সবার চেয়ে বেশি মাহিনে।

মন্ত্রিমশাই মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রাজা কিন্তু কিচ্ছুটি বললেন না। অল্প একটু হেসে মন্ত্রিকে টানতে টানতে রাজবাড়ীর পথ ধরলেন! প্রসাদে এসে মন্ত্রীকে বললেন রাজা : শুনলেন তো গুণধর প্রজাদের কথা। মন্ত্রীমশাই পাকা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন : হুঁ?

পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই রাজা নগর কোটালকে পাঠালেন শ্রমিকদের ডেকে আনার জন্য। সাত সকালে রাজার তলবের কথা শুনে তো শ্রমিকেরা অবাক! সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওদের। রাজার ডাক! ওরে বাপরে! কী নয় কী বিপদ হবে! যেন একেবারে বোবা হয়ে গেল তারা। তারপর এ, ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে, টলতে টলতে অনুসরণ করল নগর কোটালকে।

ততক্ষণে রাজা পাত্র মিত্রদের নিয়ে বসে গেছেন রাজসভায়। শ্রমিকেরা কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে এল রাজার সামনে। কান নাক মলে হাতজোর করে দাঁড়াল একপাশে। রাজা তাদের দেখে মাথা নেড়ে হাসতে লাগলেন আর মন্ত্রিমশাই বাঁকা চোখে তাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন : গতকাল রাতে তোমরা সেই ঢিবিটার উপরে বসে কী সব আলোচনা করছিলে যেন ?

সর্বনাশ ? এসব কথা রাজা শুনলেন কি করে ? বিরাট হাঁ করে, ঝড়ের সময় কলাপাতার মতো থর থর করে কাঁপতে লাগল তারা। ভাবলে, এবার রাজা তাদের গর্দানগুলো না নিয়ে ছাড়বেন না। চিঁ চিঁ করে বলতে লাগল : আজ্ঞে, আমি নই রাজা মশাই। ও-ই, ও-ই বলেছিল।

রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন : তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন, অ্যাঁ। ঠিক কথাই তো বলেছ তোমরা, কী বলেন মন্ত্রীমশাই ? মন্ত্রী মশাই চুপ করে রইলেন আর শ্রমিকদের মনও শান্ত হলনা একটুও। তারা রাজার পায়ের তলার গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল : এই বারটি আমাদের ক্ষমা করুন মহারাজ ! আর কখ্‌নো এমন কাজ করব না।

আবার হেসে উঠলেন রাজা। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন : আজ আমি তোমাদের ডেকেছি, তোমরা বেশি বেতন পাওয়ার যোগ্য কিনা বিচার করতে।

জোড়হাতে দাঁড়াল শ্রমিকেরা।

রাজা আঙ্গুল দিয়ে দূরের একটা পিরামিডকে দেখিয়ে বললেন : ঐ দেখ, দূরের পিরামিডটাকে ? ওটির উচ্চতা মেপে দিতে হবে তোমাদের।

একটু থেমে আবার বললেন : আমি অবশ্য এখনই তোমাদের মেপে দিতে বলছি না। তিনদিন সময় দিচ্ছি তোমাদের। ঘরে বসে ভাল ভাবে চিন্তা করগে। কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করলেন : ওদের সবাইকে তিন দিনের বেতন দিয়ে দাও।

চিন্তিত মুখে রাজসভা ত্যাগ করল শ্রমিকেরা। দিন রাত ধরে আলোচনা চলতে লাগল, কেমন করে মাপা যাবে পিরামিডটার উচ্চতা। কেউ বললে, প্রকাণ্ড একখানা মই তৈরি করলে কেমন হয় ? কিন্তু এত বড় মই তৈরি করতে কোন কারিগরই রাজী হল না। কারিগররা বললে মই

তৈরি করলে হবেই বা কী ? পিরমিড গুলো যে উপরে দিকে ছুঁচলো আর তলার দিকটা ভয়ানক চওড়া। উপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে ঠিক উচ্চতা পাওয়া যাবে না। তাহলে উপায় ?

তিনদিন তিনরাত পরে আবার তাদের ডাক পড়ল রাজসভায়, রাজা জিজ্ঞাসা করলেন কোন উপায় বার করতে পারলে তোমরা ?

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল তারা : আজ্ঞে না, রাজা মশাই।

হাসলেন রাজা। ডেকে পাঠালেন প্রসাদের কর্মচারীকে। কর্মচারীটির নাম থেল্‌স। আঁক জোকের কাজ করতেন তিনি। রাজা বললেন : তোমাকে ঐ পিরমিডটার উচ্চতা মেপে দিতে হবে থেল্‌স। মাত্র একদিন সময় দিলাম। কাল সকালের মধ্যে যদি মাপতে না পার তাহলে চাকরী থাকবে না।

থেল্‌স ছিলেন মহাপণ্ডিত। রাজার কথা শুনে একটু চিন্তা করলেন তিনি। তারপর হাসিমুখে বললেন : এ আর এমন কী শক্ত কাজ মহারাজ ? আমি এক্ষুনি মেপে দিচ্ছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে থেল্‌স রাজ সভায় নিয়ে এলেন, একটা লম্বা লাঠি এবং একটা মাপনি দণ্ড। তারপর তিনি দলবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন ফাঁকা মাঠে। সেখানে ভালভাবে মাটিতে পুঁতলেন লাঠিটা। চারদিকে ঝলমল করছিল সোনালী রোদ্দুর। একটা দীর্ঘ ছায়া পাওয়া গেল লাঠির। থেল্‌স লাঠি ও ছায়া দুটোই মাপলেন। এবার মাপনি দণ্ডটা নিয়ে মেপে ফেললেন পিরামিডের ছায়াটা। হিসাব করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নির্ণয় করে ফেললেন পিরামিডটির প্রকৃত উচ্চতা।

এই সহজ উপায়টা তিনদিন ধরে মাথায় আসেনি বলে লজ্জায় মাথা হেঁট করল শ্রমিকেরা। রাজা তখন মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনি এবার একটা ব্যবস্থা নিন। প্রজাদের মতে আপনি যখন বেশি বেতন পান, তখন আপনার পদ্ধতিটাও একটু স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন।

মন্ত্রী কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন : আমাকে মাত্র দুটি দিন সময়

দিতে হবে মহারাজ।

রাজা বললেন ঃ আচ্ছা, তাই হবে তুদিন সময় দিলাম আপনাকে। মন্ত্রীমশাই তুদিন ধরে জরীপ বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে কী সব আলোচনা করলেন। তারপর তৈরি করলেন একটা যন্ত্র। নাম দিলেন "সেক্সট্যাণ্ট"।

সেক্সট্যাণ্ট যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষের হল অনেক সুবিধে। বড় বড় পাহাড় পর্বতের ও উচ্চতা মাপতে লাগল। এমন কি গ্রহ নক্ষত্রদের দূরত্ব এবং অবস্থান নির্ণয়ও চলতে লাগল।

কিন্তু সেক্সট্যাণ্ট যন্ত্রের অসুবিধেও অনেকখানি। যন্ত্রটিকে স্থল-ভাগের উপর ভালভাবে ব্যবহার করা যায় না। সমুদ্রের উপর ব্যবহার করলেই সুফল মেলে। ঐ অসুবিধেটুকু দূর করার জন্যে পরবর্তীকালে আরবীয় পণ্ডিতগণ সেক্সট্যাণ্ট ধরণের আর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটির নাম থিওডোলাইট (Theodolite)।

আজও যন্ত্রটি জরীপের কাজে ব্যবহার করা হয়।

মুদ্রাযন্ত্র

এক ছিলেন মণিকার।

ভালো শিল্পীও ছিলেন তিনি। মণি মুক্তা, চুনি-পান্না, হীরে জহরৎ প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন পাথর কেটে পালিশ করতে তিনি ছিলেন মহা ওস্তাদ। নাম ডাক ছিল যথেষ্ট। রাজ্যের যত আমির-ওমরাহ, সবাই এসে ভীড় করতেন শিল্পীর দোকানে। বড় বড় মানুষের আদেশ প্রতিপালন করতে হত ব'লে শিল্পীকে অনেক সময় খাটতে হত প্রচুর।

একদিন কাজ করতে করতে বড্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন শিল্পী। ভাবলেন, আজকে আর নয়। আগামীকাল সকাল সকাল কাজ আরম্ভ

করা যাবে। স্ত্রী এনাকে ডেকে বললেন : কাজ করতে এখন ভাল লাগছে না। এস, একহাত তাস খেলি।

এনা হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তাস খেলতে।

এখনকার মত সে সময় তাস এত সহজলভ্য ছিল না। মোটা কাগজের উপর রঙ তুলি দিয়ে শিল্পীদের তাদের ছবি আঁকতে হত। সেদিন খেলা শেষে শিল্পীর কী খেয়াল হল! ভাবলেন, নিজ হাতেই এক বাণ্ডিল ভাল তাস তৈরি করবেন। খেয়ালী শিল্পী সঙ্গে সঙ্গে রঙ তুলি এবং কাগজ নিয়ে বসে গেলেন। কয়েকখানা তাস আঁকার পর বিরক্ত হয়ে উঠলেন মনে মনে। রঙ তুলি সরিয়ে রেখে অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করতে বসলেন।

ঘরে হাতুড়ি বাটালী ছিল। আর ছিল টুকরো টুকরো কাঠ। এক সময় দেরাজ থেকে হাতুড়ি বাটালি পেড়ে এনে কাঠের উপর ঠুকতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে কাঠের উপর তাসের ছবির অনুরূপ দাগ কাটলেন। তারপর দাগের বাহিরের কাঠগুলো কেটে উড়িয়ে দিলেন। কাঠটা উঁচু নীচু হয়ে পড়ল। তখন তার উপর কালি মাখিয়ে ছাপ দিলেন কাগজে। সুন্দর একখানা তাস তৈরি হয়ে গেল। শিল্পী খুশী হয়ে ছুটলেন স্ত্রী এনার কাছে। বললেন : দেখ দেখ এনা কেমন সুন্দর তাস তৈরি করেছি!

সব শুনে এনাও চমৎকৃত হলেন। উৎসাহিত করলেন স্বামীকে আরও তাস তৈরি করার জন্যে।

শিল্পীর আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। দোকানের কাজকর্ম বন্ধ রেখে কেবল তাসই তৈরি করতে লাগলেন। কয়েকদিনে বেশ কয়েক বাণ্ডিল তাস তৈরি হয়ে গেল। আনন্দে আত্মহারা শিল্পী বন্ধুদের প্রত্যেককে উপহার দিলেন এক বাণ্ডিল করে তাস।

অসুবিধেও অনুভব করলেন একটু। দেখতে পেলেন, একটা কাঠের ছাচ দিয়ে কয়েকবার কাগজে ছাপ দিলে ছাঁচটা ভোঁতা হয়ে যায়। ফলে আগের মত তত সুন্দর ছাপ পড়ে না। তাছাড়াও দেখলেন, ছাঁচের উপর কালি একটু বেশি হয়ে গেলে ছবি বড় বিশ্রী হয়ে পড়ে, এই অসুবিধেগুলো

দূর করতে সচেষ্ট হলেন শিল্পী। স্ত্রী এনাও এগিয়ে এলেন স্বামীকে সাহায্য করতে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুঝতে পারলেন তাঁরা, ছাঁচ তৈরির কাজে একমাত্র আপেল গাছের কাঠেই কিছুটা উপযোগী। কালির অসুবিধে দূর করতে প্রস্তুত করলেন কাজলের তেল। এবার তাস হল ভারি সুন্দর। সবাই প্রশংসা করকে লাগল শিল্পীর।

দোকান এবার মাথায় উঠল। রোজগার ছেড়ে শিল্পী ছাপার কাজে মেতে উঠলেন। আরম্ভ করলেন, ছবি এবং অক্ষর দুটোকেই কাঠের উপর খোদাই করতে। বেশ সফলও হলেন এ কাজে। বড় বড় কাগজে মহাপুরুষদের ছবি এবং ছবির নীচে তাঁদের পরিচয় ছাপার অক্ষরে লিখে ঝুলিয়ে রাখলেন দোকানে। অবাক হয়ে গেল মানুষ। দাম দিয়ে কিনতেও লাগল কেউ কেউ।

একদিন এক পাদরী সাহেব এলেন দোকানে। শিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারলেন না। ভাবলেন তিনি, যদি মহানজীবন কাহিনীগুলি ছাপার অক্ষরে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যেত তাহলে কতই না উপকৃত হত মানুষ। একমাত্র এই শিল্পীর দ্বারাই এমন কঠিন কাজ সম্ভব হতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে পাদরী সাহেব প্রথমে লিখলেন ষাট পৃষ্ঠার মহাজীবন কথার একখানি বই। শিল্পীকে চেপে ধরলেন, যেমন করে হোক বইটা ছাপতে হবে।

শিল্পী প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেলেন। এতগুলো অক্ষর কাঠে খোদাই করা কী সম্ভব ? এতে অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার! কিন্তু পাদরী সাহেব কিছুতেই ছাড়লেন না শিল্পীকে। শেষে বাধ্য হয়ে শিল্পীকে রাজী হতে হল। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্ত্রী এনা এবং আরও দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কয়েকমাসের অক্লান্ত চেষ্টায় বইটির ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হল। বই দেখে পাদরীসাহেব হলেন বেজায় খুশি। শিল্পীর উৎসাহ ও বেড়ে গেল

অনেকখানি। পাদরী সাহেবের সেই বইটিই পৃথিবীর প্রথম ছাপার অক্ষরের বই। উৎসাহী শিল্পী এইবার বাইবেল ছাপাতে ইচ্ছে করলেন। পুরোন সহকর্মীগণ এবং আরও কয়েকজন কারিগরকে নিয়ে একদিন শুভক্ষণে হাত দিতেন এই মহান কাজে। চারদিনের দিন প্রস্তুত হল বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠার ব্লক। পরম আগ্রহভরে শিল্পী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন সেই ব্লকখানা। হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। হাত ফস্কে ব্লকখানা পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে সেটি ভেঙ্গে হয়ে গেল দু'টুকরো। হায় হায় করে উঠলেন শিল্পী। এমন মহান কাজে এই ধরণের ধাক্কা পেয়ে প্রথমটা মুষড়ে পড়লেন। শিল্পীকে অনেক করে বোঝালেন এনা। বললেন: এটি বাধা নাও হতে পারে, হয়ত ঈশ্বরের সদিচ্ছা। মন খারাপ না করে নিজের কাজে মন দাও, জয় তোমার অবশ্যই হবে।

এনার কথায় নতুন করে উৎসাহ লাভ করলেন শিল্পী। একদিন তাঁর মনে এল, কাঠের উপর অক্ষর খোদাই করতে গেলে এমন বিপত্তি ঘটা অসম্ভব নয়। তার চেয়ে কাঠের অক্ষর তৈরি করে কাঠের ফলকে একটার পর একটা সাজিয়ে দিলে কেমন হয়?

বাইবেল ছাপার কাজ আপাততঃ বন্ধ রেখে অক্ষর তৈরির কাজে মন দিলেন শিল্পী। মাসের পর মাস ধরে চলল এই কাজ। কত হাজার হাজার অক্ষর তৈরি হয়ে গেল। শিল্পী এই অক্ষরগুলোর নাম দিলেন টাইপ।

কয়েকমাস পরে পর্যাপ্ত অক্ষর তৈরির পর বন্ধুদের এবং এনাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠের ব্লকে সেগুলো সাজাতে লাগলেন। তারপর একদিন ছাপিয়ে ফেলবেন পুরো বাইবেলখানা। ধন্য ধন্য পড়ে গেল দেশে। পৃথিবীতে সেই থেকে আরম্ভ হল মুদ্রণ যন্ত্রের কাজ।

এই খেয়ালী শিল্পীটির নাম গুটেন বার্গ। অপরিসীম ক্লান্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেদিন হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাস। আশ্চর্যের কথা, সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিন গড়ে উঠল ছাপাখানা।

গুটেন বার্গ সারা জীবন ধরে মুদ্রন যন্ত্রের প্রানপাত পরিশ্রম করে

গেছেন। কাঠের টাইপের বদলে তিনিই উদ্ভাবন করেছেন ধাতু নির্মিত টেকসই টাইপ।

এমন মহান আবিষ্কারকের সারাজীবন কেটেছে অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্রের মধ্য দিয়ে। যেদিন দোকান ছেড়ে নিজেকে নিয়োজিত করলেন ছাপার কাজে, সেইদিনই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিলেন দারিদ্র্যকে। প্রকৃত শিল্পী ছিলেন তিনি। নতুন কোন কিছু করার আনন্দে ডুবে থাকতে চাইতেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁর ছিল না, তাঁর স্ত্রী এনারও ছিল না। তাই পদে পদে হোঁচট খেতে হয়েছিল তাঁদের। শেষ জীবনে চরম দুঃসময়ের সময় একমাত্র এনাই ছিলেন তাঁর সান্ত্বনা। কিন্তু ঈশ্বরের কী নির্মম বিধান, সেই এনাকেই তাঁকে হারাতে হয়েছিল চিরতরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবনেও তাঁর কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এক কানাকড়িও ছিল না কাছে, মেঞ্জের পাদরী সাহেব নিতান্ত দয়া পরবশ হয়ে কিছু পেনসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

আজ আমরা ছাপার বদলে হাতে লেখা বইয়ের কল্পনাও করতে পারি না। ছাপাবইয়ের মূলে আছে খেয়ালী শিল্পী গুটেন বার্গের মহত্তর অবদান।

অনেকে মনে করেন, অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মুদ্রণ প্রথা প্রথম আবিষ্কার করেন। জাপানী গাথায় লেখা আছে, ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দশ লক্ষ মন্ত্র ছাপান হয়েছিল। সে যুগে চীন দেশে কাগজের উপর বুদ্ধমূর্তির ছাপ দেওয়া হত বলেও প্রবাদ আছে। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন যাদু ঘরে ছাপান জাপানী গাথার কিছু কিছু অংশ দেখা যায়। তবুও ছাপাখানার প্রকৃত আবিষ্কারক বলতে হবে শিল্পী গুটেন বার্গকে। তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। সত্য বলতে কী, একমাত্র তিনিই বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডার সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেছেন।

কুইনিন

রাজার গল্প নয়, এক লাট সাহেবের গল্প।

ভারি ভাল লোক ছিলেন সেই লাট সাহেব। দেশের লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর চেষ্টার এতটুকুও ত্রুটি ছিল না। ধনী দরিদ্র সবাই ভালো বাসতেন তাঁকে। এমন যে দরদী মানুষ, তাঁর হল একবার ভয়ানক অসুখ। কত বদ্দি, কোবরেজ এলেন আর গেলেন। কিন্তু কেউই তাঁর রোগ ধরতে পারলেন না। দিনের পর দিন জ্বর বাড়তেই লাগল। দেখত সবাই, দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসত। তারপর কয়েক ঘণ্টা পরে হাড় গোড় কাঁপিয়ে জ্বরটা ছেড়ে যেত।

জ্বরে ভুগতে ভুগতে লাট সাহেবের সোনার অঙ্গ একদিন কালি হয়ে গেল। উঠতে বসতে গেলে শরীরের হাড় ক'খানা ঝন্‌ঝন্ করে উঠত। ক্ষিধে হত না মোটেই। কাজকর্ম করার শক্তিও লোপ পেয়েছিল বহুদিন পূর্বে। দেশের লোকে হায় হায় করতে লাগল। ঘোষণা করা হল, যিনি লাট সাহেবের অসুখ সারাতে পারলেন তাঁকে দেওয়া হবে প্রচুর পরস্কার।

পুরস্কারের লোভে দেশ বিদেশ থেকে এলেন ডাক্তার, বদ্দি কোবরেজ আর হেকিম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লাট সাহেব সেই যে বিছানা ধরলেন আর উঠতে পারলেন না। মানুষজন নীরবে কাঁদতে লাগল জীবনের আশা ছেড়ে দিল সবাই।

এমন সময় একদিন এলেন থুত্থুরে বুড়ো এক বদ্দি। বললেন ঃ আমি একবার লাট সাহেবকে দেখতে চাই।

প্রাসাদের লোকজন খুব খাতির করে নিয়ে গেল বদ্দি মশাইকে। বুড়ো বদ্দি চোখে চমশা এঁটে ভাল করে দেখলেন লাটসাহেবকে। চোখ দেখলেন, জিভ দেখলেন পেট টিপলেন, কত কী! শেষে তাঁর থলে থেকে বার করলেন শুকনো কতকগুলো গাছের ছাল। লোকজনদের বললে ঃ

ছালগুলো বেটে রোগীকে দিনে তিনবার করে খাওয়ালে চারদিনেই জ্বর ছেড়ে পালাবে।

আজব কথা! মাত্র হুদিন ব্যবহার করার পর আর জ্বর এল না। রাজ্য জুড়ে, বুড়ো বদ্দির জয়জয়কার পড়ে গেল। ধরে বসল সবাই ঐ গাছটাকে যেমন করে হোক চিনিয়ে দিতেই হবে।

বুড়ো বদ্দি এক কথায় রাজী হয়ে সব্বাইকে চিনিয়ে দিলেন গাছটা। সেই লাটসাহেবের নাম ছিল কাউণ্ট অব সিন্‌কেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু নামে রাজ্য আছে একটা। সিনকেন সেই-খানকার বড়লাট ছিলেন। তাঁরই নামানুসারে গাছটির নামকরণ করা হল সিন্‌কোনা।

বিজ্ঞানী ক্যাভেলটু ও বিজ্ঞানী পেলটিয়ার এই সিনকোনা গাছ থেকে কুইনিন আবিষ্কার করেছেন। কুইনিন ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র ওষুধ।

সিন্‌কোনা গাছের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। ধীরে ধীরে গাছটির আশ্চর্য গুণের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবী নানান দেশের মানুষ সিনকোনা গাছ সংগ্রহের জন্য ছুটে এল দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে। দেখতে দেখতে সব দেশেই সিনকোনা গাছ চাষের ধুম পড়ে যায়। ভারতবর্ষের দার্জিলিং জেলার আবহাওয়া ঐ গাছের অনুকুল বলে একমাত্র মংপুতেই সিনকোনা গাছের চাষ হল।

এখন অবশ্য কুইনিনের বিরাট চাহিদা একমাত্র সিনকোনা গাছ থেকে মেটাতে পারছে না! রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিমভাবেও প্রস্তুত হচ্ছে।

ব্যারোমিটার

একবার এক ধনী ব্যক্তি একটা বড় ধরনের কুয়া খুঁড়তে আরম্ভ করলেন। ইচ্ছা ছিল খুব গভীর করে খুঁড়বেন কুয়াটা। অনেক লোক লস্কর লাগান হল। কাজও এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে। কিছু দূর খুঁড়ে যাওয়ার পর যে জলটা চুঁইয়ে আসত সেটা পাম্প বসিয়ে সেচ দেওয়া হত।

চৌত্রিশ ফুট (১) অসুবিধার সম্মুখীন হলেন ভদ্রলোক। হাজার চেষ্টা করেও পাম্প ঠেকিয়ে এক ফোঁটা জল উপরে তুলতে পারলেন না। ভদ্রলোক মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। নিজে অনেক চিন্তা করলেন, দু-দশ জনকে জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু কেউই কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। তবুও হাল ছাড়লেন না ভদ্রলোক। একদিন হাজির হলেন সে সময়কার সেরা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কাছে।

গ্যালিলিও তখন অতিবৃদ্ধ। তার উপর অন্ধও হয়ে পড়েছেন। কোন কথা মনে রাখতে পারেন না, আবার ভালভাবে চিন্তাও করতে পারেন না। অগত্যা তিনি ডাকলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য টরিসেলিকে বুঝিয়ে বললেন, যেমন করে হোক কারণটা ব্যাখ্যা করতেই হবে।

টরিসেলি ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরে এলেন! পরের দিন হাজির হলেন সেই কুয়াটার কাছে। একটা দড়ির তলায় এক টুকরো ইট বেঁধে কুয়ায় নামিয়ে গভীরতাটাও মেপে নিলেন। দেখলেন কুয়াটা চৌত্রিশ ফুটের চেয়ে কিছু বেশী গভীর হয়েছে।

তিনিও বড় কম আশ্চর্য বোধ করলেন না। ঘরে বসে অনেক চিন্তা করলেন, কেন পাম্প দিয়ে চৌত্রিশ ফুট তলা থেকে জল তোলা যায় না। কে তার প্রতিবন্ধক? হঠাৎ মনে এল বায়ুর কথা। এই ব্যাপারের

মূলে বায়ুর কী কোন ক্রিয়া আছে ? পরীক্ষা করে একবার দেখাই যাক না !

যেই ভাব সেই-ই কাজ। একমিটার লম্বা এবং এক মুখ খোলা একটা কাচের নল জলের চেয়ে সাড়ে তেরগুণ ভারী তরল পারদকে ঢোকালেন। তারপর নলটিকে পারদে পূর্ণ করে একটা পারদ পাত্রে উপুড় করে ধরলেন।

আশ্চর্য ! নলের ভেতরের পারদ ধীরে ধীরে নেমে উনত্রিশ ইঞ্চি বা ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার উচ্চতায় স্থির হয়ে থাকল-আর নামল না। টরিসেলির এবার বুঝতে অসুবিধা হলনা যে, বায়ু মণ্ডলের চাপ ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার উচ্চতার পারদকে ধরে রাখতে পারে। যেহেতু পারদ জলের চেয়ে ১৩.৬ গুণ ভারি, তাই বায়ুমণ্ডল ২৯ × ১৩.৬ = ৩৯৪.৪ ইঞ্চি বা ৩৪ ফুট (প্রায়) জলকে ধরে রাখতে পারে। ঐ কারণে সাধারণ পাম্প ৩৪ ফুটের মধ্যেই কার্যকরী।

টরিসেলি এবার চিন্তা করলেন, পরীক্ষাটিকে বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করলেন একটা যন্ত্র। নাম হল ব্যারোমিটার। ব্যারোমিটারের মূল নীতি হচ্ছে টরিসেলির পূর্বোক্ত পরীক্ষাটি।

বায়ুর চাপ মাপার জন্য ব্যারোমিটারই একমাত্র যন্ত্র। বায়ুর চাপ সব সময় স্থির থাকে না। কখনও বাড়ে আবার কখনও কমে যায়। তার একমাত্র কারণ, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের হ্রাস বৃদ্ধি। বায়ুতে জলীয়-বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং ধরা পড়ে ঐ ব্যারোমিটারে। চাপ কমলে বুঝতে হবে অতি শীঘ্রই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ! বায়ুর চাপ বাড়তে থাকলে আবহাওয়া পরিষ্কার হবে।

ব্যারোমিটার আমাদের কত যে উপকার করে তা বলে শেষ করা যায় না।

ষ্টেথস্ কোপ

এক ছিলেন ডাক্তার নাম তাঁর থিয়োফিল লিনেক। প্যারিসের এক নামকরা হাসপাতালে চাকরী করতেন ডাক্তার লিনেক। মানুষ হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন সৎ ও সরল অন্যদিকে চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূরান্তে। একমাত্র পীড়িত জনের সেবা ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

একদিন হাসপাতালে এল একটি বিশেষ ধরণের রোগী। রোগটা বড্ড জটিল। ডাক্তার লিনেক অনেকক্ষণ ধরে রোগীকে পরীক্ষা করলেন। বুঝতে পারলেন, রোগীর বুকের অসুখ। বুকের উপর নিজের কান ঠেকালেন হৃৎপিণ্ডের ধুক ধুকানি শোনার জন্য। কিন্তু ধুক ধুক শব্দটা এত ক্ষীণ যে ডাক্তার কিছুতেই ধরতে পারলেন না অসুখটা।

বড় মনমরা হয়ে পড়লেন ডাক্তার। এক সময় তাঁর হাসপাতালের ডিউটি শেষ হয়ে গেল। এবার বাড়ী ফেরার কথা। মনটা বেজায় খারাপ ছিল বলে ডাক্তার বাড়ীর দিকে না গিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালেন। নতুন রোগীটির কথা ভাবতে অন্যমনস্কের মত পথ হাঁটছিলেন তিনি।

তখন সূর্য অস্ত যায় যায়। চারদিকে নেমে এসেছে একটা ম্লান ছায়া। শহরের বাড়ীগুলির শীর্ষে কে যেন এই মাত্র পাতিয়ে দিয়ে গেছে হলদে একখানা চাদর। রাস্তার ধারে পামগাছ গুলোর মাথায় সোনালী আস্তরণ। আনমনা ডাক্তার কাছে একটা পার্ক দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লেন সেখানে।

পার্ক তখন ভরে উঠেছে লোকজনে। খেলা করছে ছেলে মেয়েরা। তাদের কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠছে পার্কের আকাশ বাতাস। যেন কলকল করছে এক ঝাঁক বুলবুল। ডাক্তার লিনেক নিমেষে হারিয়ে

ফেললেন নিজেকে। সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে, সবুজ মন নিয়ে, সবুজদের খেলা উপভোগ করতে লাগলেন।

এমন সময় তাঁর মন কেড়ে নিল পার্কের এক কোনে বসে থাকা দুটি ছেলে। তাদের সামনে পড়ে আছে একটা লম্বা কাটের তক্তা। দুপ্রান্তে দু'জনে বসে আছে আর হিহি করে হাসছে। ডাক্তার লিনেক দেখলেন, এ প্রান্তের এ ছেলেটি তক্তার উপর কান ঠেকিয়ে আছে আর অপর প্রান্তের ছেলেটি টোকা মারছে এবং চুপি চুপি কি সব কথা বলছে। তা শুনে এ পাশের ছেলেটি হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছে। তারপর হাসি থামিয়ে সে প্রান্তের ছেলের মত এও টোকা দিচ্ছে কথা বলছে। সে ছেলেটিও অনুরূপ ভাবে হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

খেলাটা দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা ডাক্তার লিনেকের মনে এল। সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করলেন। বাড়ী না গিয়ে ছুটে গেলেন সোজা হাসপাতালে। অনেকটা পথ ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠেছিলে ডাক্তার। নার্সরা অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তারকে ফিরে আসতে দেখে। কোথায়ও কিছু ত্রুটী হয়ে গেছে ভেবে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে একজনকে বললেন: আমাকে তাড়াতাড়ি এক টুকরা মোটা কাগজ এনে দাও দেখি মা!

নার্সটি অবিলম্বে ডাক্তারের আদেশ পালন করলেন। কাগজ খানা হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাক দিয়ে একটা নলের মত করলেন ডাক্তার নিলেক। তারপর সেই নতুন রোগীটির কাছে গিয়ে তার বুকে নলটি ঠেকিয়ে দিলেন। নলের অপর প্রান্তে পাতলেন নিজের কান। ঠিক ঠিক। যা ভেবেছিলেন তাই হল। মুহূর্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাক্তারের মুখ মণ্ডল। এতক্ষণে তিনি ধরতে পারলে রোগীর বুকের অসুখটা।

সেই থেকে রোগীর রোগ পরীক্ষা করতে গিয়ে রোগীর বুকে কাগজের নল ঠেকিয়ে কান পাততেন ডাক্তার। কিন্তু অনেক সময়

অসুবিধাও হত অনেক। পরিশেষে একজন ছুতোর মিস্ত্রীকে ডাকিয়ে দুটি কাঠের নল তৈরি করে নিয়েছিলেন।

ডাক্তারদের বুক পরীক্ষা যন্ত্র স্টেথস্‌কোপের জন্ম হয়েছিল ঠিক এই ভাবে—ডাক্তার থিয়োফিল লিনেকের হাতে।

পরবর্তীকালে কাঠের স্টেথস্‌কোপের পরিবর্তে রবারের তৈরি নল ব্যবহার করা হয় এবং যন্ত্রটির আরও উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এর আবিষ্কর্তা হিসাবে চিরকাল মানুষ ডাক্তার থিয়োফিল লিনেকের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। বিশ্বের মানব হিতৈষী বিজ্ঞানীদের অন্যতম যিনি।

অবোধ শিশুদের অতি সাধারণ একটি খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বড় এক মহৎ জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে—আশ্চর্য নয় কি?

নিষ্ক্রিয় গ্যাস

বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিসের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। তাঁর সময় সবার ধারণা ছিল, বায়ু প্রধানত অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের মিশ্রণ এই দুটি গ্যাস ছাড়াও যে কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প এবং কার্বনডাই অক্সাইড আছে একথাও কারুর অজানা ছিল না। বিজ্ঞানীরা আরও জানতেন, বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাধিক অর্থাৎ পাঁচ ভাগের মধ্যে প্রায় চার ভাগের মত।

একবার ক্যাভেণ্ডিসের কী খেয়াল হল। ভাবলেন, সব জায়গার বাতাসের নাইট্রোজেনের পরিমাণ সমান কি না একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বেশ কিছুদিন ধরে চালালেন গবেষণা। গবেষণায় সুফলই পেলেন। কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর দ্বিধা থেকে গেল। তিনি যতবারই

পরীক্ষা করলেন ততবারই দেখলেন, বাতাস থেকে অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, ইত্যাদিকে সরিয়ে নেওয়ার পর অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস অবশিষ্ট থেকে যায়। অবশিষ্ট গ্যাসটি যে কি, তা তিনি হাজার চেষ্টা করেও ধরতে পারলেন না।

কেটে গেল ক্যাভেণ্ডিসের কাল। অনেকদিন পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী উক্ত গ্যাসের রহস্য উদ্ঘাটন করতে এগিয়ে এলেন না। দীর্ঘকাল পরে একদিন বিজ্ঞানী র‍্যালে বাতাসে অবস্থিত গ্যাসগুলোর পরিচয় জানাবার জন্য পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, রসায়নাগারে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ঘনত্বের সঙ্গে বাতাস থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের ঘনত্বের মিল নেই। যদি সেই তফাৎটা ছিল অতি নগন্য।

অতি তুচ্ছ ঘটনাও বিজ্ঞানীদের চোখ এড়িয়ে যায় না। তাই বোধ হয় সেদিন সেই সামান্য ঘটনাকে অবহেলা করতে পারেনি বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে। এক আধবার নয়, বেশ কয়েকবার ধরে পরীক্ষাটি করলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারেই দেখলেন কিছু না কিছু গরমিন হচ্ছে। তখন ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার কথাও তার মনে পড়ল। সিদ্ধান্ত করলেন, বাতাসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত গ্যাসগুলি ছাড়া অপর কতকগুলো গ্যাস মিশে আছে। সেই গ্যাস গুলোর পরিচয় আজও মানুষ লাভ করতে সমর্থ হয়নি!

র‍্যালের পরীক্ষা এবং সিদ্ধাতের দ্বারা আকৃষ্ট হলেন রামকান্ত নামে একজন রসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি যে কিছু পরিমাণ বায়ুকে বদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত তামার পাতের উপর পরিচালনা করলেন। বায়ুতে অবস্থিত সমূহ অক্সিজেন তামার সঙ্গে ক্রিয়া করে মুক্ত হয়ে গেল। তারপর অক্সিজেন বিহীন বায়ুকে চালনা করলেন উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়ে। এবার যত নাইট্রোজেন ছিল সবই ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইডকেও সরিয়ে দিলেন। তবুও অবশেষে রূপ পেলেন অতি সামান্য গ্যাস।

গ্যাসটি নিয়ে পরীক্ষা করলেন র‍্যামজে। দেখলেন র‍্যালের কথাই

ঠিক। এই গ্যাসটির পরিচয় আজও মানুষ পায়নি। র‍্যামজে তখন গ্যাসটির সঙ্গে অপর কোন পদার্থের ক্রিয়া হয় কিনা পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কোন বস্তুর সঙ্গে ক্রিয়া করাতে পারলেন না। একেবারে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। র‍্যালজে গ্যাসটির নাম করন করলেন "আর্গন'। আর্গনের বাংলা অর্থ করলে হয় "অলস গ্যাস"।

আর্গন আবিষ্কারের পর চারদিকে বিরাট সাড়া পড়ে গেল। হাতে যন্ত্রপাতি নিয়ে বায়ুকে পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলেন দলে দলে বিজ্ঞানী। যদি আর্গন ছাড়া আর কোন গ্যাস পাওয়া যায়।

ব্যর্থ হল না বিজ্ঞানীদের সে প্রচেষ্টা। একদিন 'জনসন' নামে এক বিজ্ঞানী সন্ধান পেলেন অপর একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের, জনসনের আবিষ্কৃত গ্যাসটির নাম করণ করা হল হিলিয়াম।

আর্গন এবং হিলিয়াম আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বিজ্ঞানীদের বায়ুকে নিয়ে পরীক্ষা অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ আবার তরল বায়ুকে নিয়ে পরীক্ষায় মেতে উঠলেন। তরল বায়ুতে বিজ্ঞানীরা একদিন সন্ধান পেলেন ক্রিপটন ও জেননের উক্ত গ্যাসগুলি আবিষ্কারের পরে অর্থাৎ সর্বশেষে সেই র‍্যামজেই আবিষ্কার করলেন নিয়ন নামের আর একটি গ্যাসকে।

আর্গন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি গ্যাসের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট হল এরা কোন কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে না। এরা সক্রিয় যদি হত, তাহলে প্রকৃতিতে ঐ সব পদার্থের যৌগিক অবশ্যই পাওয়া যেত এবং মানুষের পরিচয় লাভ করতে এত দেরীও হত না। অনেক আগেই আবিষ্কার করে ফেলতেন বিজ্ঞানীরা। কারও সঙ্গে এরা ক্রিয়া করে না বলেই ওদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। সিন্ধবাদ বণিকের ঘাড়ে ভূতের মত ওরা মাঝে মাঝে কোন কোন খনিজ পদার্থের উপর চেপে বসে। বেচারা সিন্ধবাদকে ভূত নামাতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল এবং বুদ্ধিও কম খরচ করতে হয়নি। কিন্তু খনিজ পদার্থের উপর নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর করলে তাড়াতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। একটু উত্তাপ দিলেই ব্যস।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো রঙ, বেরঙের আলোক সজ্জা প্রদর্শনের জন্যই বেশী করে ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়ে নিয়ন গ্যাসের ব্যবহারই সর্বাধিক।

স্প্রু রোগের ওষুধ

এক ছিলেন তরুণ।

মাদ্রাজ শহরে এক দরিদ্র কেরাণীর ঘরে জন্ম তাঁর। কেরাণীগিরি করে বাবা যা রোজগার করতেন তা দিয়ে কোন রকমে টেনেটুনে সংসার চলত। একবার সেই তরুণের একটি ভাইয়ের হল সাংঘাতিক অসুখ। অভাব সত্বেও বাবা ডেকে আনলেন শহরের এক নাম করা ডাক্তারকে। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন রোগীর স্প্রু হয়েছে, ওকে বাঁচান যাবে না।

ডাক্তারের কথাই ঠিক হল। কয়েক মাস রোগ ভোগের পর ভাইটি মারা গেল অকালে। বড্ড আঘাত পেলেন তরুণটি। কয়েকদিন ধরে কেবলই কাঁদলেন। তারপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হোক ডাক্তার তাকে হতেই হবে। আর ঐ স্প্রু রোগটাকে নির্মূল করতে হবে পৃথিবী থেকে।

তখন কলেজে পড়তেন তরুণ। একদিন বাবাকে বললেন: বাবা, আমি ডাক্তারী পড়বো।

ছেলের আবেদন শুনে মুষড়ে পড়লেন বাবা। শুকনো গলায় বললেন: ডাক্তার পড়ার অনেক খরচ বাবা। সামান্য মাহিনের চাকরী, আমি কেমন করে সামলাব? ম্লান মুখে বললেন তরুনটি: সে আমি জানি বাবা। ভাবছি, আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ধার করেই পড়াশোনা চালাব। তারপর একদিন রোজগার করে ওদের টাকা শোধ করব।

ছেলের পরিকল্পনা পিতাকে আদৌ নিশ্চিন্ত করতে পারল না। বিরস মুখে বললেন তুমি বড় হয়েছ, যা ভাল বোঝ তাই কর বাবা।

পিতার কথায় উৎসাহিত হয়ে তরুণটি ধর্ণা দিলেন আত্মীয়দের বাড়ী-বাড়ী। তাদের দেওয়া সামান্য প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে ভর্তি হলেন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে।

তরুণটির অমানুষিক পরিশ্রম ব্যর্থ হলনা। ভালভাবেই পাশ করলেন একদিন এবং ঐ কলেজের ডেমনস্ট্রেটরের পদ লাভ করলেন।

এবার গবেষণা আরম্ভ হল। বলা বাহুল্য, গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল সেই স্প্রু রোগ! কিন্তু দীর্ঘকাল গবেষণা করে বুঝতে পারলেন, মাদ্রাজে সারা জীবন ধরে গবেষণা করলেও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। যেতে হবে সুদূর সাগর পারে।

হলও তাই। এক অধ্যাপকের উপদেশে সামান্য একটা বৃত্তিকে অবলম্বন করে পাড়ি দিলেন লণ্ডনে। আশার আলো লণ্ডনেও দেখতে পেলেন না। শেষে এক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকের পরামর্শে তিনি যাত্রা করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সঙ্গে ছিল মাত্র পঁচিশ ডলার।

নতুন নির্বান্ধব জায়গা। ভয়ানক অসুবিধায় পড়লেন তরুণ। চাকরী এবং অর্থ কোনটিরই সংস্থান ছিল না তার। উপায় না পেয়ে নিজের খরচ চালাতে একটা কারখানার শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করতে হল তাকে।

কেটে গেল অনেকদিন। অবশেষে ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হলেন। তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মার্কিন সরকার একদিন তাঁকে গবেষণামূলক বৃত্তি প্রদান করলেন। কিন্তু এই সামান্য বৃত্তিতে কিছুই হলনা তাঁর। স্প্রু রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে বহু অর্থ এবং বহু সহযোগীর প্রয়োজন। বাধ্য হয়ে তরুণটিকে গ্রহণ করতে হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। এবার সরকার করলেন ঢালাও সাহায্য। এবার তরুণটি পেলেন প্রচুর অর্থ, বহু সহযোগী এবং গবেষণাগার।

দেখতে দেখতে তাঁর গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এল বহু মূল্যবান ওষুধ। স্প্রু রোগের ওযুধ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আর আবিষ্কার করেছিলেন পেলেগ্রা রোগের প্রতিষেধক।

এই তরুণটি ভারত মাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান ডাঃ ইয়েল্লো প্রাগদা

সুব্বা রাও। তাঁর মত এত বেশী ওষুধের আবিষ্কর্তা পৃথিবীতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। 'সুবা মাইসিন নামে ওষুধটি আজও তাঁর নাম বহন করে চলেছে। ওরি মাইসিন নামে অতি পরিচিত অ্যান্টিবায়োটিকটিয় তাঁর আবিষ্কার। আমেরিকায় তিনি "অত্যাশ্চর্য ডাক্তার" নামে পরিচিত ছিলেন।

ডাঃ সুব্বা রাও আজ আর ইহধামে নেই। পঞ্চা:শর কিছু বেশী বয়সে এক রকম অকালে তিনি পরলোক গমন করেছেন। তাঁর মহাপ্রয়ানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পুরণ হবার নয়।

———

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ প্লাস্টিক ও সোলোফেন ॥

আজ থেকে একশ বছর আগে পর্যন্তও খেলনা এবং সৌখিন জিনিসপত্র প্রস্তুতিতে হাতির দাঁতের চাহিদা ছিল যথেষ্ট। ভারি সুন্দর, শক্ত, মজবুত ঐ হাতির দাঁত। এখনও তার কৌলিন্য হ্রাস পায়নি এতটুকু। দামও অনেক। অর্থশালী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে হাতির দাঁতের জিনিস ব্যবহার এক রকম অসম্ভব। কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বেশীর-ভাগ লোকই ধনী এবং সৌখিন। এককালে তাঁদের হাতির দাঁতের জিনিসের প্রতি একটা বড় রকমের আকর্ষণ ছিল। বিলাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের চাহিদা মেটাতে হিমসিম খেয়ে যেত। এত হাতির দাঁত কোত্থেকে যোগাড় করবে তারা ?

ইংরেজী ১৮৬৫ সাল। নিউ ইয়র্কের এক বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মহা অসুবিধায় পড়ল। ঘোষণা করল, যদি কোন ব্যক্তি হাতির দাঁতের বিকল্প কোন কৃত্রিম জিনিস প্রস্তুত করতে পারে তাহলে তাকে নগদ দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

দশ হা-জা-র-ডলার ! অর্থের পরিমাণটা বেশ লোভনীয়। ঘোষণার কথা শুনে বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন। কত রকমের কত পরীক্ষা চলতে লাগল। কত বিজ্ঞানী আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে গবেষণাগারে পড়ে রইলেন। কিন্তু আশার আলো কেউ দেখতে পেলেন না। শেষে খবরটা সাগর পেরিয়ে আমেরিকায় এসে পৌঁছোল। সেখানে ছিলেন গবেগণা পাগল দু-ভাই—ওয়েসলি হায়াট এবং ইসাইয়া হায়াট। ভাবলেন, একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন। যদি এতগুলো অর্থ হাতে এসে যায়। যেই ভাবা সেই কাজ। শুভক্ষণে দু'জনেই আরম্ভ করলেন গবেষণা। কি খেয়াল হল তাঁদের। প্রথমেই আরম্ভ করলেন নাইট্রো সেলুলোজকে

নিয়ে পরীক্ষা। কারণ একটা অবশ্য ছিল। হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় সদ্য আবিষ্কৃত নাইট্রো সেলুলোজের প্রতি একটা বড় রকমের আকর্ষণ বোধ করতেন।

নাইট্রো সেলুলোজ আবিষ্কারের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তার কিছু পূর্বে সেলুলোজকে নিয়ে গবেষণার ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেলুলোজ হচ্ছে—উদ্ভিদের দেহকোষের একটা বিশেষ উপাদান। তুলো, পাট প্রভৃতির আঁশে সেলুলোজ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

সে সময় বার্মিংহামে বাস করতেন এক রসায়ন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর আলেকজাণ্ডার পার্কস। খেয়ালী তিনিও বড় একটা কম ছিলেন না। একদিন কী মনে হল তাঁর! সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডকে মিশিয়ে ফেললেন। আর যায় কোথায়! আপন খেয়ালে পার্কস সেদিন জন্মদান করলেন একটি বিস্ফোরক পদার্থের। নামকরণ তিনিই করলেন। নাইট্রিক অ্যাসিড ও সেলুলোজের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হল বলে নাম হল নাইট্রো সেলুলোজ।

পার্কস বিস্ময়ের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করলেন, সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড বেশী পমিমাণ মেশালে উৎপন্ন হয় দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থ কিন্তু অ্যাসিডের পরিমাণ কম হলে উৎপন্ন পদার্থটি দাহ্যও নয় বিস্ফোরকও নয়। উভয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থগুলোকে যদিও নাইট্রো সেলুলোজ বলা হতে লাগল তবুও বিস্ফোরক নাইট্রো সেলুলোজের নাম দিলেন তিনি "গান কটন"।

পার্কসের এই আবিষ্কারের পর দেশে দেশে যথেষ্ট সাড়া পড়ে গেল এবং বহু রসায়ন বিজ্ঞানী পার্কসের এই আবিষ্কারকে নিয়ে মেতে উঠলেন।

হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় ও ছিলেন এই দলের। তাঁদের খাস কাজ ছিল সেলুলোজের সঙ্গে এটা ওটা মিশিয়ে দেখা। নাইট্রো সেলুলোজকে নিয়ে গবেষণা করতেন তাঁরা। পুরস্কারের কথা শোনার পর ভাবলেন তাঁরা, সেলুলোজ থেকে যদি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী হতে পারে তাহলে শক্ত ও

মজবুত জিনিস কেন তৈরি করা যাবে না ?

একদিন কী মনে তাঁদের! পার্কস এর নাইট্রো সেলুলোজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন একটুখানি কর্পূর। ফলটা কী দাঁড়ায় দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই চোখে পড়ল, নাইট্রো সেলুলোজ রূপান্তরিত হয়ে গেল অর্ধ তরল এক ধরনের বিশেষ পদার্থে। একেবারে স্বচ্ছ সেই পদার্থ। মালিন্য নেই কোথাও এতটুকু। এবার ওকে কঠিনে রূপ দেওয়ার পালা। কিন্তু খুব বেশী বেগ পেতে হল না। অল্পয়াসেই তরলটাকে কঠিন করে নেওয়া গেল।

বেজায় খুশী হলেন হায়াট ভ্রাতৃদ্বয়। নিজে হাতে তৈরি করলেন একটা ছাঁচ। ঢালাই করায় পর দেখলেন ভারি সুন্দর হয়েছে জিনিষটা। হাতির দাঁতের মত না হলেও বেশ শক্ত এবং মজবুত। ছাঁচে ঢালাই করলে সব রকমের জিনিসই তৈরি হতে পারে বুঝতে পেরে নিশ্চিত হলেন তাঁরা।

নাইট্রো সেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মেশানোর ফলে যে অর্ধ তরলটি পাওয়া গেল তাতে রঙ মিশিয়েও আনন্দিত হলেন। লাল নীল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি যে কোন রঙের জিনিস তৈরি করতে কোন বাধা নেই। হায়াট ভ্রাতৃদ্বয়ের এই আবিষ্কার লুফে নিল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি। পুরস্কার তো লাভ করলেনই অধিকন্তু তাঁদেরই প্রচেষ্টায় শিল্পজগতে এল দারুণ এক সাড়া। মূল পদার্থ সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন হল বলে এই বিশেষ পদার্থটির নাম হল সেলুলয়েড। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নবাবিষ্কৃত সেলুলয়েডকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করতে লাগল প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিসপত্র, কত সৌখিন জিনিস, কত খেলনা, আরও কত কী? দামে সস্তা এবং দেখতে সুন্দর সেলুলয়েড দু'দিনেই জনচিত্ত জয় করে নিল।

এমন চমৎকার যে সেলুলয়েড তারও একটা মস্ত বড় ত্রুটি থেকে গেল। সে ত্রুটিটা হল কোন প্রকারে আগুনের সংস্পর্শে এলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। তাই যাঁরা সেলুলয়েড ব্যবহার করতেন তাঁদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হত।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। সেলুলয়েডের এই ত্রুটিটুকু দূর করতে হলেন বদ্ধপরিকর। কিন্তু হায়। কতদিন, কতমাস, শেষ কত বছর গড়িয়ে গেল তবুও কোন বিজ্ঞান, আবিষ্কার করতে পারলেন না অদাহ্য সেলুলয়েড।

বাধ্য হয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐ দাহ্য সেলুলয়েডকে নিয়েই কাজ করতে হল? ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় যে সেলুলয়েড তৈরি করেছিলেন সেই সেলুলয়েডের যুগই চলল দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। তারপর ইউরোপের মাথার উপর জ্বলে উঠল প্রথম বিশ্ব মহাসমরের আগুন। প্রথমে ধিকি ধিকি তার পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সারা পৃথিবীকে গ্র্যাস করে নিল। চারদিকে গুলি গোলা, বারুদ-বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির ধূম পড়ে গেল। নিত্য নতুন সমরাস্ত্র এবং বিস্ফোরক প্রস্তুতির জন্য রাষ্ট্রগুলোও নিয়োগ করল হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই পার্কসের তৈরি নাইট্রো সেলুলোজকে নিয়ে মেতে রইলেন। শেষে অবলীলাক্রমে এক বিজ্ঞানী একদিন তৈরি করে ফেললেন সেলুলোজ অ্যাসিটেট নামে সেলুলয়েডের সমগোত্রীয় এক ধরণের জিনিস বা আগুনের স্পর্শে জ্বলে উঠল না। মানুষের বহুদিনের আশা পূর্ণ হল। বস্তুটির নাম রাখা হল সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিক।

নাম থেকেই বোঝা যায় সেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিক তৈরি হয়। অর্থাৎ সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে হয় নইট্রো সেলুলোজ আর অ্যাসেটিক অ্যাসিড মেশালে হয় সেলুলোজ অ্যাসিটেট। সেলুলোজ অ্যাসিটেকে কঠিনে রূপান্তরিত করলে যে বস্তুটি পাওয়া যায় তার নাম সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাষ্টিক বা সংক্ষেপে শুধু প্লাষ্টিক। আজকের দিনে আমরা যে সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্র ব্যবহার করছি—যেমন চিরুনী, বোতাম ছাতার বাঁট, ফিতা, প্যাকেট, খেলনা, ফাউণ্টেন পেন প্রভৃতি প্রায় সব গুলিই ঐ জাতীয় প্লাষ্টিক। এরা আগুনের সংস্পর্শে এলে জ্বলে উঠে না। তবে যেখানে আগুন লাগে সেইখানটা গলে যায়।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাষ্টিক ও সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়। ধীরে ধীরে ধরা পড়ল ওরা বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে নেয় এবং কিছুদিন পরে অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। আবার চলল গবেষণা। সর্বশেষে সেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং প্রোপিওনিক অ্যাসিড নামে দু'টি অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরী করা হল সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্রোপিওনেট প্লাষ্টিক। এবার সত্য সত্যই ত্রুটি মুক্ত হল প্লাষ্টিক। এই ত্রুটি মুক্ত প্লাষ্টিককে কাজে লাগিয়ে তৈরী হচ্ছে বহু মূল্যবান জিনিস। তাদের মধ্যে সুন্দর ও সৌখীন দ্রব্য, রেডিও ক্যাবিনেট, টেলিফোন যন্ত্র প্রভৃতি প্রধান।

এই প্লাষ্টিক আগুনের স্পর্শে এলে জ্বলে না। অধিকন্তু এর কোন খারাপ গন্ধও নেই। যান্ত্রিক উপায়ে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত করে খুব সুন্দর রেয়ন প্রস্তুত করা হচ্ছে। সত্য কথা বলতে কী, আজকাল রঙ বেরঙের প্লাষ্টিক সূতায় বাজার এক রকম ছেয়ে গেছে!

আরও এক ধরণের প্লাষ্টিক আছে। নাম তার সেলোফেন প্লাষ্টিক। আমরা সেলোফেন প্লাষ্টিক না বলে কেবলমাত্র সেলোফেন কথাটাই ব্যবহার করে থাকি এবং এক বিশেষ ধরণের পাতলা ও স্বচ্ছ কাগজকেই বুঝে থাকি। মজবুত এবং নমনীয়, হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলা যায় না, দেখতেও ভারি সুন্দর। দোকানের যে কোন চক্‌চকে ও স্বচ্ছ প্যাকেট ঐ সেলোফোন কাগজ দিয়েই তৈরী। তাছাড়া অন্যান্য কাজেও সেলোফেনকে ব্যবহার করা হয়।

সেলোফেনও হচ্ছে সেলুলোজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তুলোর আঁশকে প্রথমে কস্টীক সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে ক্ষারীয় সেলুলোজ উৎপাদন করা হয়। তারপর তার সঙ্গে মেশানো হয় কার্বন-ডাই সালফাইড। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সেলুলোজ জ্যানথেট নামে একটি যৌগিক পদার্থ। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে সেলুলোজ জ্যানথেট পৃথক করে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে চালনা করে অতি দ্রুত অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত একটি পাত্রের মধ্যে ঢালা হয়। সর্বশেষে পদার্থটিকে সালফার মুক্ত করে গ্লিসারলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে চালনা করা হয়। গ্লিসারল শোষণ করে নেওয়ার

পর বস্তুটি হয়ে উঠে সুন্দর ও নমনীয়। তারপর রঞ্জন, মোম প্রভৃতি মিশিয়ে চমৎকার সেলোফেনে রূপান্তরিত করা হয়।

॥ কৃত্রিম রেশম ॥

রেশমের কাপড় আমরা কে না ভালবাসি! কিন্তু এই রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকার কাছ থেকে। ঝামেলাও অনেকখানি। গুটিপোকার চাষ করতে হয়, তাদের খাওয়ার জন্য আবার চাষ করতে হয় তুঁত গাছ। রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য গ্রহণ করতে হয় বিশেষ সুব্যবস্থা। তার উপর আছে রেশম সংগ্রহ করা এবং রেশম থেকে সূতা তৈরী করা ঝামেলা।

সেলুলোজ থেকে কৃত্রিমতন্তু প্রণালী আবিষ্কারের পর রসায়ন বিজ্ঞানীরা রেশমের দিকে নজর দিলেন। তাঁদের যেন ধারণা হল এত প্রাকৃতিক জিনিসকে যখন রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা যাচ্ছে তখন রেশমকেই বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যাবে না কেন?

অনেক বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন এ বিষয়ে গবেষণা করতে এবং বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানও লোক নিয়োগ করল। শেষে বহুজনের বহু গবেষণার ফলকে কেন্দ্র করে একদিন প্রস্তুত হল নকল রেশম যা স্বাভাবিক রেশম অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। বরং দেখা গেল রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত, রেশম, গুটিপোকা থেকে সংগ্রহ করা রেশম অপেক্ষা বেশ কিছুটা উন্নত। শিল্পের পরিভাষায় নকল রেশমকে বলা হল রেয়ন।

রেয়ন বা নকল রেশম তৈরী করার মূল উপাদান সর্বক্ষেত্রে এক নয়। তবে সর্বক্ষেত্রে কাঁচা মাল হিসাবে সেলুলোজকেই ব্যবহার করা হয়। এই সেলুলোজ আবার পাওয়া যায় তুলো, পাট, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি থেকে। কাঠ সবচেয়ে সহজ লভ্য বলে এখানে কাঠ থেকে সেলুলোজ এবং সেলুলোজ থেকে রেয়ন প্রস্তুতির নীতি বর্ণনা করা হল।

প্রথম কাঁচা কাঠকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেওয়া হয়। সেই কাঠের টুকরোগুলোর গায়ে যাতে ছাল লেগে না থাকে সেজন্য তাদের কয়েলদিন ধরে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তার ফলে ছালগুলো পচে গিয়ে আপনা হতেই খসে পড়ে, নয়ত অতি, অল্পায়াসে পৃথক করা যায়।

ছাল ছাড়ান কাঠের টুকরোগুলোকে এবার আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। তারপর কাঠের মধ্যে রেজিন প্রভৃতি যে অপদ্রব্যগুলো থাকে সেগুলোকে পৃথক করার জন্য বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। পরিশেষে কাঠের টুকরোগুলো আরও গুঁড়া করে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে ভালভাবে ফুটান হয়। তখন দূর হয়ে যায় সমস্ত অপদ্রব্য আর কাঠের গুঁড়োগুলো হয়ে যায় এক রকম মণ্ডের মত।

ভাবছো, এবার বুঝি সেলুলোজ তৈরী হয়ে গেল!

না, এখনও সেলুলোজ তৈরী হয়নি। সেলুলোজ তৈরী করতে হলে ঐ কাঠের মণ্ডটাকে আবার ফুটাতে হয় এবং কতকগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সে প্রক্রিয়াগুলো অনাবশ্যক বোধে আলোচনা করা হল না।

উপরে বর্ণিত উপায়ে যে সেলুলোজটি পাওয়া গেল তা কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ সেলুলোজ পেতে হলে ঐ সেলুলোজকে প্রথমে গরম বাষ্পের সংস্পর্শে রেখে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর মেসিনের সাহায্যে মিহি গুঁড়ায় পরিণত করা হয়। সর্বশেষে সেই গুঁড়াকে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কস্টিক সোডার দ্রবণের সঙ্গে ক্রিয়া করালে পাওয়া যায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ।

আবার গুঁড়া করা হয় সেই বিশুদ্ধ সেলুলোজকে। এবং খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয় বেশ কয়েক ঘণ্টা। ধীরে ধীরে সেলুলোজের রঙটা হয়ে উঠে ধব্‌ধবে সাদা। এতক্ষণে সেলুলোজটা নকল রেশম তৈরীর উপযোগী হয়।

রেশম তৈরীর প্রথম ধাপে তৈরী করা হয় সেলুলোজ জ্যানথেট। এটি

থক্‌থকে সাদা জেলির মত পদার্থ। এবং প্রস্তুত করা হয় বিশুদ্ধ সেলুলোজের গুঁড়ার সঙ্গে কার্বণ-ডাই-সালফাইড মিশিয়ে। সেলুলোজ জ্যানথেট তৈরী হওয়ার পর তাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রবলভাবে আলোড়িত করা হয়। এবার উৎপন্ন হয় আর একটি জিনিস—নাম তার ভিসকোজ।

এই ভিসকোজেও থাকে অশুদ্ধি। বিশেষতঃ কিছু সালফার অবশ্যই মিশে যায়। অশুদ্ধিগুলিকে পরপর কয়েকটি প্রক্রিয়ায় দূর করা হয় এবং কয়েকদিন ধরে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়। ভিসকোজের মধ্যে কোন গ্যাস কিংবা বাতাস যাতে মিশে থাকতে না পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়।

প্রকৃত পক্ষে ভিসকোজ থেকেই তৈরি হয় নকল রেশম। প্রথমে ভিসকোজকে পুরে দেওয়া হয় একটা ধাতব নলের মধ্যে। নলটির তলায় থাকে কয়েকটা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র। ছিদ্র মুখটা আবার ডোরান থাকে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের মধ্যে। নলের উপরে চাপ দিলে ভিসকোজ ছিদ্রপথে চালিত হয়ে সরু সূতার আকার প্রাপ্ত হয়ে এবং তৎক্ষণাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে পড়ে।

সূতো প্রস্তুত হওয়ার পরেও পুনরায় বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। কারণটা অবশ্য অন্য কিছু নয়, অ্যাসিডের মধ্যে চালনা করতে, হয় বলে কিছু অ্যাসিড সূতার সঙ্গে লেগে থাকে। সেই অ্যাসিডকে দূর করার জন্য সূতাকে জল থেকে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া হয়! তারপর ঘূর্ণায়মান বাক্সের মধ্যে জড়িয়ে সূতার কুণ্ডলী প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু সূতাগুলো ভিজে অবস্থায় থাকে। সেই কারণে গরম চুল্লীর উপর রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সর্বশেষে ব্লিচিং মেসিনে পাঠিয়ে বিরঞ্জন করা হয়।

এত কাণ্ড করার পরও সূতোর মধ্যে সশুদ্ধি হিসাবে অল্প স্বল্প গন্ধক থেকে যায়। সূতাকে গন্ধক মুক্ত করার জন্য সোডিয়াম সালফাইডের দ্রবণ সূতার উপর স্প্রে করা হয়। স্প্রে করার ফলে গন্ধক দূরীভূত হয় বটে

কিন্তু আর একটি নতুন দোষ প্রকাশ পায়। সেটি হচ্ছে, সূতার ক্ষারীয় ধর্ম। তাকেও নষ্ট করা হয় তরল অ্যাসেটিক অ্যাসিড সূতার উপর ঝরিয়ে।

এতক্ষণে সর্বপ্রকার ত্রুটি মুক্ত হয় সূতা। পরিশেষে ভাল করে সাবান জলে ধুয়ে নিয়ে গরম চুল্লীতে শুকিয়ে নিয়ে কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মেসিনের সাহায্যে সূতাকে পাকিয়ে বস্ত্র বয়নের উপযোগী করা হয়।

॥ টেরিলিন ॥

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে জৈব রসায়নের ভূমিকা অনেকখানি। দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রতিভা নিয়োজিত হয়ে আসছে এই জৈব রসায়নের পেছনে। আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় অবিশ্বাস্য এমন বহু তথ্য। কেবল মাত্র কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন অক্সিজেন প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র মৌলিক পদার্থের সংযোগে মানুষ প্রস্তুত করেছে কত হাজার হাজার এমন কি কত লক্ষ লক্ষ জৈব পদার্থ। প্রকৃত সত্য কথা বলতে কি মানুষের প্রাচীন ধারণা একেবারে ওলট পালট করে দিয়েছে জৈব রসায়ন। এক কালের চিন্তাধারা অর্থাৎ "মানুষ কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতি জাত জিনিস তৈরী করতে পারে না" কতদিন আগে পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমানে এমন অবস্থা এসেছে যে, কোন বস্তুকেই প্রকৃতি জাত বলে চিহ্নিত করার কোন উপায় নাই। যে দু' একটা জিনিস মানুষ আজও তৈরী করতে সক্ষম হয়নি সেগুলো যে ভবিষ্যতে তৈরী করা যাবে না একথা জোর করে বলা যায় না। বরং মানুষের বদ্ধমূল ধারণা, কৃত্রিম উপায় একদিন না একদিন জীব কোষও তৈরী করা যাবে।

তূলা, রেশম, পাট প্রভৃতি নিঃসন্দেহে প্রকৃতি জাত পদার্থ। এক সময় মানুষের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতো এই সব জিনিস থেকে। কিন্তু

আজ দেখা যাচ্ছে, তুলা ও রেশমের স্থান দখল করছে কৃত্রিম তন্তু। আরও দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক তন্তু অপেক্ষা কৃত্রিম তন্তু অনেক বেশী টেকসই ও সুন্দর। তাই বোধ হয় রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন আজ বস্ত্র জগতে যুগান্তর এনেছে। এদের মধ্যে আবার টেরিলিনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে উত্তরোত্তর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশগুলিতে টেরিলিন তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে কিন্তু এর উৎপাদনের পরিমাণ আশানুরূপ নয়! তবে যেভাবে টেরিলিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে উৎপাদনের পরিমাণ যে বাড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই!

টেরিলিনকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় ইংলণ্ডের লোকেরাই বলে টেরিলিন। আমাদের দেশ ইংলণ্ডের দেওয়া নামকেই বহাল রেখেছে। আমেরিকায় টেরিলিনকে বলে টেরন, কখনও বলে ডেক্রন। ফ্রান্সের লোকেরা বলে তারগাল, জার্মানীতে ত্রেভিরা, রাশিয়ায় ল্যাৎসন এবং জাপানে বলে তোরেয়েতোরান। অন্যান্য দেশেও আছে কত হরেক রকমের নাম।

টেরিলিন প্রস্তুত করা হয় সম্পূর্ণ অজৈব উপাদান থেকে। রেয়ন তৈরীর জন্য উদ্ভিদের দেহোপাদান সেলুলোজই প্রয়োজন হয়। তাছাড়া অন্য উপায়ও আছে। কিন্তু টেরিলিনের জন্য প্রয়োজন হয় একমাত্র পলিএস্টার নামে বহু যৌগিক পদার্থ। 'পলি' কথাটার অর্থ হচ্ছে 'বহু'। এস্টারকে রাসায়নিক ভাবে পুনঃ পুনঃ সংযোজন করে গঠন করা হয় পলিএস্টার।

অবশ্য এস্টার অনেক ধরনের হয়ে থাকে। টেরিলিন তৈরীর জন্যে যে এস্টারটির দরকার হয় সেটিকে বলে ইথিলিন টেরপথ্যালেট এস্টার।

এস্টার সম্বন্ধেও একটু বলার আছে। এস্টার সাধানতঃ জৈব কিংবা অজৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। যেমন ধরা যেতে পারে, ইথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ইথাইল অ্যাসিটেট নামে একটি এস্টার। জৈব অ্যাসিডের সংখ্যাও যেমন প্রচুর, অ্যালকোহলের সংখ্যাও তেমনই। তাই বিভিন্ন

অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় হরেক রকমের এস্টার তৈরী করা যায়।

সব এস্টার তাই যৌগিক পদার্থ এবং এদের নিজস্ব একটা গন্ধ দেখে চেনা যায়। আরও একটা মজার কথা, সম্পুর্ণভাবে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও এস্টারদের নিজস্ব একটা সুগন্ধ আছে এবং সে সুগন্ধটা অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা বা পাকা ফলের গন্ধ। কোন এস্টারের গন্ধ পাকা কলার মত, কোনটির পাকা আনারসের মত, কোনটি কাঁচা আমের মত, কোনটিতে বা চকোলেটের গন্ধ পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে যে সব চকোলেট এবং গন্ধ দ্রব্যের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই তাদের অধিকাংশের মূলেই আছে এস্টার।

এবার আসা যাক পলিমারের কথায়। পলিমার হচ্ছে বহু যৌগিক পদার্থ। যখন কোন বিশেষ রাসায়নিক এককের পুনঃ পুনঃ সংযোগের ফলে একটা বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করা যায় তখনই বলা হয় পলিমার।

উদাহরণ স্বরূপ পলিথিনের কথা ধরা যেতে পারে। পলিথিন হচ্ছে, তুটি কারবন পরমাণু এবং চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুর একক (C_2H_4), পুনঃ পুনঃ সংযোগের ফলে উৎপন্ন বৃহত্তম আণবিক ওজনের এক অতিকায় কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত অণু। অবশ্য এই বিক্রিয়াটি ৩০ থেকে ৪০ বায়ুমণ্ডল চাপে উত্তপ্ত ক্রোমিক অক্সাইড নামক প্রভাবকের উপস্থিতিতে এবং ১২০° সেন্টিগ্রেড থেকে ১৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বহু সংখ্যক ইথিলীন অণু (C_2H_4) পরপর সংযুক্ত করে। উৎপন্ন পদর্থেটি শেষে কঠিনে পরিণত হয়। ইথিলিন বলে নাম তার পলি ইথিলিন বা পলিথিন। ফরমূলাটি তখন হয় (C_2H_4) n। এখানে n একটি অজানা বৃহত্তম সংখ্যা।

এইভাবে যদি কোন এস্টারের অণুকে একক করে বারবার সংযোজন করা হয় তাহলে পরিশেষে উৎপন্ন হবে এক অতিকতায় এস্টার অণু। তখন এই এস্টারকে বলা হবে পলিএস্টার। টেরিলিন প্রস্তুতির জন্য

যে এস্টারটির প্রয়োজন হয় তার নাম ইথিলিন টেরি-পথ্যালেট এস্টার। এস্টারটিকে প্রস্তুত করা হয় টেরোপথ্যালিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকলের বিক্রিয়ায়। ইথিলিন টেরিপথ্যালেট এস্টারের অণুকে অসংখ্য বার পুনরাবৃত্তি করলে উৎপন্ন হয় যে পলিএস্টারটি সেইটির নাম টেরিলিন। এই হল টেরিলিন প্রস্তুতির গোড়ার কথা।

ইথিলি টেরিপথ্যালেট এস্টার বা টেরিলিন তৈরী হওয়ার পর তাকে বিগলিত অবস্থায় রেয়নের মতই অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে সূতার রূপ দেওয়া হয়।

আজকাল বাজারে রঙ বেরঙের টেরিলিনের কাপড় দেখা যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় যখন তন্তু প্রস্তুত করা হয় তখন তার কোন রঙ থাকে না। টেরিলিনের সূতাকে তাই রঙ করে নিতে হয়। কিন্তু ওকে রঙ করার অসুবিধা অনেক। তার প্রধান কারণ টেরিলিনের অণুগুলো খুব ঠাসাঠাসিভাবে অবস্থান করে বলে ওতে কোন রঙ ধরে না। তুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা। তুলোর অণুর মধ্যে বেশ দূরত্ব থাকে। জলে ভিজলে সূতা ফুলে উঠে এবং রঙে অণুগুলোকে তার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য জায়গা করে দেয়।

বিজ্ঞানীরা এই সমস্যারও সমাধান করেছেন। রঙ করার যে কয়েকটা উপায় আছে তাদের একটি হচ্ছে, টেরিলিনের তন্তুর উপর কোন রঙের প্রলেপ লাগিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। তখন রঙের অণুগুলো টেরিলিনের তন্তুর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সহজে বেরুতে পারে না। সেই জন্যে তুলোর তন্তু অপেক্ষা টেরিলিন তন্তুর রঙ পাকা।

টেরিলিন তন্তুকে প্যাকিং করে এবার পাঠান হয় মেসিনে। সেখানে যন্ত্রের দ্বারা পাকিয়ে সূতা তৈরী করা হয়। তারপর সেই সূতা দিয়ে করা হয় কাপড়।

তুলাজাত সূতার কাপড় অপেক্ষা টেরিলিনের কাপড়ের গুণ অনেক। টেরিলিনের প্রধান গুণ হচ্ছে, ও সহজে ভাঁজ পড়ে না। অল্প উত্তাপে ইস্ত্রি দিয়ে ভাঁজ ধরিয়ে দিলে ভাঁজ চিরদিনের জন্যে পাকা হয়ে যায়।

ফুটন্ত জলে টেরিলিনের ক্ষতি হয় না বা আগুন লাগলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে না। কেবল যে জায়গায় আগুন ধরে যায় সেই জায়গাটা গলে গিয়ে জমাট বেঁধে যায়। তাছাড়া টেরিলিন জল শোষণ করতে পারে না বলে শুকায়ও তাড়াতাড়ি। পোকামাকড় এবং ছত্রাক সূতোর কাপড়ের মত তত বেশী ক্ষতিও করতে পারে না। আজকাল সূতা, রেশম এবং উলের সঙ্গে টেরিলিন মিশিয়ে নানা জাতীয় কাপড় তৈরী করা হচ্ছে সে সব কাপড়ের চাহিদাও কম নয়। এই জাতীয় মিশ্রিত সূতার কাপড়ের মধ্যে "টেরিন কটন' বা "টেরিকট' আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। ওতে শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ টেরিলিন এবং বাদ বাকী থাকে সূতা। এইভালে টেরিলিন ও উলের মিশ্রণকে বলা হয় টেরিউল।

টেরিলিনের দোষও আছে। সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে, এর দ্বারা অতি সহজে স্থির তড়িৎ হয় বলে ধূলা বালি আকৃষ্ট হয় এবং তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে উঠে।

কাপড় ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজে টেরিলিন ব্যবহার করা হচ্ছে। দড়ি, মাছ ধরার জাল, নৌকার পাল ইত্যাদির ক্ষেত্রের প্রায়ই টেরিলিনের ডাক পড়েছে।

কৃত্রিম তন্তু টেরিলিনের প্রয়োজনীয়তা এখন উপলব্ধি করেছে প্রতিটি দেশ। টেরিলিন অত্যন্ত টেকসই। একটা দেশের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে কত লক্ষ লক্ষ একর জমিতে তূলা চাষের প্রয়োজন। শুধু চাষ করলে হয় না, তার জন্য খরচ করতে হয় সার এবং কীটনাশক ওষুধ। আবার আছে জলসেচের ব্যবস্থা। কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন করলে তুলো চাষের জমিতে খাদ্য শস্য চাষ করা যেতে পারে। এই কারণে কৃত্রিম তন্তুর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

—ঃ ঃ—

।। কাগজ ।।

মানুষ প্রথম যেদিন মনের ভাব প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেছিল সেই দিনই অনুভব করেছিল লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তা। এমনকি যেদিন বর্ণমালাও আবিষ্কার করেনি মানুষ, সেদিনও নিজের মনের ভাবকে রূপ দিত ছবির মাধ্যমে। সে ছবি আজকেরও মত রঙ তুলি দিয়ে আঁকা হত না। কিংবা ছবি আঁকার কোন কাগজ ছিল না। তারা মৃত্তিকা দিয়ে ছবি আঁকত পাহাড়ের গুহায়। আজও কোন কোন গুহাগাত্রে দেখতে পাওয়া যায় আদি প্রস্তর যুগের মানুষের অঙ্কিত ছবি।

বুদ্ধিমান মানুষ একদিন বর্ণমালাও আবিষ্কার করল। প্রচলন হল লেখাপড়ার। সেদিন আরও একটা প্রয়োজন অনুভব করল। সে প্রয়োজনটা হল কেমন করে ধর রাখবে গুহার উপদেশ এবং মনীষীদের বাণী! উপায় না পেয়ে তারা নরম মাটির ফলকে লিখে পুড়িয়ে ফেলত কখনও লিখে রাখত প্রস্তর ফলকে কিংবা তাম্র ফলকে। প্রাচীন ভারতে লেখার প্রচলন ছিল না। শিষ্যরা গুরু-গৃহে বাস করত এবং গুরুর উপদেশাবলী কেবলমাত্র শ্রুতির মাধ্যমে ধরে রাখত।

জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরফলক তাম্রফলক কিংবা পোড়া মাটির ফলক কোন কিছুই চাহিদা মেটাতে পারল না। যাঁরা শ্রুতির মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা করতেন তাঁরাও ব্যর্থ হলেন। তার কারণ, বিভিন্ন গুরুর অমূল্য উপদেশাবলী একক কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব হল না।

মানুষ এবার শরণাপন্ন হল উদ্ভিদের কাছে। ভারত খুঁজে পেতে আবিষ্কার করল ভোজ গাছের ছাল ও পাতা এবং তাল গাছের পাতা। অন্যান্য দেশ ব্যবহার করল পশুচর্মকে। মিশর নামে প্রাচীন এক সুসভ্য দেশে ব্যবহার হতে লাগল প্যাপিরাস নামে এক জাতীয় গাছের

ছাল। পরে এই গাছের শাঁস থেকে তৈরী হতে লাগল কাগজের মত এক ধরনের জিনিস। প্যাপিরাস থেকে পেপার বা কাগজ কথাটির উৎপত্তি।

মানুষের ক্রমবর্ধমান সভ্যতার কাছে উদ্ভিদের ছাল, পাতা শাঁস পশুচর্ম, কোন কিছুই চাহিদা মেটাতে সক্ষম হল না। মানুষ এবার সচেষ্ট হল কৃত্রিম ভাবে এমন কিছু একটা তৈরী করতে যাতে লিখে রাখলে লেখা হবে দীর্ঘস্থায়ী।

অনেকে মনে করেন চীন দেশেই প্রথম কাগজ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু কে যে প্রথম প্রস্তুত করেছিলেন সে কথা কেউ বলতে পারেন না। সমসাময়িক কালে ভারতেও ছেঁড়া কাপড় তুলা গাছের ছাল ইত্যাদি থেকে এক ধরনের কাগজ প্রস্তুত হত। নাম ছিল তুলট কাগজ। কিন্তু চীন কিংবা ভারতবর্ষ কোন দেশের কাগজই বর্তমানের মত ছিল না। প্রকৃত কাগজ বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্ম হয়েছে মাত্র শ দুই বছর আগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপের যান্ত্রিক যুগে।

এই তো গেল কাগজের পূর্ব ইতিহাস। এবার যান্ত্রিক উপায়ে কেমন করে কাগজ প্রস্তুত হয় সেই কথাই বলা হচ্ছে।

প্রথমে মনে রাখতে হবে কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে কাঁচা মাল হিসাবে কাঠ এবং বাঁশেরই প্রয়োজন হয়। তুলা, ঘাস, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ এদেরও অনেক সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে কাঠের চাহিদাই সবচেয়ে বেশী। প্রথমে কাঠকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেওয়ার পর গ্রাইণ্ডিং মেসিনে পুরে দেওয়া হয়। সেখানে কাঠ একেবারে চুর্ণ হয়ে যায়। চুর্ণ করার সময় যথেষ্ট উত্তাপ প্রদান করতে হয়। সেই উত্তাপে কাঠ জ্বলে উঠতে পারে বলে তার উপর জল ঢালা হয়। পরিশেষে তৈরী হয় মণ্ড। এই মণ্ড তৈরীর ব্যাপারে জলের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। জলের পরিমাণ বেশী হলে মণ্ড পাতলা হয়ে যাবে এবং কাগজ তৈরীর অযোগ্য হয়ে পড়বে।

মণ্ডকে শিল্পের ভাষায় বলা হয় পাল্‌প। পাল্‌প আবার দুরকমের

হয়ে থাকে। যে পাল্‌প বা মণ্ড অশুদ্ধিগুলো থেকে যায় তাকে বলে মেকানিক্যাল পাল্‌প আর যার ভেতর থেকে অশুদ্ধিগুলো দূর করে শুদ্ধ করে নেওয়া হয় সে পাল্‌পকে বলে কেমিক্যাল পাল্‌প।

প্রথমে মেকানিক্যাল পাল্‌প্ থেকে কাগজ প্রস্তুতির রীতি বর্ণনা করা হল। পূর্বোক্ত উপায়ে যে মণ্ডটি প্রস্তুত করা হয়, তার ভেতর ছোট ছোট কাঠের টুকরো যদি থাকে তাহলে সেগুলোকে আলাদা করে নিয়ে ঘূর্ণায়মান ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। তারপর কিছুটা পরিশোধনেরও ব্যবস্থা থাকে। এবার প্রয়োজন মত জল মিশিয়ে মণ্ডটিকে তুলতুলে কাদার মত করে নেওয়া হয়। সর্বশেষে মণ্ডকে শিল্পের ভাষায় লোডিং করা হয়। লোডিং করার অর্থ কতকগুলো রাসায়নিক জিনিস মেশান। রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে কেওলিন, জিপসাম, টাইটানিক অক্সাইডই প্রধান। এই সব জিনিস মেশানোর ফলে কাগজ মসৃন ও অস্বচ্ছ হয়। লোডিং করার পরও কিছু প্রয়োনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। কারণ এই মণ্ড থেকে সরাসরি কাগজ তৈরী করলে লেখা যাবে না। কলম ঠেকালে কাগজে কালি চুঁইয়ে যাবে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য রজন ফটকিরি প্রভৃতি মেশাতে হয়। এবার মণ্ডের আঁশগুলো সুসংবদ্ধ হয়ে উঠে এবং লেখার পক্ষে উপযুক্ত হয়। শিল্পের ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয় পেপার সাইজিং। মেকানিক্যাল পাল্‌প থেকে সাধারণতঃ নিউজপ্রিন্ট তৈরী করা হয়।

কেমিক্যাল পাল্‌পের বেলায় অশুদ্ধিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা হয়। এই পাল্‌প্ তৈরী করার সময় জলের পরিবর্তে নানা রকম ক্ষারীয় ও অ্যাসিডিক পদার্থ যোগ করে ফোটাতে হয়। যে সমস্ত ক্ষারীয় পদার্থ যোগ করা হয় তাদের নাম অনুযায়ী কেমিক্যাল পাল্‌পের নাম রাখা হয়। যেমন কাঠের গুঁড়াকে বিশুদ্ধ করে কস্টিক সোডার দ্রবণ সহযোগে উত্তপ্ত করে তৈরী করলে যে মণ্ড পাওয়া যায় তাকে বলে সোডাউড। সোডা থেকে তৈরী কাগজই সব থেকে ভাল। সব রকম লেখার কাজে, বইতে, ম্যাগাজিনে যে সব কাগজ ব্যবহার করা হয় সবগুলিই সোডাউডের

কাগজ। দ্বিতীয় ধরণের কেমিক্যাল পাল্পের নাম সালফাইট উড্। সালফাইট উড্ তৈরী করা হয় কাঠের গুঁড়োকে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম বাইসালফাইট দিয়ে ফুটিয়ে। এই পাল্প থেকে প্রাপ্ত কাগজ তত উৎকৃষ্ট না হলেও নিউজপ্রিন্টের চেয়ে ভাল। তৃতীয় আর এক ধরণের কেমিক্যাল পাল্প্ তৈরী হয়ে থাকে। তার নাম সালফেট উড্। সোডিয়াম সালফেটের সঙ্গে মিশিয়ে কাঠের গুঁড়োকে ফুটিয়ে এই জাতীয় মণ্ড প্রস্তুত করা হয়। সাধারণতঃ ক্রাফট পেপার তৈরী হয় এই মণ্ড থেকে।

মেকানিক্যাল পাল্প্ অথবা কেমিক্যাল পাল্প্ যে ধরণের পাল্প্ই হোক না কেন তাদের থেকে কাগজ তৈরী করতে হলে পাঠাতে হয় যন্ত্রে। সেখানে ভারি রোলার দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে কাগজের শীট তৈরী করে নেওয়া হয় এবং বাষ্পের দ্বারা শুষ্ক করা হয়।

শীটগুলো খুব বড় আকারের হয়ে থাকে, বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য নানা আকারে কেটে নেওয়া হয়। তাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন। কোনটির নাম ফুলস্ক্যাপ, কোনটি ডিমাই, কোনটি ক্রাউন ইত্যাদি। কাগজকে মোটা কিংবা পাতলা প্রয়োজনানুযায়ী করা হয়ে থাকে।

রঙিন কাগজ করতে হলে কাঠের মণ্ড যখন তৈরী করা হয় তখন তাতে রঙ মিশিয়ে দেওয়া হয়। রঙিন কাগজ খুব পাতলা। লেখা কিংবা ছাপার কাজে বিশেষ ব্যবহার করা হয় না। সাজ সজ্জায় এবং ফুল, খেলনা প্রভৃতি তৈরীর কাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

আরও এক ধরণের কাগজ আছে তার নাম পার্চমেন্ট কাগজ! এই কাগজ খুবই মূল্যবান। সাধারণতঃ ছাগল কিংবা মেষের চামড়া থেকেই পার্চমেন্ট কাগজ তৈরী হয়। পৃথিবীর যাবতীয় মূল্যবান দলিল, নোট প্রভৃতি সবই এই কাগজে লেখা হয়ে থাকে।

কাগজ নিঃসন্দেহে একটি প্রয়োজনীয় শিল্প। সভ্য জগত কাগজ ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না। কিন্তু এই শিল্পে প্রাচ্য অপেক্ষা পশ্চাতেই অধিক উন্নত। ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ইংলণ্ড, ফিনল্যাণ্ড,

বেলজিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি দেশের এবং কানাডার কাগজ পৃথিবী বিখ্যাত। সোভিয়েত রাশিয়াওকাগজ শিল্পে কম উন্নত নয়। এই সব দেশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য আছে। বনভূমির কাঠ নরম হওয়ায় মণ্ড প্রস্তুতির পক্ষে খুবই উপযোগী। এরা কেবলমাত্র কাগজ রপ্তানী করে না, কাগজের মণ্ডও রপ্তানী করে।

ভারতের প্রস্তুত কাগজ সে সব দেশের তুলনায় খুব বেশী নিকৃষ্ট নয়। তবে কাঁচা মালের অভাবের জন্য ভারত তার বিরাট চাহিদা মেটাতে পারে না। তাকে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। পশ্চিম বাংলায় টিটাগড়, রানীগঞ্জ, শ্রীরামপুর প্রভৃতি জায়গায় কাগজের কল আছে। বেঙ্গল পেপার মিল্‌স্‌ এর তৈরী কাগজ খুবই উৎকৃষ্ট।

॥ ডিনামাইট ॥

এক ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর হেনরী ব্রেকনন্ট।

একদিন কী খেয়াল হল তাঁর। রসায়নাগারে এটা-ওটা মিশিয়ে মিশিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দৈবাৎ চিনির সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড ফেললেন। সেটি ছিল ইংরাজী ১৮৩২ সাল। ব্রেকনন্ট আপন অজান্তেই প্রথম জন্মদান করলেন একটি বিস্ফোরক পদার্থ।

অবশ্য এই আবিষ্কারের আগে মানুষ বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে বারুদকে বুঝত। কিন্তু বারুদে অগ্নি সংযোগ করলেই বিস্ফোরণ ঘটে। হেনরী ব্রেকনন্ট যে জিনিসটি তৈরী করলেন সেটি আপনা হতেই বিস্ফোরণ ঘটাল। অগ্নি সংযোগের প্রয়োজন হল না। তরল পদার্থ নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে বিস্ফোরক তৈরী হতে পারে, এই প্রথম জানল মানুষ।

কথটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অপরাপর বিজ্ঞানীরাও বিস্ফোরক পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন। হেনরী ব্রেকনন্টের আবিষ্কারের বছর ছ-সাত পরে 'ডুমাস' এবং 'পেলিউস' নামে দুজন বিজ্ঞানী আর একটি

বিস্ফোরক তৈরী করে ফেললেন। তাঁরা তৈরী করেছিলেন তূলা এবং কাগজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে। এবারের বিস্ফোরকটিও পূর্বের অনুরূপ ছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা চাইলেন আরও তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করতে। সে আশাও পূর্ণ হল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'অ্যাস্কানি' ও 'সোব্রেরো' নামে দুজন বিজ্ঞানী বিস্ফোরক পদার্থের খোঁজ করতে গিয়ে দৈবক্রমে একদিন মিশিয়ে ফেললেন চিনি ও গ্লিসারিনের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে ঘটল জোর বিস্ফোরণ। চমকে উঠলেন তাঁরা। এই বিস্ফোরণ পূর্বের সমূহ বিস্ফোরণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেল।

গ্লিসারিন এবং নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে জন্ম নিল বলে বিস্ফোরকটির নাম হল নাইট্রোগ্লিসারিন। প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই ভয়াবহ বিস্ফোরককে করায়ত্ত করল মানুষ। নাইট্রোগ্লিসারিন এমন জিনিস যে, সামান্য একটু আঘাতেই বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে উঠে।

দেশে দেশে সাড়া পড়ে গেল। শত শত বিজ্ঞানী কাজ আরম্ভ করলেন নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিয়ে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে একরকম যেন প্রতিযোগিতা চলতে লাগল, কে কতভাবে ধ্বংসাত্মক কাজ নিয়োগ করতে পারে নাইট্রোগ্লিসারিনকে। এই কাজ করতে গিয়ে কত বিজ্ঞানীকে হারাতে হল প্রাণ, কত জনে হয়ে গেল পঙ্গু। তবুও মানুষ পিছু হটল না সৃষ্টির নেশায় সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও পরোয়া করল না।

এবার এগিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নাড নোবেল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিরাপদে ব্যবহার করা। দীর্ঘদিন ধরে উপায় খুঁজছিলেন তিনি। শেষে তাঁর অতন্দ্র সাধনা বাস্তবে রূপায়িত হল। আবিষ্কৃত হ'ল ডিনামাইট।

পরীক্ষা করতে করতে একদিন টের পেলেন নোবেল "কাইজেলগার" নামে এক রকমের সচ্ছিদ্র মাটি নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষণ করতে পারে। নোবেল তখন কাইজেলগার দিয়ে নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষণ করালেন।

সামান্য আঘাতে নাইট্রোগ্লিসারিন বিস্ফোরণ হওয়ার ক্ষমতা হারাল। তারপর স্যার নোবেল নাইট্রোগ্লিসারিন যুক্ত কাইজেলগার দিয়ে তৈরী করলেন এক বিস্ফোরক। এর মধ্যে নাইট্রোগ্লিসারিনের ক্ষমতা পুরোপুরি অটুট থাকল অথচ ওকে নিরাপদে ব্যবহারও করা গেল। এইভাবে উৎপন্ন হল সে যুগের সবচেয়ে বিস্ফোরক পদার্থ ডিনামাইট। কাইজেলগার শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিন দ্বারা নির্মিত ডিনামাইটের নাম দিলেন নোবেল "গার ডিনামাইট"।

নোবেল কিন্তু গার ডিনামাইট প্রস্তুত করে ক্ষান্ত হলেন না। নাইট্রোগ্লিসারিনকে আরও নিরাপদে ব্যবহার করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, ভাল শোষক হলেই নাইট্রোগ্লিসারিনের নিরাপত্তা বেড়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভাল শোষক খুঁজতে।

তাঁর খোঁজাখুজি ব্যর্থ হল না। একদিন হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলেন সোরাকে। দেখলেন তিনি, কাইজেলগারের চেয়ে সোরা উত্তম শোষক। তার উপর সোরা উত্তম জারকও বটে। সোরাতে থাকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। বিস্ফোরণ ঘটলে তার সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত করে বিস্ফোরণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

নোবেল এবার তৈরি করতে লাগলেন নানা ধরণের ডিনামাইট। নাইট্রোগ্লিসারিনের পরিমাণ বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং নিম্নশক্তিসম্পন্ন উভয় প্রকার ডিনামাইট তৈরী হল মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য।

নোবেলের পরীক্ষা এইখানে থেমে গেল না। গবেষণার পর গবেষণা চলতে লাগল। তারপর একদিন প্রস্তুত করলেন অ্যামোনিয়া ডিনামাইট। এই ডিনামাইটের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এর আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশী এবং আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয় না। অপরাপর ডিনামাইট অপেক্ষা অ্যামোনিয়া হল অনেক নিরাপদ।

এত বিভিন্ন প্রকার ডিনামাইট প্রস্তুত করা সত্ত্বেও নোবেল তাঁর গবেষণা অব্যাহত রাখলেন না। পরীক্ষা করতে করতে একদিন আকস্মিক

ভাবে আবিষ্কার করলেন জিলাটিন ডিনামাইট। প্রকৃতপক্ষে এই ডিনামাইটই সবার সেরা।

জিলাটিন ডিনামাইট আবিষ্কারের কাহিনীটি নিম্নরূপ :—

একদিন আপন রসায়নগারে কাজ করছিলেন নোবেল। দৈবক্রমে কাচের টুকরো লেগে তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলটা একটু কেটে গেল। বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে বলে কাটা অংশটার উপর একটা আস্তরণ দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে দেওয়ার জন্য লাগিয়ে দিলেন কলয়ডিয়ন।

কলয়ডিয়ন তৈরী করা হয় গান কটন বা বিস্ফোরক তুলা থেকে। প্রথমে সেলুলোজকে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে মেশাতে হয়। বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সেলুলোজ টেট্রানাইট্রেট ও টেট্রাসালফেট নামে দুটি পদার্থ। একত্রে এই দুটির নাম গান কটন এই গান কটনকে ইথার ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে গলিয়ে নিলে প্রস্তুত হয় কলয়ডিয়ন।

নোবেল আঙ্গুলে কলডিয়ন লাগিয়ে পুনরায় কাজে মন দিলেন। যে পরীক্ষাধীন বস্তুটিকে নিয়ে কাজ করেছিলেন তারই সঙ্গে সংমিশ্রণ হল কলডিয়নের। পরীক্ষাধীন বস্তুটির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিনও ছিল। অল্প পরে বুঝতে পারলেন নোবেল, দৈবক্রমে যে জিনিসটি তিনি পেয়ে গেলেন তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা যে কোনও ডিনামাইটের চেয়ে বেশী। এই বিস্ফোরকটির নাম হল বিস্ফোরক জিলেটিন।

এবার তৈরী করলেন জিলেটিন ডিনামাইট। নিজেই বিস্মিত হলেন জিলেটিন ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ক্ষমতা দেখে। অপর দিকে দেখা গেল এই ডিনামাইটের সুবিধা অনেক বেশী। জলে ভিজে নষ্ট হয় না। মাটির ভেতরে গর্ত করে ঢুকিয়ে দিয়েও বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। বহন করাও বেশ নিরাপদ। এতদিনে নোবেলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক সেই মতই প্রস্তুত হল ডিনামাইট।

স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল নানা ধরণের ডিনামাইট তৈরী করে

প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থের একটা মোটা অংশ তিনি দান করে গেছেন পৃথিবীর বিশিষ্ট আবিষ্কারকদের পুরস্কার প্রদানের জন্য। দাতার নামানুসারে পুরস্কারটির নাম নোবেল পুরস্কার। পুরস্কারের অঙ্কটা বেশ মোটা। অর্থাৎ পৃথিবীতে নোবেল পুরস্কারের মত মোটা অঙ্কের পুরস্কার দ্বিতীয় নেই।

নোবেল তাঁর উইলে বলে গেছেন সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছাড়াও অপর দুটি বিষয়ে এই পুরস্কার প্রদান করতে হবে। একটি বিশ্বের সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য, অপরটি শান্তির জন্য।

নোবেল বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, ডিনামাইট আবিষ্কার করে তিনিই পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের সূচনা করে গেলেন। তাই শান্তির জন্য একটি পুরস্কার।

আজকাল অবশ্য ডিনামাইটের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণে ধ্বংসাত্মক জিরনস আবিষ্কৃত হয়েছে। সামান্য বিস্ফোরক নিয়ে আজ মানুষ মাথা ঘামাচ্ছে না। সে এখন পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান। এসব আবিষ্কারের জন্য নোবেল দায়ী নন। তাছাড়া আবিষ্কারকে তিনি। সমুদ্র মন্থনে অমৃতের সঙ্গে গরলও উঠেছিল। আবিষ্কারকদের কাছ থেকে আমরা কেমন করেই বা শুধু আশা করব কেবল মাত্র কল্যাণকর জিনিস।

প্রত্যেকটি জিনিসের যেমন একটা অন্ধকার দিক থাকে তেমন তার উজ্জ্বল দিকও থাকে। ডিনামাইটের উজ্জ্বল দিকটা আমাদের সচরাচর চোখে পড়ে না। অথচ পাহাড় কেটে তার ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে হলে ডিনামাইটের দরকার। নদী গর্ভ গভীর করে পুল তৈরি করতে হলে ডিনামাইট অপরিহার্য। এই সব কাজ লোকজন দিয়ে করতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন হত দীর্ঘ সময়ের, অপর দিকে তেমনই দরকার হত প্রচুর অর্থের। সভ্যতার অগ্রগতিতে ডিমামাইটের এমনকি আণবিক বোমারও প্রয়োজন আছে।

এক কথায় কোন আবিষ্কারই খারাপ নয়। মানুষের স্বার্থ-বুদ্ধিই তার জন্য একমাত্র দায়ী। মাঝে মাঝে আমাদের শুভবুদ্ধি স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা

আচ্ছন্ন হয়ে উঠে। মহান বিজ্ঞানীদের আজীবন সাধনার ফলকে আমরা নিয়োগ করি ধ্বংসাত্মক কর্মে। কল্যাণকর-রূপ চাপা পড়ে যায় এবং বিশ্বের মানুষের কাছে ভীতিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলিকে বিজ্ঞানের অপ প্রয়োগই বলা যেতে পারে।

॥ বারুদ ॥

বারুদের কথা আমরা সবাই জানি। বন্দুকের টোটা, হতে, বোমা আতসবাজি প্রভৃতির মূল উপাদান বারুদ। কিন্তু এই বারুদ যে কবে এবং কী ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল সে কথা বলা বড় শক্ত।

শোনা যায় খৃষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে গ্রীকরা বারুদ জাতীয় এক ধরণের জিনিস ব্যবহার করত। সেই বারুদের উপাদান ছিল পিচ, গন্ধক ও পোড়াচুন। এদের ভালভাবে গুঁড়া করে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করা হত। তবে সে বারুদ যে কেমন ছিল এবং কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হত তা আজ সঠিক করে বলা যায় না। তবে চীনারা যে অতি প্রাচীন কালে বারুদ তৈরি করতে পারত সে বিষয়ে অনেকে একমত।

অনেকে মনে করেন বাইজেনটাইনরাই প্রথম বারুদ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে সময়টা ছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝা মাঝি। আরও মনে করা হয়, বাইজেনটাইনদের তৈরী বারুদের মূল উপাদান ছিল সোরা। অবশ্য এই সোরা এখনও বারুদের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। তবে এসব শুধু অনুমান মাত্র। তাঁরা প্রকৃত বারুদের মত জিনিস প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা এবং সে বারুদে সোরা ছাড়া অন্যান্য কোন্ কোন্ জিনিস মেশান হত তা একেবারেই অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে বারুদের বর্ণনা করেন ১২৭০ খ্রীস্টাব্দে রোজার বেকন। কিন্তু

ঐ পর্যন্তই। বারুদের ব্যবহার তখনও হয়নি। জ্ঞানী গুণীদের মতে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারথোল্ড সোয়ার্জই প্রথম বারুদ আবিষ্কার করেন এবং তাঁরই সময় থেকে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

বারুদ বিস্ফোরক পদার্থ। এর উপাদনগুলির মধ্যে আছে সোরা, গন্ধক এবং কাঠ কয়লা। বারথোল্ড সোয়ার্জের আবিষ্কারের প্রায় বিশ বছর পরে কামান বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার কাজে ব্যবহার হল বারুদ। সেই থেকে যুদ্ধের কাজে বারুদ হয়ে উঠল অপরিহার্য এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তরবারি, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রগুলির বিদায় আসন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু বারুদের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহারে ভয়ানক অসুবিধা ছিল। সে সময় যে বারুদ তৈরী হত, তা গুঁড়া ছিল না। শক্ত শক্ত ডেলার আকারে থাকত। তাই সেই বারুদকে ভালভাবে চেপে বন্দুক কামানের নলের মুখে ভরা যেত না। আবার সে সময় বন্দুক ও কামানের উন্নতিও হয়নি বা আজকের দিনের মত টোটাও তৈরী হয়নি। বন্দুকধারীকে একবার গুলি ছোঁড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে নলের মধ্যে বারুদ পুরতে হত। কামানের নল বেশ মোটা থাকার জন্য সুবিধে হত বেশী কিন্তু বারুদ খরচ হত বস্তার পর বস্তা। অনেক পরে গুড়া করার যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ায় বারুদ ব্যবহারের সুবিধে হল এবং বন্দুক কামানেরও উন্নতি হল।

প্রথমে বলা হয়েছে বারুদ একটি বিস্ফোরক পদার্থ। বিস্ফোরণ ঘটার একমাত্র কারণ হচ্ছে, দ্রুত জারণ ক্রিয়া। জারণ ক্রিয়ার অর্থ যদিও ব্যাপক তবুও মোটামুটি যা বোঝায়, তা হল অক্সিজেনের সংযোগ ঘটা। অক্সিজেন অত্যন্ত সক্রিয় মৌলিক পদার্থ। কতকগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া আর প্রায় সব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সে ক্রিয়া করতে পারে। তবে এই ক্রিয়া কারও সঙ্গে হয় অতি দ্রুত আর কারও সঙ্গে অতি মন্থর। আবার এমন কতকগুলো পদার্থ আছে যাদের সঙ্গে অক্সিজেন চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই যুক্ত হয়ে যেতে পারে। তেমন ভাবে যুক্ত হলেই বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়।

ধরা যাক, একগাদা কয়লা খোলা জায়গায় পড়ে আছে। কয়লা অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করে এবং আশে পাশে বাতাসেও আছে অক্সিজেন। কিন্তু অক্সিজেন কয়লার সঙ্গে ভালভাবে ক্রিয়া করতে পারছে না বলে আমাদের চোখে কোন পরিবর্তন ধরা পড়ছে না। এবার কয়লার টুকরোগুলোকে ভেঙ্গে আগুনে গরম করলে অক্সিজেনের সংযোগ দ্রুত হবে এবং আমরা তাপ ও আলো উভয়ই লাভ করব। পরিশেষে সেই কয়লাকে অতি মিহি গুঁড়ায় পরিণত করে অক্সিজেনের পরিবেশে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে বিস্ফোরণ ঘটবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে ভালভাবে বুঝতে পারা যায় যে, কয়লার আকার যখন খুব বড় ছিল তখন অক্সিজেন কয়লার অণুর সঙ্গে ঠিকমত মিশতে পারছিল না। সেই কয়লাকে যখন মিহি গুঁড়ায় পরিণত করে অক্সিজেনের পরিবেশে রাখা হল তখন গুঁড়ার চারপাশে অক্সিজেন অতি দ্রুত জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করল।

এবার বোঝা গেল কয়লার গুঁড়াকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে রাখলে বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু যেখানে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে কোথায় পাওয়া যাবে অক্সিজেনের পরিবেশ?

পণ্ডিতেরা অনুমান করলেন. কয়লার সঙ্গে এমন একটা জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে, যাকে গরম করলে আপনা হতেই পাওয়া যাবে প্রচুর অক্সিজেন। তেমন জিনিস খুঁজতে গিয়ে তাঁরা হাতের কাছে পেলেন সোরাকে! সোরার মধ্যে থাকে পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন এবং প্রচুর অক্সিজেন। তাপ পেলে সোরা ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন করে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। যা কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে ক্রিয়া করে পলকের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটায়।

বারুদ প্রকৃতির প্রাথমিক যুগে সোরা এবং কাঠ কয়লার মিশ্রণকেই বলা হত বারুদ। ঐ বারুদের ব্যবহার এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে যার নাম কালো বারুদ বা ব্ল্যাক পাউডার।

বারুদ কঠিন পদার্থ। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সেটি উচ্চ চাপের গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন সেই গ্যাস আশে পাশের বাতাসকে জোরে

ধাক্কা দেয় এবং বাতাসে কতকগুলো ঘনীভূত ও তনীভূত স্তরের সৃষ্টি হয়। তারপর সেই স্তরগুলো তরঙ্গের আকারে এগিয়ে যায় দূরে। বিস্ফোরণ অতি দ্রুত হলে তরঙ্গের বেগ দ্রুত হয় এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা লাভ করে। তরঙ্গের বেগ অপেক্ষাকৃত কম হলে ধ্বংস করার চেয়ে জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতাই লাভ করে বেশী।

বন্দুক ও কামানে যে বারুদ ব্যবহার করা হয় তার কার্যপ্রণালী হচ্ছে, জোরে ধাক্কা দিয়ে কতকগুলো ধাতব টুকরা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব বলকে অতি দ্রুত ঠেলে দেওয়া। যারা বন্দুক ছোঁড়েন তাঁরা এ ব্যাপারটা ভাল করেই বোঝেন। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ছোট ছোট সীসার বল সজোরে বেরিয়ে আসে।

প্রথম যখন কামান ও বন্দুক তৈরি হয়েছিল তখন ওদের রেঞ্জ ছিল খুবই কম। তার প্রধান কারণ ড্যালা ড্যালা বারুদ ব্যবহার করা হত সেদিন। আগুন ধরলে বারুদের বহির্ভাগই কেবল জ্বলতে থাকত, ভেতরে আগুন প্রবেশ করত পরে। ফলে অযথা বহু গ্যাস নষ্ট হয়ে যেত। এই অসুবিধা দূর করেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ক্যাপ্টেন টমাশ রডম্যান নামে জনৈক সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ। তিনি বারুদের ড্যালার মধ্যে ছিদ্র করে দিয়ে ব্যবহারের প্রচলন করেন।

দীর্ঘকাল ধরে বারুদ কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে এবং আতস বাজি প্রকৃতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে "মার্টিন ওয়েজেল" নামে এক বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন, বারুদকে শিল্পক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূগর্ভ থেকে ধাতব আকরিককে উত্তোলন করার কাজে তিনিই প্রথম বারুদের সাহায্য নেন এবং সাফল্যও অর্জন করেন। রাস্তা তৈরির কাজেও একদিন বারুদের সাহায্য নেওয়া হত। এখন বারুদের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বারুদের ব্যবহার সীমিত হয়ে এসেছে।

॥ ফ্লোরিন ও হ্যালোজেন পরিবারের অন্যান্য সভ্য ॥

ফ্লোরিন আবিষ্কারের ইতিহাস একটি বেদনাপূর্ণ ও করুণ কাহিনী। এই মৌলিক পদার্থটিতে আবিষ্কার করতে কত যে বিজ্ঞানী দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এবং কত যে বিজ্ঞানী অকালে প্রাণ হারিয়েছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শোনা যায় ইংলণ্ডের প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ডেভিও অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন ঐ ফ্লোরিনকে নিয়ে গবেষণার জন্য।

ফ্লোরিন একটি মৌলিক পদার্থ এবং সে হ্যালোজেন পরিবারের একজন সদস্য। হ্যালোজেন পরিবারে আছে মাত্র পাঁচটি মৌলিক পদার্থ। প্রথম সদস্য ক্লোরিন! অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছে ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ও অ্যাস্টাটিন। স দ্র লবণ থেকে এদের পাওয়া যায় বলে নাম হয়েছে হ্যালোজেন। গ্রীক ভাষায় "হ্যালস" অর্থে "সমুদ্র" এবং "জেনাও অর্থে "তৈরি করি" বোঝায়। তাই এই ধরণের নামকরণ।

পরিবারের প্রথম মৌলিক পদার্থ ছিল দীর্ঘকাল ধরে মানুষের কাছে অপরিচিত! ক্লোরিন, আয়োডিন এবং বোমিনের পরিচয় অনেক আগেই জানতে পেরেছিল মানুষ। তবে ফ্লোরিনের যৌগগুলি মানুষের অপরিচিত ছিল না।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে জার্মানীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন জর্জ অ্যাগ্রিকালো নামে এক ধাতুবিদ্যা বিশারদ। সে সময়ে ধাতু সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান আর একজনেরও ছিল না। মানুষ তখনই তাঁকে সম্মানিত করেছিল "ধাতুবিদ্যার জনক" এই আখ্যায় ভূষিত করে। আজও অবশ্য ধাতুবিদ্যার জনক বলতে জর্জ অ্যাগ্রিকালোকেই বোঝায়।

জর্জ অ্যাগ্রিকালোর একটা অভ্যাস ছিল। সে অভ্যাসটা হল, যেখানে যত রকমের পাথর, যত খনিজ পদার্থ পেতেন সবই সংগ্রহ করে রাখতেন এবং পরীক্ষা করে দেখতেন সেগুলো মানুষের কোন প্রয়োজনে আসতে পারে কি না।

একবার তিনি এক অদ্ভুত ধরণের খনিজ পদার্থ পেলেন। অদ্ভুত এই কারণে যে, সেটি সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করতেই একেবারে গলে গেল। যা সাধারণতঃ কোন খনিজ পদার্থের বেলায় দেখা যায় না। বিস্মিত অ্যাগ্রিকালো বস্তুটির গলনশীলতার পরিচয় পেয়ে নাম রাখলেন "ফ্লোর"। ফ্লোর শব্দটি তিনি অবশ্য ল্যাটিন ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিলেন—যার অর্থ হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া। তবে এই খনিজটির নাম দীর্ঘকাল অটুট থাকল না। বিজ্ঞানীরা একটু রদবদল করে নাম রাখলেন ফ্লোরস্পার।

এরপরে কেটে গেল কত কাল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ন্যুরেমবার্গে আবির্ভূত হলেন এক শিল্পী। তাঁর নাম "শ্‌ভান হার্ট"। একদিন কী খেয়াল হল তাঁর। ফ্লোরস্পারের একটা টুকরাকে সালফিউরিক অ্যাসিডে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হল এক গ্যাস। গ্যাসটি শ্‌ভানহার্টের চশমায় গেলে কাচ দুটো ঘোলাটে করে দিল।

শ্‌ভানহার্ট শিল্পী ছিলেন কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন না। গ্যাসটার পরিচয় কী, কিংবা কোন কারণেই বা উৎপন্ন হল সে কথা তাঁর মনে এল না। বিদ্যুতের মত একটা ধারণা তাঁর মাথায় এসে গেল এই গ্যাসটিকে ব্যবহার করে কাচের গায়ে নক্সা করা যেতে পারে।

শিল্পী মানুষ! বসে গেলেন কাচের গায়ে ফুল কাটতে। তাঁর হাতে জন্ম নিল এক নতুন শিল্প যার নাম এচিং। কাচের উপর নক্‌সা করতে ফ্লোরস্পারের ডাক পড়ল সবত্র। কিন্তু সেখান থেকে উৎপন্ন গ্যাসটির অবগুণ্ঠন মোচন করতে কেউ এগিয়ে এলেন না।

ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হয়ে গেল একশ'টি বছর। এল সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী "শীলের কাল। একদিন শুভক্ষণে তাঁর দৃষ্টি পড়ল ফ্লোরস্পারের দ্বার উৎপন্ন সেই অজ্ঞাত গ্যাসটির উপর। পূর্বোক্ত উপায়ে গ্যাসটিকে তৈরি করে জলে দ্রবীভূত করে দেখলেন জলে অ্যাসিড়ের গুণ প্রকাশ পেল। কিন্তু গ্যাসটিকে কিছুতেই সনাক্ত করতে পারলেন না। শুধু ঘোষণা করলেন, অজ্ঞাত এই গ্যাসটির জলীয় দ্রবণ অ্যাসিড ধর্মী। জলীয় দ্রবণের নাম দিলেন ফ্লোরিক অ্যাসিড।

শীলের ঘোষণার পর এগিয়ে এলেন দলে দলে বিজ্ঞানী। কতজন কত রকমের সিদ্ধান্ত পোষণ করলেন কিন্তু প্রকৃত তথ্য কেউ প্রদান করতে পারলেন না। কেবল মৌলটির নামকরণ করলেন ফ্লোরিয়াম।

বছর গড়িয়ে চলল। শীলের পর এল ডেভির কাল। ডেভিও বাদ পড়লেন না। লেগে গেলেন গ্যাসটিকে সনাক্ত করতে। কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। একদিন সন্ধান পেলেন এক অদ্ভুত রহস্যের। সেদিনও পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল অ্যাসিড মাত্রেই অক্সিজেনের যৌগিক অর্থাৎ প্রত্যেকটি অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকবেই। "অক্সিজেন" এই নাম করণের পেছনেও আছে সেই উদ্দেশ্য। অক্সিজেন অর্থে অম্ল উৎপাদক।

ডেভি দেখলেন অজ্ঞাত গ্যাসটির জলীয় দ্রবণ অ্যাসিড ধর্মী হলেও তার মধ্যে অক্সিজেন নেই। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রো আয়োডিক অ্যাসিড প্রভৃতিতেও দেখা গেল অক্সিজেন নেই। ডেভির পরীক্ষা প্রমাণ করল, সব অ্যাসিডে অক্সিজেন নাও থাকতে পারে তবে হাইড্রোজেন থাকবেই। "অক্সিজেন" এই নাম করণটাই সেদিন ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হল।

ডেভির আবিষ্কারের কিছুদিন পরে ফরাসী বিজ্ঞানী "আঁপেয়ার" বললেলন, ফ্লোরিক অ্যাসিডে দুটি মাত্র মৌলিক পদার্থ আছে। একটি পূর্বকথিত হাইড্রোজেন, আর একটি নতুন মৌল—যার পরিচয় আজও মানুষ পায়নি। ডেভি এবং আঁপেয়ার এবার দুজননেই মেতে উঠলেন গবেষণায়। শেষে বুঝতে পারলেন, অজ্ঞাত এই গ্যাসটির সঙ্গে ক্লোরিনের সাদৃশ্য। নামটা ঠিক করলেন দুজনেই। ফ্লোরস্পার থেকে পাওয়া যাচ্ছে মৌলটি, ক্লোরিনের সঙ্গেও আছে তার মিল। ফ্লোরস্পারের প্রথম অক্ষর "ফ্লো" ক্লোরিনের শেষ দু অক্ষর "রিন"—এই নিয়ে মৌলটির নাম হল "ফ্লোরিন"। তাছাড়া শীলের প্রদত্ত ফ্লোরিক অ্যাসিড নামটিও বদল গ্যাসীয় অবস্থায় নাম রাখা হল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এবং জলে দ্রবীভূত অবস্থায় নাম রাখা হল হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড।

এরপর একটানা ব্যর্থতার ইতিহাস। কত বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন

গ্যাসটিকে রসায়নাগারে প্রস্তুত করতে, কতজনে প্রচেষ্টা চালালেন ফ্লোরস্পার থেকে ফ্লোরিনকে বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্তু কেউই সফল হতে পারলেন না। এই গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করতে দুটি পথ বেছে নিলেন বিজ্ঞানীরা। একটা ফ্লোরস্পার থেকে ; অপরটা হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড থেকে। ফ্লোরস্পারকে কত পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে চেষ্টা করলেন, তারপর কেউ কেউ তড়িৎ দ্বার বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন পদ্ধতিতেই ফ্লোরিনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না।

শেষে দৃষ্টি দিলেন হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের প্রতি। এই অ্যাসিড অত্যন্ত বিষাক্ত। তার উপর অ্যাসিড থেকে ফ্লোরিন বিচ্ছিন্ন করাটাও ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু কোন বিপদের ভয় করেন না বিজ্ঞানীরা। যতই ব্যর্থতা আসে ততই তাঁদের রোখ চেপে যায়। শেষে প্রাণ হারাতে হল কত বিজ্ঞানীকে। সবার নাম জানা নেই। তবে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী "ল্যুয়েট" এবং ফরাসী বিজ্ঞানী নিকলে যে ফ্লোরিনের শিকার হয়েছেন সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। একদিন ডেভিও এই গ্যাসের খপ্পরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলেন। সেই থেকে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে উঠে এবং মাত্র একান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্লোরস্পারকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যখন বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হলেন তখন অন্য কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফ্লোরিন তৈরি করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই চলতে লাগল।

প্রথম প্রচেষ্টা চালালেন "এইমে" নামে এক রসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি সিলভার ক্লোরাইডের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় ফ্লোরিন তৈরির চেষ্টা করলেন। এই পদ্ধতিতে ফ্লোরিন প্রস্তুত হল ঠিকই কিন্তু উদ্ভূত ফ্লোরিন পাত্রের রবার কর্কের সঙ্গে ক্রিয়া করল। এইমের পর 'নক্স ভ্রাতৃদ্বয়' ফ্লোরস্পারের পাত্রে পূর্বোক্ত বিক্রিয়া ঘটালেন কিন্তু ব্যর্থতা বরণ তাঁদেরও করতে হল।

কেটে গেলে আরও কত বছর। ব্যর্থতা বরণ করলেন আরও কত বিজ্ঞানী। এল ফরাসী বিজ্ঞানী "ফ্রেমী"র কাল। তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ

করল ক্লোরিন। পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলি বাদ দিয়ে অন্য উপায়ে ক্লোরিন প্রস্তুত করতে পারা যায় কিনা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন। একদিন ভাবলেন তিনি, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকেই তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখলেন, ক্লোরিন আদৌ পাওয়া গেল না। পাওয়া যাবেই বা কোত্থেকে? তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্বারা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থেকে বিচ্ছিন্ন ক্লোরিন সঙ্গে সঙ্গে জলের সাথে ক্রিয়া করে পুনরায় উৎপন্ন করল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ব্যর্থতা বরণ করতে হল তাঁকেও।

ফ্রেমীর চিন্তাধারা পুনরায় পরিবর্তিত হল। এবার তিনি অনার্দ্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাতে চেষ্টা করলেন। দেখলেন, অনার্দ্র অ্যাসিড তড়িতের কুপরিবাহী। এত প্রচেষ্টা, এত পরিশ্রম, সবই হল ব্যর্থ।

ফ্রেমীর পর প্রচেষ্টা চালালেন "গোরে" নামে এক বিজ্ঞানী। তিনি ক্যালসিয়াল ক্লোরাইড, সিলভার ক্লোরাইড এবং পটাসিয়াম ক্লোরাইডকে এক সঙ্গে দ্রবীভূত করে তার ভেতর দিয়ে চালালেন বিদ্যুৎ। কিন্তু হায়! তিনিও হার মানলেন শেষ পর্যন্ত। এই প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন যে উৎপন্ন হলনা এমন নয়। তবে যা উৎপন্ন হল সবই তড়িৎ বিশ্লেষণের পাত্র এমন কি তড়িৎদ্বারকে পর্যন্তও আক্রমণ করে বিক্রিয়া ঘটাল।

সর্বশেষ এগিয়ে এলেন ফ্রেমীর এক সুযোগ্য ছাত্র হেনরী ময়সাঁ। তিনি বুঝেছিলেন, ক্লোরিন বেজায় সক্রিয়। কাচকেও ক্ষয় করতে পারে সে। তাই প্রথম থেকেই তাঁর মনে এল, যতদূরসম্ভব কম তাপমাত্রায়ই তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সক্রিয়তা আরও বেড়ে যাবে।

প্রথমবারে বোরন ও সিলিকন ক্লোরাইডকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু সফল হতে পারলেন না। দ্বিতীয়বার গ্রহণ করলেন ফসফরাস ক্লোরাইড। এবারও তাঁর কপালে জুটল ব্যর্থতা। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। আপন চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে হাইড্রোক্লোরিক

অ্যাসিড থেকেই ক্লোরিনকে আলাদা করতে চেষ্টা করলেন।

ধাতব পাত্র এবং কাচপাত্রের উপর ক্লোরিনের ক্রিয়া হয় বলে ময়সাঁ প্ল্যাটিনামের পাত দিয়ে পাত্র তৈরি করলেন। পাত্রের আকার করলেন অনেকটা ইংরেজী "ইউ" অক্ষরের মত। তাতে অনার্দ্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত দ্রবণ রেখে তড়িৎ চালালেন। তাপমাত্রা নামিয়ে আনলেন ০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে। এবার আর ব্যর্থ হলেন না ময়সাঁ! যে ক্লোরিন এত কাল আত্মগোপন করে ছিল এবার তাকে বাধ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হল।

ইংরাজী ১৮৮৬ সাল। বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন ময়সাঁ ক্লোরিন তৈরির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। খুশি হলেন সবাই। শত শত বিজ্ঞানীর অধ্যবসায় ময়সাঁর হাতে সফল হল। অক্ষয়কীর্তি রচিত তাঁর জন্য।

হ্যালোজেন পরিবারের অপরাপরদের ইতিহাস এত সুদীর্ঘকালের নয়। পরিবারের দ্বিতীয় মৌল ক্লোরিন অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ক্লোরিনের পরিচয় প্রথম প্রদান করেছিলেন বিজ্ঞানী "গ্লবার"। তিনি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য লবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন এই গ্যাসটি। প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন এই গ্যাসটি অক্সিজেনের একটি যৌগিক। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডেভিই ঘোষণা করলেন, গ্যাসটি কোন যৌগিক নয় এবং এর মধ্যে অক্সিজেন নেই। তিনিই নামকরণ করেছিলেন ক্লোরিন।

ক্লোরিনের পর আবিষ্কৃত হয়েছে আয়োডিন। আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী কুর্তোয়াঁ। ফরাসী দেশের লোক তিনি। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্যাসটিকে তৈরী করে রেখে দিতেই অল্প পরে কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

কুর্তোয়াঁ আবিষ্কারক বটে কিন্তু আয়োডিন সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রদান করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল এটি কোন মৌলিক পদার্থ নাও হতে পারে। শেষে "ডেভী" ও "গেলুসাক" জানালেন, আয়োডিন মৌলিক পদার্থ। সামুদ্রিক উদ্ভিদে এরা প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এর ধর্মের সঙ্গে ক্লোরিনের ধর্মের যথেষ্ট মিল আছে।

ব্রোমিনের আবিষ্কর্তা ফরাসী বিজ্ঞানী "বালার"। ভূমধ্যসাগরের লোনা জল থেকে নুনকে পৃথক করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট তরলটির সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক ধরনের ঘোর লাল বর্ণের তরল পেয়েছিলেন বালার। তরলটি ছিল ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত। গ্রীক ভাষায় দুর্গন্ধকে বলা হয় Bromos। রসায়ন বিজ্ঞানীরা ক্লোরিনের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত দেখে নামকরণ করেছেন ব্রোমিন। শোনা যায় বালারের সমসাময়িক সময়ে বিজ্ঞানী "লাভিগ"ও ব্রোমিনকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

সর্বশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে হ্যালোজেন পরিবারের শেষ সদস্য "অ্যাস্টাটিন"। মেণ্ডেলীফ যে পর্যায় সারণীর প্রবর্তন করেছিলেন তাতে অনেক ঘরকে শূন্য রেখে ছিলেন? তার কারণ, তখনও বহু মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়নি অথচ ভবিষ্যতে আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আয়োডিনের নীচে অনাবিষ্কৃত মৌলির শূন্য ঘরটির নামকরণ করেছিলেন তিনি "একা আয়োডিন"। পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ঠিক করে মেণ্ডেলীফ ঘোষণা করেছিলেন, যদি মৌলটিকে প্রকৃতিতে লাভ করা যায় তাহলে সেটি হবে তেজস্ক্রিয় মৌল।

বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করলেন একা আয়োডিনকে উদ্ধার করতে। প্রথমে চলল তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে অনুসন্ধান কার্য। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না একা আয়োডিনকে। শেষে একদিন "অ্যালিসন" নামে এক বিজ্ঞানী জানালেন "মোনজাইট" বালুকার মধ্যে তিনি একা আয়োডিনের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞানী 'রাজেন্দ্রলাল দে' জানালেন, ত্রিবাঙ্কুরের মোনাজাইট মৃত্তিকা থেকে তিনি একা আয়োডিনকে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল মৌলটির নাম একা আয়োডিনের পরিবর্তে "ডেকিন" রাখেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মৌলটির কোন আইসোটোপ তৈরী করতে পারলেন না।

পরিশেষে 'করসন, 'ম্যাকেঞ্জী' ও 'সেগ্রে' এই তিনজন বিজ্ঞানী মৌলটির পরমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৮৫ এবং এটি অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় মৌলিক

পদার্থ। গ্রীক ভাষায় "অস্থায়ীকে বলে Astatos। তাই মৌলিক পদার্থটির হ্যালোজেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাম ঠিক করা হল "অ্যাস্টাটিন"।

॥ দৈর্ঘের একক ॥

দূরত্ব মাপার জন্য অতি প্রাচীনকালেও মানুষের চিন্তার বিরাম ছিল না। সেকালে দৈর্ঘ্য নির্ণয় করার জন্য কত যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে কথা আজ আর সঠিক করে বলার উপায় নেই। তবে একথা সত্য যে, প্রাচীনকালে দূরত্বের একক সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করত মানুষের খেয়াল খুশির উপর।

আগে ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। সেকালে ভারতের মানুষ পথ-ঘাটের দূরত্ব নির্দেশ করত ক্রোশ শব্দটি ব্যবহার করে। একজন লোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জোরে ডাক দিলে যতদূর পর্যন্ত তার সে ডাক শোনা যেত সেই দূরত্বটাকে বলা হত ক্রোশ। দূরত্বের সব চেয়ে বড় একক ছিল যোজন। যোজন আবার নির্ণয় করা হত, একটা ঘোড়া একটানা যতটা পথ অতিক্রম করতে পারত ঠিক ততটা পথ। অবশ্য দূরত্বের ছোট এককও ছিল। সব চেয়ে ছোট একক 'যব' যবের পরে হাতের 'আঙ্গুল'। তার চেয়ে বড় একক 'হাত' অর্থাৎ কনুই থেকে মাঝের আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত। এক কথায় ভারতের দৈর্ঘের ছোট একক ছিল যব এবং একক যোজান।

প্রাচীন রোমানরাও কয়েক ধরনের একক ব্যবহার করতেন। তাঁদের সবচেয়ে ছোট একটি ছিল ভারতের মত একটি যবের পরিমাণ। পরপর তিনটি যব পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলে দূরত্বের পরিমাণ হত ইঞ্চি। তবে তাঁদের দ্বারা ব্যবহৃত বড় এককের কথা কিছু জানা যায় না।

মধ্যযুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ দৈর্ঘ্য মাপার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতো। কিন্তু কোন এককই মানুষকে সন্তুষ্ট করেতে পারেনি। কোন দেশে পায়ের পাতার মাপ কোন দেশে বা হাতের মাপ,

কোন দেশ আবার পুরো একটা মানুষের মাপকে একক ধরত। অসুবিধা থেকে যেত বরাবর। কেননা সব মানুষ সমান লম্বা নয় কিংবা কারও হাতে বা পায়ের পাতার মাপও সমান নয়। এই ধরনের মাপে সব জায়গায় কম বেশী হত।

দৈর্ঘ্যের এককের জন্য রাজারাজড়ারাও মাথা ঘামাতেন। ভারত বা অন্যান্য দেশের কথা জানা গেলেও শোনা যায় ইংলণ্ডের রাজা প্রথম হেনরী দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে 'গজের' প্রচলন করেন। কী একটা কারণে বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। রাজ্যে ঘোষণা করে ছিলেন, দৈর্ঘ্য মাপার জন্য তিনি যে একক নির্দেশ করবেন সবাইকে তা মেনে নিতে হবে।

রাজার অদেশ! অবহেলা করে কার সাধ্য? একদিন রাজ্যের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে ডেকে বললেন "তোমরা আমার নাকের ডগা থেকে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল পর্যন্ত লম্বা একটা ফিতে তৈরী কর"।

রাজাজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল। যে দৈর্ঘ্যের ফিতাটা হল রাজার নির্দেশে সেই দৈর্ঘ্যটাকে বলা হল "ইয়ার্ড"। ইয়ার্ডের বাংলা হচ্ছে গজ।

ইংলণ্ডে দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ইয়ার্ডের প্রচলন থাকল কত কাল। এক সময় ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলেন মহারানী এলিজাবেথ। মহা বুদ্ধিমতী ছিলেন তিনি। বোধ হয় দৈর্ঘের একক হিসাবে ইয়ার্ড তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি একটা নতুন উপায় চিন্তা করলেন। পণ্ডিতদের শুনিয়ে ছিলেন 'দৈর্ঘ্যের একক ইয়ার্ড সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। ও একক ব্যবহার করা চলবে না"।

—"তাহলে"? বিস্মিত পণ্ডিতরা জিজ্ঞাসা করলেন।

—"উপায় একটা বাৎলে দিচ্ছি শোন"। মহারানী বললেন "ঐ বড় গির্জা থেকে রবিবার দিন সকালে উপাসনা শেষে লোকজন যখন বেরিয়ে আসবে তখন তাদের মধ্যে যে কোন যোলজনকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেবে। তারা যেন একজনের সামনে আর একজন, তার সামনে আর একজন, এইভাবে দাঁড়ায়। আর এমন ভাবে দাঁড়াবে যেন তাদের একটা

পায়ের পাতা অপর পায়ের পাতাকে কেবলমাত্র স্পর্শ করবে এবং সামনের ব্যক্তির একটা পা পেছনের ব্যক্তির পায়ের পাতা ছুঁয়ে যাবে"।

রানীর নির্দেশ পালিত হল। যে দৈর্ঘটা পাওয়া গেল তার নাম হল রড। রডের ষোল ভাগের এক ভাগকে বলা হল ফুট।

দৈর্ঘ্য মাপার এই সব প্রচেষ্টাকে দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে মানুষ এই সব সনাতন পদ্ধতিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা চাইলেন, সারা পৃথিবীতে একটা নিখুঁত মাপের প্রচলন করা হোক। সব দেশের বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন। কেমন করে একটা সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত মাপ পাওয়া যাবে।

ফরাসী দেশের কয়েকজন বিজ্ঞানী মিলে ঠিক করলেন, 'মিটার'কে তাঁরা দৈর্ঘ্যের একক হিসাবে ব্যবহার করবেন। কিন্তু এই মিটারের পরিমাণ কতটা হবে? আবার চিন্তাগ্রস্ত হলেন তাঁরা।

শেষে সেই ফরাসী বিজ্ঞানীরাই ঠিক করলেন আমাদের পৃথিবীর পরিধিটা যত বড় হবে তার চার ভাগের একভাগকে এক কোটি ভাগ করলে যা দাঁড়াবে সেইটে হবে মিটারের দৈর্ঘ্য।

সব বিজ্ঞানীরাই মেনে নিলেন কথাটা। তারিফ করলেন সবাই। এমন বিজ্ঞানসম্মত মাপ আর কী হতে পারে?

কিন্তু অসুবিধা একটা অনুভব করলেন সবাই। তখনও পর্যন্ত পৃথিবীর পরিধির পরিমাপ কেউ নির্ণয় করতে সক্ষম হননি। তাহবে এখন উপায়?

হাল ছাড়লেন না বিজ্ঞানীরা। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেলেন পৃথিবীর পরিধিটা নির্ণয় করার জন্য।

বিজ্ঞানীদের সাধনা ব্যর্থ হলনা। একদিন তাঁরা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে নির্ণয় করে নিলেন পৃথিবীর পরিমাপ। ফরাসী বিজ্ঞানীদের পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধির চার কোটি ভাগের এক ভাগ এক মিটার বলে পরিগণিত হল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জুন। ঐদিনই 'এক মিটার দৈর্ঘের জন্যে একটি প্লাটিনাম দণ্ড তৈরী হয়েছিল। যে দণ্ডটি

আজও রেখেছে ফ্রান্স।

মিটারের একশ ভাগের এক ভাগের নাম দেওয়া হল সেন্টিমিটার এবং সেন্টিমিটারের দশভাগের এক ভাগ হল মিলিমিটার। বেশী দূরত্ব মাপার জন্য হাজার মিটারকে কিলোমিটার আখ্যা দেওয়া হল।

॥ চুম্বকের কথা ॥

অতি প্রাচীনকালে মধ্যে এশিয়ার ম্যাগনেশিয়া প্রদেশে এখানে ওখানে এক ধরনের পাথর কুড়িয়ে পাওয়া যেত। পাথরগুলির এক আশ্চর্য গুণ লক্ষ্য করত সবাই। যেখানে ঐ পাথরের টুকরো পড়ে থাকত, সেখানে দেখা যেত দু'চার টুকরো লোহা পাথরটাকে ঘিরে রয়েছে। কৌতূহলী মানুষ সেই পাথরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখত কখনও খেয়ালের বশে একখানা লোহা পাথর তার সামনে ধরত। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করত, লোহার টুকরাকে আকর্ষণ করে পাথরটি। কেউ কেউ বা বাড়ী বয়ে নিয়ে আসত। পণ্ডিত যাঁরা তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, পাথরটির অন্য কোন গুণ আছে কি না।

কিন্তু সেদিন এই পর্যন্তই। পাথরের অন্য কোন গুণ তাঁদের কাছে প্রকাশ পায়নি। অনুসন্ধিৎসু মানুষ এই বিশেষ গুণসম্পন্ন পাথরটির নামকরণ করল ম্যাগনেটাইট। বলা বাহুল্য ম্যাগনেশিয়া প্রদেশে পাথরটিকে পাওয়া যেত বলে এই ধরণের নামকরণ করা হয়েছিল।

দিন যায়। উৎসাহী মানুষ ঐ পাথরকে নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠে। সেদিন তো আর যন্ত্রপাতি কিছুই আবিষ্কার করা হয়নি। তাই অতি সাধারণ সব পরীক্ষা করত তারা। তাতেই প্রকাশ পেল পাথরটির আর একটা গুণ।

কেউ একজন একটা সরু সূতায় বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল, পাথরটা ঘুরতে ঘুরতে উত্তর দক্ষিণে লম্বমাণ হয়ে রইল।

নিতান্ত কৌতূহল বশবর্তী হয়ে পাথরটার একটা প্রান্তে দাগ দিয়ে পুনরায় ঘোরাতে লাগল। বিস্ময়ের পর আরও বিস্ময়। পাথরটার একটা মেরু সব সময় উত্তর দিকে মুখ করে থাকল। কিছুতেই সে মুখটা দক্ষিণে করা গেলনা। পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা পাথরের যে মুখটা উত্তর দিকে থাকে তার নাম দিলেন উত্তর মেরু। আর যে মুখটা দক্ষিণ দিকে থাকে তার নাম দিলেন দক্ষিণ মেরু।

আরও কিছুদিন পরে, একজন দুটো পাথরের মেরুগুলো ঠিক করে নিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় একটা পাথরের উত্তর মেরুর কাছে অন্য পাথরের উত্তর মেরুকে আনল। সর্বনাশ? আপনা হতেই ঝোলান পাথটা ঠিকরে উঠল। তারপর দক্ষিণ মেরুটা কাছে সরে এসে আকর্ষণ করল। বেশ মজা পেল মানুষ। ছোট ছেলেদের মত খেলায় মেতে উঠল!

অনেকে এবার চিন্তা করতে বসল, পাথরটিকে মানুষের কোন কাজে লাগন যায় কী! খুঁজে পেতে তারা ঠিক করল। হ্যাঁ, একটি কাজেই লাগান যেতে পারে। সেটি হচ্ছে দিক নিরূপণের কাজ। পাথরের একটা মেরু সব সময় উত্তর দিকে থাকে তো? তাই ঐ পাথরের একটি টুকরা কাছে থাকলে দিক হারিয়ে ফেলার ভয় নেই।

এই গুণের জন্য সেদিনের পণ্ডিতেরা পাথরের আর একটা নাম রাখল। সে নামটা হল 'লোড স্টোন' বা "লিডিং স্টোন। বাংলায় দিগ্‌দর্শন পাথর।

এর পর কেটে গেল কত দিন। এল বিজ্ঞানীদের গুরু আর্কিমিদিসের সময়। একদিন পাথরটি তাঁর দৃষ্টিকেও কেড়ে নিল। পাথরের গুণের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত তিনিও বড় কম হলেন না। ভাবলেন, পাথরকে কাজে লাগিয়ে যেমন করে হোক যন্ত্র একটা বানাতেই হবে।

সাধনায় মেতে উঠলেন আর্কিমিদিস। কতদিন পরে একদিন সত্য সত্যই আবিষ্কার করলেন এক মহা মূল্যবান যন্ত্র। যন্ত্রটির নাম হল 'কম্পাস বা দিগদর্শন যন্ত্র। শোনা যায়, কোন দেশের সাহায্যে গ্রহণ না করে চীনরাও উক্ত যন্ত্রটি তৈরী করেছিলেন।

তাঁর এই যন্ত্র আবিষ্কারের পর বিশেষ করে নাবিকদের হল ভয়ানক সুবিধে। আকাশে মেঘ থাকলে নৌকা কিংবা জাহাজের মাঝিরা দিক ঠিক করতে পারত না। মেঘ না থাকলে অবশ্য মাঝিরা দিনের বেলায় সূর্য এবং রাতে তারামণ্ডলীকে দেখে পথ চিনি নিত। এবার আর্কিমিদিসের কৃপায় তাদের হল বড্ড সুবিধে। মেঘ হলে ভয় নেই এবং সব সময় হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকারও প্রয়োজন নেই। এখনও নাবিকেরা কম্পাস ব্যবহার করে থাকেন। যদিও সেদিনের কম্পাস আজকের মত এত নিখুঁত ছিল না।

অর্কিমিদিসের পরও চলল পাথরকে নিয়ে গবেষণা। ধীরে ধীরে পাথরের আরও কয়েটা গুণ মানুষের নজরে এল। সব চেয়ে বড় গুণটি হল, পাথরকে লোহার উপর একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত কয়েকবার ঘষলে লোহাটাও পাথরের গুণ প্রাপ্ত হয়। আবার সেই লোহার খণ্ডটাকে যত ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাগ করা যাক না কেন প্রত্যেকটি খণ্ডের মধ্যে পাথরের নিজস্ব গুণ বিদ্যমান থাকে।

পাথরকে লোহার উপর ঘসে কৃত্রিমভাবে চুম্বক তৈরী করার ধুম পড়ে গেছল সেদিন। ম্যাগনেটাইট থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হল বলেই নাম হল ম্যাগনেট। বিজ্ঞানীরা এবার ম্যাগনেট বা চুম্বককে নিয়ে ভালভালে গবেষণা শুরু করলেন। আরও কত গুণের কথা ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন। তারপর স্থির তড়িৎ আবিষ্কারের পর বোঝা গেল তড়িৎ শক্তির ও চুম্বক শক্তির মধ্যে অধিকাংশে মিল আছে। আবার এদিন আবিষ্কৃত হল, তড়িৎ শক্তির দ্বারা চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। সেই থেকে আরম্ভ হল তড়িৎ বিজ্ঞানের নব যুগ।

॥ বৈদ্যুতিক বাতির আদি কথা ॥

শত শত বিজ্ঞানীর শত শত বছরের সাধনার ফলে একদিন বিদ্যুৎ হল করায়ত্ত। চমকিত হল মানুষ বিদ্যুতের শক্তির পরিচয় লাভ করে। শুভক্ষণে আবিষ্কৃত হল ডায়নামো। বিজ্ঞানীদের মাথায় এক নতুন চিন্তা। ভাবলেন, যেমন করেই হোক বিদ্যুৎকে নিয়ে আলো জ্বালতে হবে। কত বিজ্ঞানী নেমে পড়লেন এ কাজে। তাঁরা দেখলেন, যখন কোন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন তারটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তাছাড়া সেই যে পণ্ডিত, যিনি ঘুরি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন? তিনিই প্রমাণ করেদিলেন আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মানুষের তৈরী বিদ্যুতের কোন ভেদ নাই!

আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে, মানুষের বিদ্যুৎ স্পর্শে ধাতব তার গরম হয়ে উঠে, তবে কেন আলো জ্বালান যাবে না? অনেক ভেবে চিন্তে মানুষ প্রথম তৈরী করল আর্ক ল্যাম্প। শহরের রাস্তায় বসান হল এই আলো। জয় জয়কার পড়ে গেল চারদিকে। বিদ্যুৎ ছিন্ন ভিন্ন করে দিল অমানিশার গাঢ় অন্ধকারকে।

তখন চলেছে বিজ্ঞানের যাদুকর টমাস আলভা এডিসনের আমল। এমন ছিল তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, যা একবার তাঁর হাতের ছোঁয়া পেত তা তৎক্ষণাৎ সজীব হয়ে উঠত মনে হয় কোন কাজেই ব্যর্থতা বরণ করেননি এডিসন। যেদিন তিনি আর্কল্যাম্প দেখলেন, সেইদিনই তাঁর মাথায় চিন্তা এল, যদি ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাতি বসানো যেত তাহলে আমাদের কতই না সুবিধা হত। ঠিক করলেন মনে, যেমন করেই হোক তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবেনই।

পরীক্ষার বসে গেলেন এডিসন। কত হরেক রকমের মোটা ও সরু তার দিয়ে আরম্ভ হল তাঁর গবেষণা। একদিন তাঁর নজরে পড়ল, যে সব তারের

ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে, বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে সেগুলো সবাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আবার যে তারের রোধ যত বেশী, সেই তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে তত বেশী উত্তপ্ত হয়। পরীক্ষার দ্বারা আরও বুঝতে পারলেন, পরিবাহী তার সরু হলেই রোধ বেশী হয়।

চলল গবেষণার পর গবেষণা। সরু তার বা ফিলামেণ্ট তৈরী করতে গিয়ে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। দেখলেন সব পরিবাহীর সরু তার এ কাজের উপযোগী নয়। বেশীর ভাগ সরু তারই বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

যতই বাধা পেতে লাগলেন ততই তাঁর উৎসাহ বেড়ে চলল। শেষে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আবিষ্কার করেন, কার্বন দিয়ে ফিলামেণ্ট প্রস্তুত করলে সহজে পুড়ে ছাই হয়ে যায় না। একবার নয়, দুবার নয়, বেশ কয়েকবার ধরেই পরীক্ষাটা করলেন। কোন বারেই কার্বন ফিলামেণ্ট পুড়ে গেল না। আনন্দে উজ্জ্বল্ হয়ে উঠল এডিসনের মুখ। বুঝি বা এতদিনে তার স্বপ্ন সার্থক হল!

ইংরাজী ১৮৭৯ সাল। এডিসন একটা কাচের বাল্বে কারবন ফিলামেণ্ট সংযোগ করে বাল্বটিকে বায়ুশূন্য করলেন। তারপর তার ভেতর দিয়ে পাঠালেন বিদ্যুৎ। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলেন ফলটা কী দাঁড়ায় দেখার জন্য।

বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এডিসন দেখলেন ফিলামেণ্টটা পুড়ে গেল না অধিকন্তু বেশ কিছুটা আলো পাওয়া গেল। সে আলোটা আজকের দিনে বৈদ্যুতিক বাতি থেকে যে পরিমাণ আলোটা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম ছিল। তবুও বেজায় খুশি হলেন এডিসন। শোনা যায়, দুদিন এবং দুরাত ধরে ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ অব্যাহত রেখেছিলেন। তবুও ফিলামেণ্টটি পুড়ে যায়নি।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রদর্শনীতে এডিসন সর্ব সমক্ষে প্রদর্শন করলেন তাঁর এই ঐতিহাসিক আবিষ্কার। কিন্তু সেই প্রদর্শনীতে

আরও একজন বিজ্ঞানী উক্ত পরীক্ষাটি তুলে ধরলেন। তাঁর বাতিটিও ছিল কার্বন ফিলামেন্ট দিয়ে তৈরী। সেই বিজ্ঞানীর নাম "জোসেফ উইলসন স্বোয়ান"।

ছুজনেরই এক আবিষ্কার। দর্শকদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হল। প্রথমে কে আবিষ্কার করেছেন? একদল বলল এডিসন, কিন্তু স্বোয়ানের সমর্থক দল সে কথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না তারা স্বোয়ানকেই প্রথম আবিষ্কতার সম্মানে ভূষিত করতে চায়।

শেষে ছুই সমর্থক দলের মধ্যে তর্কাতর্কি এমন কি হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। কেউ কেউ এই নিয়ে মামলা দায়ের করতে ছুটল। এডিসন দেখলেন, ব্যাপারটা ভয়ানক বিশ্রী অবস্থায় এসে যাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন জোসেফ স্বোয়ানের কাছে। ইচ্ছা এই নিয়ে একটা আপোষ করেন তিনি।

জোসেফও ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করেননি। এডিসন আসতেই মীমাংসা করতে রাজী হয়ে গেলেন। প্রস্তাবটা এডিসনই করলেন। বললেন "আমরা ছুজনে যখন একরকম একই সময়ে এবং একই জিনিস আবিষ্কার করেছি, তখন বাতির নাম আমাদের উভয়ের নামকরণ করা হোক।"

আপত্তি করলেন না জোসেফ উইল স্বোয়ান। উভয় আবিষ্কারকে নামানুসারে করা। বাতিটির নাম হল "এডি স্বোয়ান ল্যাম্প।"

বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুতির আদি পর্ব এইভাবে সমাপ্ত হয়েছিল। যদিও পরবর্তীকালের বিভিন্ন আবিষ্কারকের হাতে পড়ে বাতির চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

॥ শব্দোত্তর তরঙ্গ ॥

স্থির জলাশয়ে যদি একটুকরা ইটকে নিক্ষেপ করা যায় তাহলে জলাশয়ের জলে ঢেউ উঠবে এবং সেই ঢেউ চক্রাকারে এগিয়ে যাবে তীরের দিকে। সেই সময় পুকুরে যদি এক টুকরা শোলাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ঢেউগুলো এগিয়ে যাওয়ার সময় সোলাটা এগিয়ে যাবে না। সে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অবস্থান করে উপরে নীচে ওঠানামা করে নাচতে থাকবে মাত্র।

আমাদের চারিদিকে অদৃশ্য বায়ুসমুদ্র। কোথাও কোন শব্দ সৃষ্টি হলে সেই শব্দ বায়ু সমুদ্রে কম্পন তোলে। সেই কম্পনটা আবার তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, কিন্তু বায়ুর কোন স্থান পরিবর্তন হয়না। পুকুরের ঢেউগুলো যেমন একটু দূরে গেলে ক্ষীণ হয়ে যায় তেমনই শব্দ তরঙ্গ যত দূরে যাবে ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা শব্দ কোন মাধ্যম ছাড়া চলাচল করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সূর্যে সব সময় চলছে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণ। কিন্তু পৃথিবী থেকে কয়েকশ মাইল উপরে বায়ুমণ্ডল শেষ হয়ে গেছে বলে বিস্ফোরণের শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছে না। যদি সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত গোটাটা বায়ুস্তব থাকত তাহলে বিস্ফোরণের শব্দ আমরা শুনতে পেতামই। মাধ্যম ছাড়া শব্দ যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না সে পরীক্ষা আমরা পরীক্ষাগারে হাতে নাতে করে দেখতেও পারি। সে সব কথা অপ্রাসঙ্গিক বলে এখানে বর্ণনা করা হল না।

শব্দের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকালেই গবেষণা হয়েছিল। কারও কারও মতে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ

পিথাগোরস এবং অ্যারিষ্টটলের হাতেই শব্দ বিজ্ঞানের সূচনা। তাঁদের পরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং নিউটন শব্দ তরঙ্গ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা করেন। এঁদের মধ্যে আবার মহামতি নিউটন বায়ু বা অন্য কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শব্দ যাতায়াত করলে তাপমাত্রা, ঘনত্ব, আর্দ্রতা এবং চাপের ফলে শব্দের কী ভাবে পরিবর্তন ঘটে সে বিষয়ে গণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সত্য কথা বলতে কী, নিউটনের আগে শব্দ বিজ্ঞানকে নিয়ে এত ভালভাবে গবেষণা হয়নি। তিনিই প্রথম শোনালেন শব্দ একপ্রকার শক্তি। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় যে কোন মাধ্যম দিয়ে সে যেতে পারে কিন্তু শূন্য মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

যে সব আমাদের কর্ণগোচর হয় তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিয়ে গেছেন নিউটন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল, কম্পন ছাড়া শব্দ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার কোন বস্তুর কম্পাঙ্ক (বস্তুটি এক সেকেণ্ডে যত বার কাঁপে) যদি ১৬-এর কম এবং ১৬০০০-এর বেশী হয় (কারও কারও মতে ২০-র কম এবং ২০০০০-এর বেশী) তাহলে সে শব্দ আমরা শুনতে পাব না। ১৬-র কম কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ।

যেহেতু শব্দ একপ্রকার শক্তি এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, যে শব্দের যত বেশী কম্পাঙ্ক সে শব্দের শক্তি তত বেশী। তাই শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেশী হওয়ার জন্য ওর শক্তিও প্রচণ্ড। বিশেষজ্ঞরা একটা উদাহরণ দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, একটা সাইরেন ক্রমাগত একশ' বছর ধরে যদি ভোঁ ভোঁ করে বাজতে থাকে তাহলে তার শব্দ থেকে যেটুকু শক্তি সংগ্রহ করা যাবে তা দিয়ে হয়ত একবাটি জলকে কেবলমাত্র গরম করা যেতে পারে। কিন্তু কোন যন্ত্রের দ্বারা যদি শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায় তাহলে তার শক্তি প্রয়োগ করে মাত্র পাঁচ মিনিটেই জলকে ফোটাতে পারা যাবে। এত শক্তিধর এই শব্দোত্তর তরঙ্গ।

আজ দিকে দিকে দেখি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কত অসাধ্য সাধন

করছে মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সে আজ অপরাজেয়। কিন্তু কেমন করে মানুষ সংগ্রহ করল এত হাতিয়ার।

সত্য কথা বলতে কী, মানুষের অসাধ্য সাধনের মূলে আছে একটা বড় হাতিয়ার। সেটির নাম শব্দোত্তর তরঙ্গ। আধুনিক বিজ্ঞানের মস্ত বড় অবদান। টেলিভিশন, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, বেতার থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের বুকে সঙ্কেত পাঠান, সমুদ্রের তলদেশে সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়, মাটির নীচে খনিজ পদার্থের সন্ধান প্রভৃতি নানা কাজে আজকাল মানুষ নিয়োগ করতে আরম্ভ করেছে শব্দোত্তর তরঙ্গকে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই তরঙ্গের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্রে এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে শব্দোত্তর তরঙ্গকে। আজকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও ব্যবহার করা হচ্ছে এই তরঙ্গ। ধাতু নির্মিত বড় বড় এবং ভারি পাতসমূহে অথবা রবারের টায়ারে কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা নির্ণয় করা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গকে পাঠিয়ে। ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রোপ্লেটিং, কাপড় পরিষ্কার করা, কাপড় এবং সুতো রং করা প্রভৃতি হরেক রকমের কাজে এখন ডাক পড়েছে শব্দোত্তর তরঙ্গের। এই তরঙ্গের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতালে ব্যবহৃত অপারেশনের সাজসরঞ্জাম পরিষ্কার করা হচ্ছে। সমুদ্রের নীচে কয়লার স্তর অনুসন্ধানের শব্দোত্তর তরঙ্গ ছাড়া উপায় নেই। ভিজে জিনিস শুকনোর কাজে এই তরঙ্গকে ব্যবহার করে বেশ সুফল পাওয়া যায়। কাঁচ শিল্পে ও নানা রাসায়নিক শিল্পে এর ব্যবহার ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

আরও ব্যবহার আছে শব্দোত্তর তরঙ্গের। এই তরঙ্গ সমুদ্রের জলের মধ্যে প্রেরণ করে বুঝে নেওয়া হয় তলদেশে কোথাও পাহাড় নিমজ্জিত আছে কিনা। গভীর সমুদ্রে মাছের অবস্থান নির্ণয় করা হচ্ছে আর ব্যবহৃত হচ্ছে জলকে জীবাণু শূন্য করতে! এক কথায় এত ব্যাপক এই তরঙ্গের ব্যবহার যে দু এক কথায় বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এই তরঙ্গের ব্যবহার এত ব্যাপক হয়ে উঠেনি। অদূর

ভবিষ্যতে এই তরঙ্গ আরও কত কাজে যে ব্যবহার করা হবে তা এখন থেকে বলা খুবই কষ্টসাধ্য।

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহারের কথাই শুধু বলা হল, এবার এই তরঙ্গকে কেমন করে উৎপাদন করা হয় সেই প্রসঙ্গে আসা হচ্ছে। যে যন্ত্রটির সাহায্যে এই তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয় তার নাম "ইলেকট্রিক অসিলেটর।" প্রথমে এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৬০০০ বা তারও বেশী কম্পাঙ্ক উৎপাদন করা হয়। এক জাতীয় কেলাস আছে, যেগুলির বিপরীত তলে বৈদ্যুতিক বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করলে ওদের আকারের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। কোয়ার্টজ এই জাতীয় একটি কেলাস। বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই কেলাসের আকার পরিবর্তিত হয়। আবার বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে যদি কম্পন সৃষ্টি করা হয় তাহলে কেলাসের মধ্যেও সৃষ্টি হবে কম্পন। আরও মজার কথা, ইলেকট্রিক অসিলেটরে বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট কম্পাঙ্ক কেলাসের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলে কেলাসের কম্পাঙ্কও সমান হবে। এই কেলাসকে ইংরেজীতে বলা হয় ট্রানসডিউসার (Transducer)। এক কথায় বলা যেতে পারে, ইলেকট্রিক অসিলেটরে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয় এবং সেই তরঙ্গকে ট্রানসডিউসারের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর যখন সেই ট্রানসডিউসারকে কোন মাধ্যমের কাছে রাখা হয় তখন তার কম্পনের ফলে মাধ্যমের মধ্যে সেকেণ্ডে ১৬০০০ ও বেশী কম্পনের একটা তরঙ্গ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

॥ সাইক্লোট্রোন ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক।

পৃথিবীর মানুষ সবেমাত্র বুঝতে আরম্ভ করেছে পরমাণু হচ্ছে পদার্থের মৌলিক কণিকা। তাকে ভাঙ্গা যায় না আবার গড়াও যায় না। এক কথায় পদার্থের অন্তিম ও অবিভাজ্য কণা এই পরমাণু।

ইংরাজী ১৮৯৬ সাল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেল দেখতে পেলেন, ইউরেনিয়াম ঘটিত লবণ থেকে এক ধরণের অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় এবং ঐ রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে আক্রমণ করে। এই রশ্মির এমন বৈশিষ্ট্য যে, উত্তপ্ত অথবা শীতল অবস্থায়, বায়ুশূন্য পরিবেশে অথবা অধিক বায়ুর চাপে, আলোকে অথবা অন্ধকারে, সর্বাবস্থায় একই হারে নির্গত হয়। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই রশ্মির নামকরণ করা হল বেকারেল রশ্মি।

একদিন ইউরেনিয়ামকে তার লবণ থেকে পৃথক করা হল। ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুরি দম্পতি আবিষ্কার করলেন আরও দুটি তেজস্ক্রিয় মৌল পোলোনিয়াম এবং রেডিয়াম তাদের নাম। এই দুটি মৌল আবার ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অধিক তেজস্ক্রিয়।

বিজ্ঞানীদের এবার ভাববার পালা। কেন এই সব পদার্থ থেকে অবিরাম এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়? এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মিকে শক্তিশালী চৌম্বক বা তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে দেখলেন, রশ্মির একাংশ চৌম্বক ক্ষেত্রের একদিকে সামান্য বেঁকে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখলেন এই রশ্মিগুলি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত। অপর অংশ ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত রশ্মি বেঁকে গেল বিপরীত দিকে। অবশিষ্ট নিস্তড়িৎ রশ্মি কোন দিকে না বেঁকে সোজা এগিয়ে গেল। রাদারফোর্ড রশ্মিগুলির নাম দিলেন আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি গামা রশ্মি।

পরীক্ষার সাহায্যে ধরা পড়ল ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত আলফা রশ্মি কতকগুলি পদার্থ কণার সমবায়ে গঠিত। এক একটি আলফা কণার ভর প্রোটনের ভরের চার গুণ কিন্তু তড়িৎ মাত্রা প্রোটনের দ্বিগুণ। হিলিয়াম পরমাণু থেকে ইলেকট্রন অপসারিত করলে যে হিলিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় আলফা কণা তা থেকে একেবারে অভিন্ন। আর এই কণার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের দশ ভাগের এক ভাগ।

বিটা রশ্মিকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তড়িৎ ঋণাত্মক এই রশ্মি ইলেকট্রনের সমষ্টি মাত্র, বিটা কণিকার গতিবেগ আলফা কণিকার চেয়ে বেশী। তড়িৎ নিরপেক্ষ গামা কণিকা পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউট্রন কণিকা।

এতদিনে পরিবর্তিত হল বিজ্ঞানীদের পরমাণু সম্বন্ধে আগেকার ধারণা। দলে দলে বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে তাঁদের পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত থেকে জানা গেল, প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রক। কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন এবং আরও কতকগুলি কণিকা পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং কেন্দ্রকের চারপাশে আবর্তনরত ইলেকট্রন মহল।

ইংরাজী ১৯১৯ সাল। ঐদিন এক নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করলেন পরমাণু বিজ্ঞানের জনক রাদারফোর্ড। প্রমাণ করলেন, ইউরেনিয়াম রেডিয়াম প্রভৃতি স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে নির্গত আলফা কণা দিয়ে কোন স্থায়ী মৌলের কেন্দ্রককে আঘাত করলে মৌলটির কেন্দ্রক পরিবর্তিত হয়।

ঘটনাটি অতি সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে পরমাণু বিজ্ঞানে বিরাট বিপ্লব উদ্ঘাটিত হল, পরমাণুর অপরিমেয় শক্তির-কথা। মানুষ এবার পরমাণুকে নিয়োগ করল ধ্বংসাত্মক ও সৃজনাত্মক উভয় ধরণের কাজে। তাই রাদারফোর্ডের এই আবিষ্কারকে একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলা যেতে পারে এবং এই আবিষ্কারটি হচ্ছে সাইক্লোট্রোন যন্ত্র উদ্ভবের মূল কারণ।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ-গুলিই সবই অস্থায়ী। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে করতে একদিন তারা সাধারণ সীসার মত স্থায়ী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তার উপর তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলো প্রকৃতিতে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তার পরিমাণও নিতান্ত কম। এই সব কারণে বিজ্ঞানীরা রাদারফোর্ডের পরীক্ষাটিকে ভিত্তি করে কৃত্রিম ভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করতে আগ্রহী

হয়ে উঠেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পরমাণু বিজ্ঞানীদের ধারণা হল, আলফা কণার পরিবর্তে প্রোটনকে দিয়ে পরমাণু কেন্দ্রকে আঘাত করলেও বহু নতুন তথ্য জানা যেতে পারে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে কেবলমাত্র প্রোটন ? যে সমস্ত স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায় তাদের ভেতর থেকে তিন রকমের কণাই নির্গত হয়। কেবলমাত্র প্রোটন নির্গত হয় এমন মৌলিক পদার্থ তো জানা নেই। সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন, কৃত্রিম কোন একটা উপায় প্রোটনকে ত্বরিত করা যেতে পারে। তখনই কল্পনা করা হল ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসিলারেটারের।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। বিজ্ঞানীদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন বিজ্ঞানী আর্নেস্টলরেন্স। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার বার্কবে গবেষণাগার থেকে লরেন্স ঘোষণা করলেন, তিনি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে প্রোটনকে ত্বরিত করা যায়। সেই যন্ত্রটির নাম সাইক্লোট্রোন। তুমুল সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে।

আর্নেস্ট লরেন্সের আগে 'কক্‌ক্রফট ও 'ওয়ালটন' নামে দু'জন বিজ্ঞানী "কাসকেড জেনারেটার" নামে এক ধরণের যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সে যন্ত্রের অসুবিধা ছিল অনেক। তাছাড়া প্রোটনকে দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রকে বিক্রিয়া ঘটান তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে যে আলফা কণা নির্গত হয় তার শক্তি খুবই সামান্যই। কিন্তু কেন্দ্রকে বিক্রিয়া ঘটাতে হলে শক্তিটা দরকার হয় কয়েক কোটি ভোল্টের মত। আরও একটা সমস্যা, এত উচ্চ বিভব ধারণ করার মত অপরিবাহী মাধ্যমই বা কোথায় ? শেষ পর্যন্ত এই সমস্যাগুলি বড় বড ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা হয় দাঁড়িয়েছিল। এই সব সমস্যাগুলির সমাধান করে আর্নেস্ট লরেন্সই আবিষ্কার করেন সাইক্লোট্রোন যন্ত্র।

আজকাল এই যন্ত্রের উন্নতি হয়েছে অনেকখানি। এখন কেবলমাত্র প্রোটন কণিকাকে ত্বরান্বিত করা হয় না। অপরাপর কণিকাকেও ত্বরান্বিত করা হয়। কেবল সাইক্লোট্রোন যন্ত্র নয়, এই ধরণের আরও বহু যন্ত্র

আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সব যন্ত্রই লরেন্সের তৈরি সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের মত আর নেই। যন্ত্রটির উন্নতি সাধন হতে হতে এক অতিকায় এবং অতীব ভারী যন্ত্রের রূপ নিয়েছে। ভারী শিল্প ছাড়া এই যন্ত্র আর তৈরি করা সম্ভব নয়।

ভারতের পরমাণু গবেষণাগারগুলিতেও এই জাতীয় যন্ত্র আছে।

॥ কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ ॥

তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলতে সেই সব পদার্থকে বোঝায়, যেগুলি থেকে সর্ব অবস্থায় অবিরত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক ধরণের অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। এদের প্রকৃতিতে পাওয়া যায় অতি সামান্যই এবং এরা অত্যন্ত ভারী মৌল। তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে ইউরেনিয়াম, পোলোনিয়াম এবং রেডিয়ামের কথা। এদের পাওয়া যায় পিচ ব্লেণ্ড নামে এক প্রকার খনিজ থেকে। দেখা গেছে, ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয়।

পূর্বে আরও বলা হয়েছে রেডিয়ামের আবিষ্কর্তা কুরি দম্পতি অর্থাৎ পিয়েরে কুরি এবং মাদাম কুরি। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে বহু তথ্যও প্রদান করেছিলেন তাঁরা। তবে তাঁদের ধারণা ছিল, এই সব মৌলিক পদার্থকে কিছুতেই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা যায় না। অতি অল্প পরিমাণে প্রকৃতিতে অবস্থান করে মাত্র। কেবল কুরি দম্পতি নন, সেদিনের সব পরমাণু বিজ্ঞানীদেরই এই মত ছিল। কিন্তু এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ওলট পালট করে দিলেন এই কুরিদেরই কন্যা এবং জামাতা আইরিন কুরি ও ফ্রেডারিক জুলিও।

এঁরা দুজনেই একসঙ্গে গবেষণা করতেন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থকে নিয়ে। তাঁরা বুঝতে পারলেন, যে সব মৌলিক পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়, তারা রশ্মি বিতরণ করতে করতে একদিন অতি সাধারণ

একটা ধাতুতে পরিণত হয়। যেমন, রেডিয়াম পরিণামে সীসাতে পরিণত হয়। তখন তার ভেতর থেকে রশ্মি নির্গমন হয় না। এমনকি এটি যে এককালে রেডিয়াম ছিল সেটুকুও সাধারণভাবে বোঝার কোন উপায় থাকে না। একটুখানি তফাৎ অবশ্য থাকে। সেটির স্বাভাবিক সীসা অপেক্ষা পারমাণবিক ওজন একটু বেশী।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই বৈশিষ্ট্যটুকু দেখে আইরিন এবং জুলিও ভাবতে আরম্ভ করলেন, তেজস্ক্রিয় মৌল যদি স্থায়ী মৌলে পরিণত হতে পারে তাহলে স্থায়ী মৌলগুলিকে কেনই বা তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত করা যাবে না?

আরম্ভ হল কঠোর সাধনা। গবেষণা পাগল ছিলেন এঁরাও। রাতদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকেন গবেষণাগারে আর রাজ্যের যত বাজে জিনিসকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। এত প্রচণ্ড পরিশ্রম ব্যর্থ হল না তাঁদের। একদিন আপন চিন্তাধারাকে রূপ দিলেন বাস্তবে। জয় জয়কার পড়ে গেল আইরিন ও জুলিওর। তাঁদের মহৎ অবদানের জন্য তাঁরা ভূষিত হলেন নোবেল পুরস্কারে। জগৎ বিস্মিত হল প্রতিভাময়ী আইরিনের কৃতিত্ব দেখে। পিতামাতার সুযোগ্যা কন্যাই বটে!

কুরিদের আবিষ্কৃত রেডিয়ামকে দেখে মানুষ শিউরে উঠেছিল। তাদের সামনে প্রকট হয়েছিল পরমাণু শক্তির ভয়াবহ ও বীভৎস রূপটি। এবার তাঁদেরই কন্যা জামাতার আবিষ্কারের পর দেখতে পেল এর কল্যাণকর রূপটা। আইরিন এবং ফ্রেডারিক জুলিও প্রমাণ করেন কোন স্থায়ী মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রকে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করলে সেটি অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়।

তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের স্বল্পতা হেতু এখন স্থায়ী মৌলগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরী করা হচ্ছে। সাধারণতঃ পারমাণবিক চুল্লীতেই এই ক্রিয়া ঘটান হয়ে থাকে। সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের দ্বারা কোন মৌলিক পদার্থের মধ্যে আলফা কণিকার স্রোত প্রবাহিত করে উৎপন্ন করা হয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তবে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয়

পদার্থের পরিমাণ অতি অল্প এবং খরচও পড়ে খুব বেশী। তাই পারমাণবিক চুল্লীতেই এগুলি তৈরী করা হয় বেশী পরিমাণে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরীর একটা উদাহরণ দিলেই ভাল ভাবে বোঝা যাবে। ধরা যাক অ্যালুমিনিয়ামের কথা। এটি একটি স্থায়ী মৌল এবং এর পারমাণবিক গুরুত্ব ২৭। পারমাণবিক গুরুত্ব ২৭ হওয়ার কারণ, অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকে ১৩টি প্রোটন ও ১৪টি নিউট্রন। আমরা জানি নিউট্রন নিস্তড়িৎ কণা। এরা পরমাণুর ওজন বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন ধর্মের পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। কিন্তু প্রোটন কণা বৃদ্ধি হলে পরমাণুর ধর্মের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন যদি অ্যালুমিনিয়ামকে ক্রমাগত আলফা কণা দিয়ে আঘাত করা যায় তাহলে উৎপন্ন হবে ৩০ পারমাণবিক ওজনের একটি মৌল, যার পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থান করবে ১৫টি প্রোটন এবং ১৫টি নিউট্রন।

কেন্দ্রকে ১৫টি প্রোটন থাকে এমন একটি মৌলিক পদার্থ আমাদের জানা আছে। সেটির নাম ফসফরাস। যদিও স্বাভাবিক ফসফরাসের কেন্দ্রকে ১৫টি প্রোটন এবং নিউট্রন থাকার জন্য ওর পারমাণবিক গুরুত্ব ৩১। ৩০ পারমাণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থটিতে নিউট্রনের সংখ্যা একটি কম হলেও সেটি ফসফরাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত ফসফরাস ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ১৫ মিনিটেই উবে যায়। এবং উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণ করে তেজরশ্মি। তারপর একসময়ে পরিবর্তিত হয় অপর এক মৌল সিলিকনে।

আজকের দিনে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের চাহিদা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। কার্বন, ফসফরাস, সোডিয়াম, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বহু মৌলকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল হিসাবে। এই সব মৌল শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে বেশী। মস্তিষ্কের টিউমারে ক্যান্সারে, রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে এখন বড় হাতিয়ার হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলি। এককালে যে সব রোগ ছিল একেবারে দুরারোগ্য। এখন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারের ফলে আয়ত্তে এসেছে।

উদ্ভিদ বিদ্যায় তেজস্ক্রিয় কার্বনের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধাতু ও রাসায়নিক শিল্পে, খনিজ তেল অনুসন্ধান কাজে এখন এদের ভূমিকা যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে আরও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং মানুষের কল্যাণে তা আরও নিয়োজিত হবে।

সুখের কথা, ভারতেও প্রস্তুত হচ্ছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণাগার। দু'শ'এরও বেশী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী হয় সেখানে।

॥ আলকাতরার কথা ॥

খনি থেকে উত্তোলিত কয়লায় নানাবিধ অশুদ্ধি থাকে। জ্বালানীর কাজে ঐ কয়লাকে ব্যবহার করতে হলে তাকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু পোড়ানোর সময় উৎপন্ন হয় প্রচুর গ্যাস। একবার জন ক্লেট্যান এবং রবার্ট বয়েল নামে দুজন বিজ্ঞানী ঐ গ্যাসটির পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

ইংরাজী ১৬৬০ সাল। দু'জন বিজ্ঞানীই কয়লা পোড়ানোর ফলে গ্যাসকে একটি নলের ভেতর দিয়ে চালিত করে ঠাণ্ডা করলেন। অবাক হলেন নলের ভেতরে এক রকম বিশ্রী এবং কুচকুচে কালো তরল পদার্থকে জমতে দেখে। তরলটি বেশ দুর্গন্ধযুক্তও। তবুও তারা এর প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে ক্লেট্যান এবং বয়েলের তৈরী সেই কালো তরলটার কথা বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে বিজ্ঞানী হরেক রকমের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলেন গবেষণা করতে। শেষে ডবলিউ এইচ পারকিন নামে এক বিজ্ঞানী তরলটির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করতে সক্ষম হলেন এবং ঐ

বস্তুটির নানাবিধ গুণের কথা উল্লেখ করলেন।

ঐ তরলটির নাম আলকাতরা। সাধারণতঃ অগ্নিসহ মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত কতগুলো আবদ্ধবক যন্ত্রের বিটুমিনাস কয়লার গুঁড়াকে প্রডিউসার গ্যাসের সাহায্যে ১০০০°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। বায়ুহীন পরিবেশে উত্তপ্ত করে কয়লাকে উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী এই দুই অংশে পৃথক করে নেওয়া হয় বলে এই পাতনের নাম অন্তর্ধূম পাতন। পাতনের ফলে উৎপন্ন উদ্বায়ী গ্যাসীয় পদার্থগুলি বাঁকান লোহার নলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। তারপর গ্যাসগুলিকে আংশিক জলপূর্ণ একটি পাত্রে প্রবেশ করান হয়। সেখানে ঠাণ্ডা পেয়ে গ্যাস থেকে আলকাতরা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ট্যাঙ্কে জমা হয়।

আলকাতরা কালো দুর্গন্ধযুক্ত চটচটে এক ধরণের তরল। আগে সবার ধারণা ছিল এটি একটি অত্যন্ত বাজে জিনিস। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কোন কিছু তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। যত তুচ্ছ হোক না কেন এঁরা সযত্নে তুলে রাখেন এবং তুচ্ছের ভেতরে মূল্যবান পদার্থের সন্ধান লাভ করেন।

হলও তাই। পার্কিনের গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা লেগে পড়লেন আলকাতরার পাতন করতে। অবাক হলেন তাঁরা। দেখলেন তথাকথিত ঐ বাজে জিনিস আলকাতরার মত মূল্যবান পদার্থ খুব কমই আছে। অচিরে বুঝতে পারলেন বিজ্ঞানীরা, আলকাতরায় যে সমস্ত পদার্থ আছে তাদের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। অর্থাৎ আলকাতরায় অবস্থিত সব তরল একই তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয় না। কোনটি ১৫০° সেন্টিগ্রেডে, কোনটি ২৫০° সেন্টিগ্রেড, কোনটি বা আরও উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটতে আরম্ভ করে। অতএব বলা যেতে পারে আলকাতরা বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের কতকগুলি তরল পদার্থের মিশ্রণ ?

বিজ্ঞানীরা এই সুযোগকে পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন আংশিক পাতন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। আলকাতরার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হল না। ১৭০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উষ্ণতায় পাতিত করতে পাওয়া গেল লঘু তেল, ১৭০° সে. থেকে ২৩০° সে. উষ্ণতায় মধ্যম তেল বা কার্বলিক তেল, ২৩০° সে.

থেকে ২৭০° সে. উষ্ণতায় ভারী তেল বা ক্রিয়োজোট তেল, ২৭০° সে. থেকে ৩ ০° সে. উষ্ণতায় সবুজ তেল বা অ্যানথ্রাসিন তেল। অবশিষ্ট রূপে পড়ে থাকে কেবলমাত্র পিচ।

বিভিন্ন উষ্ণতায় পাতিত তরলগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেল লঘু তেলের উপাদান বেঞ্জিন, টলুইন এবং জাইলিন, মধ্যম তেলের উপাদান কার্বনিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন, ভারী তেলের উপাদান ক্রেসলস এবং সবুজ তেলের উপাদান অ্যানথাসিন, ফেনানথ্রিন প্রভৃতি।

এত সহজে এই সব মূল্যবান জিনিস পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে পারেন নি। বিশেষ করে আলকাতরা থেকে প্রাপ্ত লঘু তেল এবং মধ্যম তেল রাসায়নিক শিল্পে এনেছে একটা বড় আলোড়ন। বেঞ্জিন, টলুইন প্রভৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে মোটর গাড়ীর জ্বালানীরূপে ড্রাই ওয়াশে, ওষুধ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে। কার্বলিক অ্যাসিড এবং ন্যাপথালিন ব্যবহৃত হয় ওষুধ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে এবং প্লাস্টিক শিল্পে। অপরাপরগুলি ব্যবহার করা করা হয় রঞ্জক হিসাবে, কাঠ সংরক্ষণের কাজে, পিচ্ছিল-কারক তেল প্রস্তুতি প্রভৃতি বহু কাজে। অবশেষে হিসাবে যে পিচটি পাওয়া যায় তাকে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া পোকামাকড়ের হাত থেকে কাঠকে রক্ষা করার জন্য প্রলেপ দেওয়া লোহার উপর প্রলেপ দিয়ে মরিচা নিবারণ করা প্রভৃতি কাজ তো আছই।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রায় তিনশ রকমের জিনিস মেশানো থাকে আলকাতরার মধ্যে। ওকে এত বিশ্রী দেখাবার কারণ কার্বন পরমাণুগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মিশে থাকে। তবে আলকাতরাকে নিয়ে আজও বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিরাম নেই।

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সব দেশ আলকাতরাকে কাজে লাগিয়ে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন এ বিষয়ে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। ভারতে কয়লার পরিমাণ যদিও নেহাৎ কম নয় তবুও কয়লা থেকে প্রয়োজনানুযায়ী আলকাতরা উৎপাদন করা

হচ্ছে না। বৃটেন যেখানে বছরে দুই পঞ্চাশ লক্ষ টন আলকাতরা উৎপন্ন করে সেখানে ভারত উৎপন্ন করে পঞ্চাশ লক্ষ টনের মত। ভারতের তৈরি প্রায় সব আলকাতরাই ব্যয় হয় রাস্তা নির্মাণের কাজে। আলকাতরা থেকে মূল্যবান জিনিসগুলি তেমন আহরণ করা হচ্ছে না।

॥ লেসার রশ্মি ॥

আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল লেসার রশ্মির আবিষ্কার। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র বছর কুড়ি আগে। আবিষ্কর্তার নাম অধ্যাপক চার্লস এইচ টাউনেস। এই মহত্তর আবিষ্কারটির জন্য ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

লেসার রশ্মি আবিষ্কারের পর প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকার লিঙ্কন গবেষণাগার থেকে এই রশ্মি উৎপন্ন করে পৃথিবী থেকে দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার মাইল দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে আপতিত করা হয়েছিল। প্রতিফলিত রশ্মিকে দূরবীনের সাহায্যে প্রত্যেক্ষ করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। সময় লেগেছিল মাত্র আড়াই সেকেণ্ড। এতদূর পথ অতিক্রম করে ফিরে আর আসার ক্ষমতা কোন বৈদ্যতিক বাল্বের নেই। তাছাড়া সেদিন এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে মাপা হয়েছিল পৃথিবী থেকে চন্দ্রের প্রকৃত দূরত্ব।

লেসার পুরো নাম হচ্ছে Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. এতবড় শব্দগুচ্ছের সব সময় উচ্চারণ করা অসুবিধাজনক। তাই শব্দগুলির আদ্যক্ষর দিয়ে গঠন করা হয়েছে একটি বিশেষ শব্দ **LASER**। প্রকৃত পক্ষে লেসার একটি সংক্ষিপ্ত নাম ছাড়া কিছুই নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, লেসার রশ্মি সাধারণ আলোক রশ্মির ধর্মকে, মেনে চলে। "আলোর কনিকা মতবাদ" নামে যে বিশেষ মতবাদটি আছে

সেই মতবাদকেও মেনে চলে লেসারের তত্ব। তাছাড়া 'প্ল্যাঙ্ক' আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম থিওরীরও বিরুদ্ধাচরণ করে না।

এই কয়েক বছরেই অনেক রকমের লেসার আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম যেভাবে লেসার প্রস্তুত করা হয়েছিল সেই পদ্ধতিটিই সংক্ষেপে বলা হল। বিজ্ঞানী টি. এইচ. মেইম্যানই প্রথম লেসার তৈরীর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং প্রদর্শন করেছিলেন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। তাঁর প্রস্তুত লেসারটির নাম রুবি লেসার।

আমরা জানি, রুবি অ্যালুমিনিয়ামের একটি আকরিক। রত্নপাথর হিসাবেও রুবির ব্যবহার আছে। রুবি লেসার তৈরীর জন্য রুবির সঙ্গে অল্প স্বল্প ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করে একটা দণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছিল। নাম রুবি দণ্ড। দণ্ডটির ব্যাস খুবই কম করা হয়েছিল (৫ মিলিমিটারের মত), কিন্তু লম্বায় ছিল বেশ কয়েক সেন্টিমিটার। দণ্ডটিকে ব্যাস রাখা হয়েছিল একটা বড় কাচনলের মধ্যে এবং কাচনলের ভেতর থেকে বায়ুকে বের করে এনে বায়ুর পরিবর্তে জেনন নামে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পুরে দেওয়া হয়েছিল। তারপর দণ্ডসহ কাচনলের চারদিকে পরান হয়েছিল একটা জ্যাকেট। লেসার রশ্মি উৎপন্ন হলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় বলে অতি শীতল কোন তরল পদার্থকে প্রবাহিত করার জন্যই জ্যাকেটের ব্যবস্থা।

এবার বিদ্যুতের সাহায্যে আয়নিত করা হয়েছিল জেনন গ্যাস। তার ফলে সবুজ রঙের এক ঝলক আলো রুবি দণ্ডে আপতিত হল। এই অবস্থায় রুবির মধ্যস্থিত ক্রোমিয়ামের পরমাণুর উত্তেজিত হয়ে উচ্চস্তরের শক্তির সৃষ্টি করল। ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রনগুলো শক্তির উচ্চস্তর থেকে হঠাৎ নিম্নস্তরে ফিরে আসতে পারল না। ধাপে ধাপে নামতে হল তাদের। সর্বশেষ ধাপে যখন শক্তির নিম্নতর স্তরে ফিরে এল তখনই নির্গত হল লেসার রশ্মি।

আজকাল রুবির বদলে অন্য কঠিন পদার্থকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থও এই কাজের অনুপযোগী নয়।

লেসার রশ্মির খুবই উজ্জল । ইতোমধ্যে আমেরিকা এবং পশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলি এই রশ্মিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে চলেছে। বিশেষত জীবন বিজ্ঞানে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁরা এই রশ্মির ব্যবহার করে যথেষ্ট সুফল পাচ্ছেন । তাছাড়া পাশ্চাত্যের দেশসমুহ রেডার যন্ত্র, টেলি যোগাযোগ ব্যবহার করছে লেসার রশ্মিকে।

এই রশ্মির একটা খারাপ দিক আছে। এখান থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ কয়েক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় পার্থিব কোন জিনিস কঠিন কিংবা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এমন ভয়াবহ যার তাপশক্তি তাকে শক্তির অহঙ্কারী মানুষ ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহার করতে পারে।

তবে এর কল্যাণকর দিকটিও বড় কম নয়। এত প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করতে পারে বলে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে লেসার রশ্মিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখনই তো ব্যবহার করা হচ্ছে হীরক প্রভৃতি শক্ত পদার্থকে ছিদ্র করার কাজে কিংবা সূক্ষ্ম তারকে জোড়া লাগানোর কাজে। চিকিৎসকরা চক্ষুচিকিৎসার কাজেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন লেসার রশ্মিকে। চিকিৎসকদের বিশ্বাস, ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য লেসার রশ্মিকে ব্যবহার করা চলবে। পরীক্ষা করে তাঁরা দেখছেন, এই রশ্মি সুস্থ কোষের উপর কোন খারার প্রতিক্রিয়া করে না অথচ ক্যান্সারদুষ্ট কোষ সমূহকে নষ্ট করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা আরও আশা পোশণ করেন। তাঁদের ধারনা লেসার বেতার ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে উপযুক্ত লেন্সের সাহায্যে লেসার রশ্মিকে প্রয়োগ করলে যে প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যাবে, তাকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে বিস্তার কলকারখানা চালানো যাবে। ফলে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান ঘটবে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করে থাকেন, একটি মাত্র লেসার রশ্মির সাহায্যে হাজার হাজার টেলিভিশন এবং লক্ষ লক্ষ টেলিফোন চালানো যেতে পারে। জ্যোতি-

বিজ্ঞানীদের আশা মহাকাশের দূরবর্তী গ্রহনক্ষত্রাদির সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতে লেসারই হবে একমাত্র হাতিয়ার।

এ বিষয়ে ভারতবর্ষ কিন্তু পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন গবেগণারে এই রশ্মিকে নিয়ে বহুদিন থেকে গবেগণা চলেছে। ব্যাপকভাবে না হলেও ভারত কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে লেসার রশ্মিকে।

॥ বেতার তরঙ্গ ও বেতার বার্তা ॥

মহাকাশে সূর্যের মত এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের দেহের তাপমাত্রা হাজার হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এত প্রচণ্ড তাপমাত্রার জন্য প্রত্যেকটি নক্ষত্রপৃষ্ঠ সব সময় অশান্ত। সেখানে মুহুমুহুঃ উঠছে আগুনের ঝড়, চলেছে পারমাণবিক বিস্ফোরণ। অত্যধিক তাপমাত্রার জন্য সেখানে কোন বস্তু কঠিন কিংবা তরল অবস্থায় নেই।

প্রচণ্ড তাপমাত্রা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে নক্ষত্র পৃষ্ঠে অহরহ কতকগুলো শক্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সেই শক্তিগুলির সমষ্টির নাম বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তি। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান রশ্মিগুলি হল বেতার রশ্মি, তাপ রশ্মি, আলোক রশ্মি, অতি বেগুনি রশ্মি রঞ্জন রশ্মি এবং গামা রশ্মি। নক্ষত্র পৃষ্ঠের অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পূর্বোক্ত রশ্মিগুলির বিকিরণ হয়। রশ্মিগুলির কিছু কিছু পৃথিবী অভিমুখে ধাবিত হয়, বাকীগুলি অনন্ত মহাশূন্যে মিশে যায়।

পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে একটা ঘন আবহমণ্ডল। যে রশ্মিগুলি পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয় সেগুলির অধিকাংশই পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসতে পারে না। ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় সব রশ্মিকে আবহমণ্ডল শোষণ করে নেয়। বড় বড় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলি আবহমণ্ডলের সবচেয়ে উপরের

স্তর আয়ন মণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে মিশে যায়। কেবল অতি সামান্য অংশ মাত্র আয়নমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসে। যে রশ্মিগুলি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাদের মধ্যে বেতার তরঙ্গের কিছু অংশ এবং ধাবমান সমূহ আলোক তরঙ্গ।

বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির মধ্যে কেবলমাত্র তাপ ও আলোকিকে আমরা অনুভব করতে পারি, অপরাপরদের পরি না। আবার নক্ষত্র পৃষ্ঠ থেকে যখন এই রশ্মিসমূহ প্রবাহিত হয় তখন কোন মাধ্যমের সাহযে ব্যতীত একমাত্র বিকিরণেয় মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পৌছোয়। রশ্মিগুলি প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে। এই তরঙ্গগুলির যে কোন ছুটি চূড়ার মধ্যে যে দূরত্ব তাকেই বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

কিন্তু নক্ষত্র পৃষ্ঠ থেকে যে রশ্মিগুলি মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের সবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান নয়। কারও খুব বেশী কারও বা অতি নগন্য। বেশী যাদের তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত এবং কম যাদের তাদের দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটারের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত হয়। দেখা গেছে কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলিই বেশী শক্তিশালী।

বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির মধ্যে একমাত্র বেতার রশ্মির দৈর্ঘই বেশী এবং এই রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন বেতার রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কয়েক হাজার মিটার থেকে এক মিলিমিটার পর্যন্ত।

এই বেতার তরঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়ানস্কী নামে এক মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার কানে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে কী সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছিলন। হঠাৎ কানে এল এক ধরনের হিস্‌হিস্‌ শব্দ। একটু অবাক হলেন তিনি। কোথায় শব্দের কোন উৎস নেই, অথচ কোথা থেকে আসছে এই অদ্ভুত ধরণের আওয়াজ।

অবহেলা করলেন না ইয়ানস্কী। শব্দের উৎস স্থল খুঁজতে আরম্ভ

করলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন ভদ্রলোক। এবার ইয়ানস্কী বন্ধু বান্ধদের জানালেন ব্যাপারটা। তাঁরাও শুনে ভাবতে বসলেন. যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করলেন অনেক তবুও ব্যাখ্যা করতে পারলেন না কেউ। কথাটা ক্রমে বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল। "হিসহিস" শব্দটার পেছন নিযুক্ত হল শত শত প্রতিভা। সবাই এইটুকু কেবলই স্বীকার করলেন সেই শব্দটা পার্থিব কোন কিছু তথ্য কেউ প্রদান করতে পারলেন না। শেষে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল জানালেন, এই শব্দটি বহির্বিশ্ব থেকে আগত এক রকমের শক্তি তরঙ্গ। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী "হর্‌ৎস' শব্দটির উৎস স্থল খুঁজতে গিয়ে পরিচয় পেলেন বেতার তরঙ্গের।

ম্যাক্সওয়েল এবং হর্‌ৎস এর পরীক্ষা থেকে জানা গেল মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দেহ সব সময় উত্থিত হচ্ছে এক রকমের স্পন্দন। সেই স্পন্দন ঢেউ এর আকারে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের সর্বত্র। হর্‌ৎস আরও প্রমাণ করলেন এই তরঙ্গ এক রকমের শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শক্তির আলো এবং তাপ শক্তির সমগোত্রীয়। তবে তফাৎটা হচ্ছে আলো এবং তাপকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি কিন্তু এই শক্তি.ক ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারিনা এই অদৃশ্য তরঙ্গের নাম তখনই রাখা হয়েছিল বেতার তরঙ্গ।

দলে দলে বিজ্ঞানী এবার এগিয়ে এলেন বেতার তরঙ্গকে নিয়ে গবেষণা করতে। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা গেল মেঘে বিদ্যুৎ চমকের সময় তাপ ও আলোর সঙ্গে সঙ্গে বেতার তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র যে ভয়াবহ পারমাণবিক বিস্ফোরণ চলছে সেখান থেকেও আসছে বেতার তরঙ্গ। আরও প্রমাণিত হল, বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশী কিন্তু কম্পাঙ্ক কম। কম কম্পাঙ্কের জন্য এরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আলোক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক সবচেয়ে বেশী তাই তাদের চোখে দেখা যায়। তাপের কম্পাঙ্ক মাঝামাঝি ধরণের বলে তাপকে আমরা চোখে না দেখতে পেলেও ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি। বেতার তরঙ্গের খুব কম বলে ওকে

আমরা চোখে দেখতেও পাইনা বা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভবও করতে পারি না।

সেই সঙ্গে একটা আশার কথাও শোনালেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বললেন, এই তরঙ্গকে যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে ধরাও যেতে পারে। আর একটা নতুন কথা শোনালেন, এই তরঙ্গের উপর শব্দ কিংবা আলোর ছাপ ফেলে বহু দূরে চালান করা যেতে পারে।

বেতার তরঙ্গের পরবর্তী গুণের পরিচয় পেয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বড় রকমের সাড়া পড়ে গেল। তাঁদের ধারণা হল, এই তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে দূর দূরান্তরে খবর পাঠান যেতে পারে। কোন তারের সাহায্য লাগবে না একেবারে মুখের কথাকে সরাসরি চালান করা যাবে - কত মজা!

ততদিনে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আবিষ্কার করা হয় গেছে। তাহলেও এদের জন্য দরকার হয় তারের যোগাযোগ। দূরবর্তী ও দুর্গম স্থানগুলিতে তারের যোগাযোগ করা বড় অসুবিধা। তাছাড়া টেলিগ্রাফের মারফতে কতকগুলো সংকেত পাওয়া যায় মাত্র, মানুষের মুখের ভাষাকে শোনা যায় না।

সব দেশের বিজ্ঞানীরা বসে গেলে বেতার তরঙ্গকে নিয়ে গবেষণা করতে কে আগে পারে বিনা তারে শব্দ প্রেরণ করতে!

দিন যায়। বিনা তারে শব্দ প্রেরণ সম্ভব না হলেও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত বহু মূল্যবান তথ্যে সমৃদ্ধ হল বিজ্ঞান। পরিশেষে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি বিজ্ঞানীদের বহু দিনের প্রত্যাশাকে বাস্তবে রূপ দিলেন। পৃথিবীর মানুষ প্রথম জানতে পারল সেদিন, মার্কনি কোন তারের যোগাযোগ না করে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে মুখের কথা প্রেরণ করেছেন। জয় জয়কার পড়ে গেল মার্কনির মানুষ যেন হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারল না। মানুষের মুখের ভাষা এত দূরে প্রেরণ করলেন মার্কনি? এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার! সত্যই অসাধ্য সাধন করলেন মার্কনি।

তবে বিনা তারে শব্দ প্রেরণ একমাত্র মার্কনির দ্বারা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ দিনের বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনা মার্কনির হাতেই রূপ নিয়েছে। এই পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অবদানও খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেতার তরঙ্গকে নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। এমন কি বিনা তারে শব্দ প্রেরণের কৌশলও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর আবিষ্কারের কথা নানা অসুবিধার জন্য ঘোষণা করতে পারে নি। তাই পরে আবিষ্কার করেও যশোমাল্যে ভূষিত হয়েছেন মার্কনি। পরের দিকে বেতার তরঙ্গকে নিয়ে আরও গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার গবেষণাও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

বেতার তরঙ্গের কথা বলা হল এবার বেতারের কথায় আসা যাক। আজকের দিনে রেডিও সেটের সঙ্গে আমাদের প্রায় সবারই পরিচয় আছে। ঘরে বসে দেশ দেশান্তরের খবর শুনতে পাই, শুনতে পাই গান, বাজনা, নাটক, কথিকা, ভাষণ, আরও কত কী! রেডিও একদিকে শিক্ষার একটি মাধ্যম অপরদিকে অবসর বিনোদনের একটা বড় উপকরণ। কিন্তু বেতারের জন্ম লগ্নে এমনটি ছিল না। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনার ফলে আজকের আকাশবাণী। যদিও বেতারের উন্নতিকল্পে মার্কনিও সারা জীবন প্রাণপাত পরিশ্রমও করে গেছেন।

আকাশবাণী থেকে আমরা যা কিছু শুনতে পাই সেগুলো প্রচারের কোন না কোন কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রে থাকে প্রেরক যন্ত্র। যন্ত্রের দ্বারা প্রথমে সৃষ্টি করা হয় উচ্চ হারের তড়িৎ স্পন্দন—যা বেতার তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেরক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে আকাশতার বা এ্যারিয়াল। যে কথা, খবর, গান, বা বাজনাকে প্রচার করা হবে, তাকে আগে রেডিও ভাল্ব দ্বারা বিবর্ধিত করা হয়। তারপর সেই বিবর্ধিত শব্দ যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তির বা বেতার তরঙ্গের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া

হয়। অবশেষে এ্যারিয়াল সেই শক্তিকে তরঙ্গের আকারে চতুর্দিকে সঞ্চারিত করে।

আমরা জানি পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডলটা রয়েছে তার সবচেয়ে উপরের স্তরটাকে বলে আয়নমণ্ডল। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল উপরে এই স্তরটা বর্তমান। এত উচ্চে বলে সেখানে অত্যন্ত বিরলভাবে অবস্থান করছে গ্যাসীয় কণিকা। সূর্য থেকে আগত অতি বেগুনী প্রভৃতি রশ্মিগুলি গ্যাসীয় কণাগুলিকে সব সময় আয়নিত করছে। অর্থাৎ বিরলভাবে অবস্থানকারী অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর দেহ থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করছে। সেই কারণে উর্ধ্ব বায়ুস্তরে একটা তড়িৎ পরিবাহী স্তরের সৃষ্টি হয়েছে।

আকাশবাণীর কেন্দ্র থেকে যে বেতার তরঙ্গ পাঠান হয় সেটি আয়নমণ্ডলে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয় পৃথিবীপৃষ্ঠে। আমরা গ্রাহক যন্ত্রের দ্বারা সেই প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গকে ধরে থাকি এবং বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গের উপর ছাপ দেওয়া শব্দকে অবিকল শুনতে পাই।

বেতার তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গকে আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে কিছুটা সময় ব্যয় হয় সত্য। কিন্তু সে সময়টা এত নগন্য যে কোন সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল যন্ত্র ছাড়া পরিমাণ করা যায় না। সময়টা এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র।

আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল বিশ্বজগৎ ইথার নামে এক অদৃশ্য পদার্থে পূর্ণ। আলো, তাপ এবং বেতার তরঙ্গ ঈথারের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। বর্তমানে ঈথারের কল্পনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে।

॥ রেডার ॥

তখন বিশ্বমহাসাগর চলেছে পুরোদমে। শত্রুপক্ষীয় বোমারু বিমান এগিয়ে আসত ঝাঁকে ঝাঁকে আর সামরিক ঘাঁটি এবং সমৃদ্ধ জনপদগুলির উপর বেপরোয়াভাবে গুলি ও বোমাবর্ষণ করে নির্বিবাদে সরে পড়ত। ব্যাপারটা এমন অতর্কিতে ঘটে যেত যে কোনরকম সাবধান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত না। বিমান বিধ্বংসী কামান, ক্ষেপনাস্ত্র প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষও কম সাবধানতা অবলম্বন করত না। মারণাস্ত্রগুলোকে এড়িয়ে কৌশলে কাজ হাসিল করত! মিত্রপক্ষ আকাশে বিমান ওড়াত, আকাশ যুদ্ধ ও হত। তবে ক্ষয়ক্ষতি হত সবারই।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন দেশের নেতৃস্থানীয়রা। বড় বড় বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করলেন কোন একটা উপায় খুঁজে বার করবার জন্য।

অনেক ভাবলেন বিজ্ঞানীরা। হানাদারদের আক্রমণকে যেমন করে হোক রুখতে হবে। কিন্তু কোথায় পাবেন তেমন শক্তিশালী হাতিয়ার? হঠাৎ মনে পড়ল তাঁদের বেতার তরঙ্গের কথা। তাঁরা জানতেন, বেতার তরঙ্গ আলো কিংবা শব্দের মত প্রতিফলিত হয়। আরও জানতেন, পর্বত, বনভূমি, আকাশের মেঘ এমনকি বিমান গাত্রেও প্রতিফলিত হতে পারে। যন্ত্রের দ্বারা বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করে যদি শত্রুপক্ষীয় বিমানের গায়ে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই বিমানের দূরত্ব নির্ণয় করা যাবে।

ততদিনে বেতার প্রেরকযন্ত্র ও বেতার গ্রাহকযন্ত্রের আবিষ্কার হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের বিশেষ বেগ পেতে হল না! কেবল একটা যন্ত্র প্রয়োজন হয়ে পড়ল, যার দ্বারা বেতার তরঙ্গ সব সময় উৎপন্ন করে

আকাশ তারের সাহায্যে সঞ্চারিত করা যাবে এবং প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গকে সেইখানেই ধরা যাবে।

সে চেষ্টাও সফল হল বিজ্ঞানীদের। অচিরে আবিষ্কার করলেন রেডার নামে একটি যন্ত্র। তবে আরও একটা সমস্যা ছিল। সে সমস্যটা হচ্ছে দূরত্ব নির্ণয় করা। কোন শব্দকে প্রতিফলিত করে দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ। কারণ শব্দের বেগ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট মাত্র। সেক্ষেত্রে বেতার তরঙ্গের গতিবেগ সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অল্প সময়ে এত বেশী পথ অতিক্রম করে যে সময়টা নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানীরা এ সমস্যাটিরও সামধান করলেন। আবিষ্কার করলেন এক ধরণের বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র যার সাহায্যে আপনা হতেই সময়টা ধরা পড়ে গেল।

সময়ের দ্বারা দূরত্বটা কেমন করে মাপা হয় তার নমুনা দেওয়া হল। ধরা যাক যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গ একটা বিমানের গাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ড লাগল। বেতার তরঙ্গ $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ডে পরিভ্রমণ করল ১৮৬০ মাইল (১৮৬০০০ ÷ ১০০)। যেহেতু বেতার তরঙ্গকে একবার যেতে হয়েছে এবং পুনরায় ফিরে আসতেও হয়েছে। সুতরাং যাওয়া আসার দুটো পথের দৈর্ঘ সমান। তাই $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ড তাকে দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অতএব বিমানের দূরত্ব হবে ৯৩০ মাইল (১৮৩০ ÷ ২)।

আর একটা ছোট্ট অসুবিধাও ছিল। যে বিমানটা এগিয়ে আসবে তার একটা নির্দিষ্ট গতি থাকবে। তাকে ধ্বংস করতে হলে তার গতিবেগ না জানালে চলবে না। সে অসুবিধাটাও দূর করলেন বিজ্ঞানীরা স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে দূরত্বের সঙ্গে গতিবেগও নির্ণয় করলেন। আর কোন অসুবিধা হল না। ক্ষেপনাস্ত্র পাঠিয়ে ধ্বংস করা হতে লাগল শত্রুপক্ষীয় বিমানগুলিকে।

রেডারের কল্পনা করেছিলেন স্যার রবার্ট ওয়াটসন ওয়াট নামে

জনৈক বিজ্ঞানী। ১৯৩৫ সালে বিমান গাত্রে বেতার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করিয়ে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনার কথা তিনিই ঘোষণা করেছিলেন।

স্পষ্টই বোঝা গেল 'রেড়ার' যন্ত্রটি মহাযুদ্ধের অবদান। সেদিন ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল রেডারকে। পরিণামে সেই রেডার দেখা দিয়েছে মানুষের হিতৈষীরূপে। বিজ্ঞানের রাজ্যটাই অদ্ভুত এবং আশ্চর্য!

"রেডার" এই নামটিও একটা গোপন ইঙ্গিত বহন করছে। ওর পুরো নাম Radi Detecion And Ranging"। যুদ্ধের সময় বেতার তরঙ্গের সাহায্যে সামরিক বিভাগ আকাশে বিমান এবং শত্রুপক্ষীয় গোপন ঘাঁটিগুলির অনুসন্ধান কার্য চালাতো বলে এই ধরনের নামকরণ হয়েছিল। Radio Detection And Ranging-এর সংক্ষেপিত নাম " Radar"।

`রেডার নামে অভিহিত যন্ত্রটি কোন একটি বিশেষ যন্ত্র নয়। এটি কতকগুলি যন্ত্রের একটি বিন্যাস। যন্ত্রগুলির মধ্যে একটা বেতার প্রেরকযন্ত্র একটা বেতার গ্রাহক যন্ত্র, একটা আকাশ তার বা এ্যারিয়েল এবং একটি অসিলোস্কোপই প্রধান। বেতার প্রেরক যন্ত্র, থেকে বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় এবং সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় পুনরায় ধরা পড়ে এখানকার বেতার গ্রাহক যন্ত্রে। এইকারণে কিছুক্ষণ পর আকাশ তারের সাহায্যে বেতার ধ্বনি উৎক্ষিপ্ত করা হয় এবং সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি শোনার চেষ্টা করা হয়। এই সময়টা বেতার প্রেরকযন্ত্র থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠান হয় না কিছুক্ষণ বিরাম দেওয়া হয় বলে একই আকাশ তারকে শব্দ প্রেরণ ও শব্দ গ্রহণ উভয় কাজেই ব্যবহার করা হয়। তার জন্য থাকে ইলেকট্রিক সুইচের ব্যবস্থা।

আকাশ তারটির গঠনটা একটু বিশেষ ধরণের। অবতল একটা ফ্রেমে আকাশ তারটি জড়ান থাকে এবং সুইচ টিপলেই এদিকে ওদিকে ঘুরতে পারে। বেতার তরঙ্গ পাঠানোর সময় অবতল ফ্রেমটা একটা বিশেষ দিকে ঘুরতে পারে। প্রতিধ্বনি শোনার সময় আপনা হতেই

অন্যদিকে ঘুরে আসে।

বেতার প্রেরক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর একটি যন্ত্র। নাম তার অসিলোস্কোপ। আসলে আসিলোস্কোপ যন্ত্রটিকে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রই বলা যেতে পারে। এই যন্ত্রটির প্রথম কাজ হচ্ছে সময় ও দূরত্ব পরিমাপ করা। যখন বেতার ধ্বনি পাঠান হয় তখন যন্ত্রটির গায়ে একটা কাচের পর্দার উপর দীর্ঘ আলোক রেখা পড়ে। আবার যখন প্রতিধ্বনি ফিরে আসে তখন পর্দাটার উপর পূর্ব আলোক রেখা থেকে দূরে আর একটা খাটো আলোক রেখা দেখা যায়। এই আলোক রেখার ব্যবধানে নির্দেশ করে সময়ের পরিমাপ। সময় জানতে পারলেই পূর্বোক্ত উপায়ে দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। বস্তুটি যদি গতিশীল হয় তাহলেও ধরা পড়ে এই যন্ত্রে এবং তার গতিবেগও আপনা হতে নির্দেশ করে। রেডারে ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গে দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩ সেন্টিমিটার থেকে ৩০ সেন্টিমিটার।

আগেই বলা হয়েছে রেডারের উদ্ভাবন হয়েছে ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য। একদিন সত্যই মানুষ দেখেছিল ওর ধ্বংসাত্মক রূপ। আজ কিন্তু এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না রেডারকে। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এখন রেডার অপরিহার্য। দেশ রক্ষার কাছে রেডার না হলে একদণ্ডও চলবে না।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আজও মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেনি। মুখে আমরা যতটা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করি না কেন এক দেশ অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে তৎপর। সমুদ্রের মাঝখানে কোথাও লুকিয়ে রাখছে সাবমেরিন, কোথাও বা পরমাণু শক্তি চালিত বিরাট নৌবহর। কখনও কখনও এক দেশের বিমান আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে অপর দেশ ঢুকে পড়ে অভ্যন্তরীণ খবরাখবর সংগ্রহের জন্যও উৎসুক। দেশ রক্ষার কাজে রেডার না হলে চলে না।

নিজের দেশের জাহাজ ও বিমান শ্রেণীকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে ও রেডারের প্রয়োজন হয়। মাঝ সমুদ্রে অনেক সময় কুয়াশায়

দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে জাহাজ। তখন অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়াও অসম্ভব নয় এই অবস্থায় জাহাজে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় রেডার যন্ত্রের সাহায্যে।

অন্যান্য অসামরিক কাজেও রেডারকে ব্যবহার করা হয়। আবহতত্ত্ব-বিদের রেডার ছাড়া একদণ্ডও চলে না। দূরে সমুদ্রে কোথাও ঝড় কিংবা ঘূর্ণিবাত্যা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সে কথা রেডার আমাদের জানায় পূর্বাহ্নে। ঝড়ের উৎপত্তিস্থল এবং গতিবেগ উভয়ই নির্ণয় করা হয় রেডার যন্ত্রে। যেমন করে শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থান এবং গতিবেগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের কত যে উপকার হয়েছে সে কথা কে না জানে? সমুদ্র তীরবর্তী জনসাধারণ, সমুদ্রের মাঝিমাল্লা এবং বিমান বন্দর আবহাওয়ার সংকেত পেয়ে আগে থেকে সাবধান হয়ে যায়। যার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার জীবনহানি বন্ধ হয়েছে এবং বহু জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে।

জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরাও ব্যবহার করেছেন রেডারকে তাঁরা নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহাদির দূরত্ব নির্ণয় করেছেন রেডারের দ্বারা। আকাশে দৈনন্দিন উল্কাপাতের পরিমাণও জানাচ্ছে রেডার। এক কথায় মহাকাশের খবর সংগ্রহের কাজে রেডারের আছে প্রধান ভূমিকা।

বর্তমানে মানুষ আবার মহাকাশ পরিক্রমার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেছে। আকাশে প্রায়ই উৎক্ষিপ্ত করা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহকে। সেই সব উপগ্রহ ঠিক পথে চালিত হচ্ছে কিনা, পৃথিবীর মাটিতে বসে মানুষ এই রেডার থেকেই সংগ্রহ করছে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেও স্থাপন করা হয় রেডারকে। যার জন্য কেবল পৃথিবী নয় বহির্বিশ্বের নানাবিধ খবর আমরা ঘরে বসেই সংগ্রহ করতে পারছি।

স্বীকার করতে হবে যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে রেডার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। রেডার আবিষ্কৃত না হলে মহাকাশবিজ্ঞান

এতখানি সমৃদ্ধ হতে পারত না। মহাকাশ পরিক্রমায়ও দেখা যেত নানা বাধা বিপত্তি। ভবিষ্যতে রেডারের দ্বারা আরও বহু কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করেন বিজ্ঞানীরা।

॥ দূরবীন ॥

দূরবীনের আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক আগে। কারও কারও মতে লিপারশী নামে হল্যাণ্ডের এক চশমা প্রস্তুতকারকই দূরবীনের প্রকৃত আবিষ্কারক। তিনি ধাতু নির্মিত একটা সরল চোঙের তলায় লেন্স বসিয়ে ঠিক দূরবীন না হলেও দূরবীনের মত একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেটা ইংরাজী ৬০৮ সাল।

দু-বছর পরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬১০ সাল ইটালীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সেই চশমা প্রস্তুতকারক লিপারশীর যন্ত্রের অনুরূপ আর এক ধরণের দূরবীন তৈরী করলেন। এটিও ছিল ধাতু নির্মিত একটি সরল চোঙ তবে একটি লেন্সের বদলে দুটি লেন্স ব্যবহার করেছিলেন গ্যালিলিও। চোঙের তলায় যুক্ত করেছিল একটি বড় লেন্স এবং উপরে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আর একটি লেন্স।

সেদিন নিজের তৈরী দূরবীন নিজের চোখে লাগিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন গ্যালিলও। অবাক হয়েছিলেন নিজেই। অকল্পনীয় মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশের ছবি সেই প্রথম মানুষের চোখে ধরা পড়ল। গ্যালিলও কেবলমাত্র নিজে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ডেকে আনলেন বন্ধুবান্ধবদের। আকাশকে দেখে তাঁরা এমন আশ্চর্য বোধ করলেন যে, মনে করলেন গ্যালিলিও ম্যাজিক দেখাচ্ছেন।

গ্যালিলিওকে অনেক কষ্টে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, তিনি ম্যাজিক

দেখাচ্ছেন না। বন্ধুরা যা দেখছেন, সেইটিই আকাশের প্রকৃত খবর। তবুও গ্যালিলিওর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেননি কেউ।

গ্যালিলিওর পর অতিবাহিত হল কত শত শত বছর। বিজ্ঞানের পরিধিও বেড়ে চলল দ্রুত গতিতে। গ্যালিলিওর দূরবীন বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং শিল্পীদের হাতে নবরূপ পরিগ্রহ করল। এবং তাঁর অনুকরণে তৈরী হল আরও কয়েক রকমের দূরবীন। আজকের দিনে যে দূরবীন ব্যবহার করা হয়, সে দূরবীনের সঙ্গে গ্যালিলিওর দূরবীনের আকৃতিগতভাবে কোন মিল নেই। তবুও দূরবীনের প্রকৃত আবিষ্কারকরূপে গ্যালিলিও নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বর্তমানকালে দূরবীনকে ব্যবহার করা হয় আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য। এই দূরবীন দু ধরণের তৈরী করা হয়। এক ধরণের দূরবীনের নাম "প্রতিসরিত আলোর দূরবীন" দ্বিতীয় ধরনের নাম "প্রতিফলিত আলোর দূরবীন"। উভয় প্রকার দূরবীনে লেন্স লাগাতে হয়। তবে প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে ব্যবহার করা হয় উত্তল লেন্স এবং প্রতিফলিত আলোর দূরবীনে ব্যবহার করা হয় অবতল লেন্স।

লেন্স মাত্রেই কাচের তৈরী। উত্তল লেন্সই গোলাকার। উত্তল লেন্সর মাঝখানটা মোটা কিন্তু কিনারার দিকে ক্রমশঃ পাতলা হয়ে গেছে। অবতল লেন্সের বেলায় সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ কিনারার দিকটা বেশ মোটা ভেতরের দিকে ক্রমশঃ পাতলা। আমরা যে আতস কাচ ব্যবহার করি সেটি একটি উত্তল লেন্স। অবতল লেন্সকে কখনও কখনও চশমায় ব্যবহার করা হয়। অবতল লেন্স বেশ কয়েক ধরণের হয়ে থাকে। কারও এক পিঠ অবতল আর এক পিঠ সমতল, কারও বা দু' পিঠ অবতল, আর কারও কারও এক পিঠ উত্তল অপর পিঠ অবতল। প্রতিফলিত আলোর দূরবীনে যে অবতল লেন্সটি ব্যবহার করা হয় তার এক পাশ থাকে সমতল অপর পাশ অবতল মাত্র এই লেন্সটিকে আবার দর্পণ তৈরি করে নিতে হয়।

প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে একটা বড় লেন্স এবং একটা ছোট লেন্স

ব্যবহার করা হয়। দূরবীনের যে মুখে বড় লেন্স লাগান থাকে সেটিকে নির্দিষ্ট রাখতে হয় লক্ষ্য বস্তুর দিকে। তাই এই লেন্সটিকে বলে অবজেক্ট গ্লাস। আর দূরবীনের যে মুখে চোখ রেখে দেখতে হয়, সেখানে বসান থাকে ছোট লেন্সটি। এই লেন্সটিকে বলা হয় আই পিস। দূরবীনটি তৈরী হয় ধাতু নির্মিত একটা চোঙ দিয়ে। তবে প্রতিসরিত আলোর দূরবীন তৈরি করতে যথেষ্ট নিপুণতার প্রয়োজন। লেন্স দুটিকে এমনভাবে স্থাপন করতে হয় যেন উভয়ের ফোকাস একই বিন্দুতে মিলিত হয় এবং অক্ষদ্বয় একই সমতলে থাকে। এই জাতীয় দূরবীনে দূরের জিনিসকে অনেকটা কাছে দেখায় এবং ঐ কারণে কিছুটা বড় দেখায়। প্রতিসরিত আলোর দূরবীন চোখে লাগিয়ে আকাশের দিকে তাকালে গ্রহ উপগ্রহরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বড় দেখায়। কিন্তু নক্ষত্ররা অত্যধিক দূরে অবস্থান করার জন্য আদৌ বড় দেখায় না। তবে কিছুটা ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। এই দূরবীনকে প্রতিসরিত আলোর দূরবীন বলা হয় এই কারণে যে, এতে ব্যবহৃত লেন্স আলোর প্রতিসরণ ঘটে।

এই জাতীয় দূরবীনের অবজেক্ট গ্লাস বড় করে তৈরি করার অনেক অসুবিধা আছে। সেইজন্য আজ পর্যন্ত যত প্রতিসরিত আলোর দূরবীন তৈরী হয়েছে তাদের অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস তিন ইঞ্চি থেকে চল্লিশ ইঞ্চি পর্যন্ত। তৈরি করার একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে, এত বড় কাচখণ্ডকে ঢালাই করা। ঢালাই-র সময় যদি সামান্য একটু বুদবুদ থেকে যায় তাহলে সে লেন্সকে ব্যবহার করা যাবে না। বড় কাচ খণ্ড ঢালাই করতে গেলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বুদবুদ থেকে যায়।

প্রতিসরিত আলোর দূরবীনের মধ্যে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ের্কস মানমন্দিরের দূরবীনটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ দূরবীন। ঐ দূরবীনটির অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস ৪০ ইঞ্চি। অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস বেশী হলেই দূরবীন শক্তিশালী হয়। তার কারণ হচ্ছে, দূরে কোন

নক্ষত্রের আলো আমাদের চোখের মণিতে যতখানি পড়ে দূরবীনের অবজেক্ট গ্লাসে পড়ে তার চেয়ে শত গুণে বেশী। তাই দূরবীনের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে নক্ষত্রদের বেশী উজ্জ্বল দেখায় এবং গ্রহদের দেখায় বড়।

প্রতিফলিত আলোর দূরবীনের গঠন প্রণালী প্রায় একই ধরণের। এখানেও বড় ধাতব নলের দরকার হয় তবে অবজেক্ট গ্লাসটি উত্তল না হয়ে অবতল হয়ে অবতল হয়ে থাকে। উত্তল অপেক্ষা অবতল লেন্স তৈরি করার সুবিধা থাকায় এই দূরবীনের অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস বেশী। তবে এখানে অবতল লেন্সকে অবতল দর্পণে পরিণত করে ব্যবহার করা হয়।

অবতল দর্পণ তৈরির নিয়ম হচ্ছে. প্রথমে মাপ অনুযায়ী একটা বৃত্তাকার ও পুরু কাচখণ্ডকে ঢালাই করে নিতে হয়। তারপর কাচ খণ্ডটির একটা পিঠ ঘষে ঘষে অবতল করে নেওয়া হয়। ঘষার সময়ে সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয় যেন নিয়ম অনুযায়ী পুরু হয় অর্থাৎ পাশের দিকে থেকে কেন্দ্রের দিকে পাতলা হয়। কাথাও পাতলা কিংবা কোথাও পুরু, এ ধরণের হলে চললে না। তাছাড়া অপরাপর ত্রুটি তো আছেই।

অবতল কাচখণ্ড তৈরি করার পর অবতল পিঠের উপর রূপ অথবা অ্যালুনিনিয়ামের পাতলা আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তৈরি হয়ে যায় অবতল দর্পণ। আজ পর্যন্ত যত প্রতিফলিত আলোর দূরবীন তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দূরবীনটি হল মাউণ্ট প্যালোমারে রাখা ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনটি। ঐ দূরবীনটির সাহায্যে তু'শ কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রকেও পর্যবেক্ষণ করা যায়। শোনা যায় এটি তৈরি করতে বহু কুশলীশিল্পীর বিশ বছর সময় লেগেছিল।

আমেরিকার লিক মানমন্দিরে স্থাপতি দূরবীনটির পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দূরবীন। ঐ দূরবীনটির অবজেক্ট গ্যাসের ব্যাস ১২০ ইঞ্চি

সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়াও তৈরি করেছে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের অবজেক্ট গ্লাস যুক্ত আরও একটি বৃহত্তম প্রতিফলিত আলোর দূরবীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানমন্দিরেও আছে দূরবীন। তবে তাদের কোনটিই এত বড় নয়।

আজকাল বিভিন্ন দেশে প্রতিফলিত আলোর দূরবীনকে অবলম্বন করে প্রস্তুত করা হচ্ছে বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য দূরবীনের সঙ্গে বেতার তরঙ্গকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। রেড়ারের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার তরঙ্গ রেডার যন্ত্রের আকাশ তারে ধরা পড়ে। কিন্তু সে তরঙ্গ বড়ই দুর্বল। বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যে আকাশ তার ব্যবহার করা হয় সেটি তীক্ষ্ণ অনুভূতি সম্পন্ন। জ্যোতিষ্ক থেকে আগত আলোকরশ্মি দূরবীনের অবতল দর্পণে এসে পড়লে সমস্ত রশ্মি একত্রভাবে প্রতিফলিত হয়ে দর্পণে ফোকাস বিন্দুতে জড় হয়। একটি বিন্দুতে সব রষি সমবেত হওয়ার ফলে দুর্বল রশ্মিও শক্তিশালী হয়ে পড়ে। অপর দিকে জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বেতার অরঙ্গ প্রতিফলনের বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একটা অবতল আকাশতার এবং একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

॥ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি ॥

মানুষের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ জগৎ। তাদের কত হরেক রকমের বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। আগে জীব-জগতের কথা ধরা যেতে পারে। আমরা দেখি সব জীবের চলাফেরা, আহার সংগ্রহ খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য কার্য প্রণালী এক নয়। পাখীরা আকাশে উড়ে, সরীসৃপরা জলে স্থলে উভয় জায়গায় ঘুরে

বেড়াতে পারে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের তলদেশে অতিকায় সামুদ্রিক জীবরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। নিশাচর প্রাণীরা বিশেষ স্নায়ু যন্ত্রের সাহায্যে অন্ধকারেও শিকার অনুসন্ধান করে, ঘ্রাণ শক্তির দ্বারা কোন কোন প্রাণী বহু দূরের জিনিসের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, মানুষের মস্তিষ্ক অসাধ্যকে করে এমন কত কী।

উদ্ভিদ জগতের বৈশিষ্ট্যের কথাও ধরা যেতে পারে। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু ছোঁয়া পেলে লজ্জাবতী পাতার সঙ্কোচন ঘটে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে হরেক রকমের ফুল ফোটে এবং সুগন্ধ ছড়ায়। উদ্ভিদের শেকড়ে আপনা হতেই খাদ্যরস প্রবেশ করে ইত্যাদি।

মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেছে জীব ও উদ্ভিদের বৈশিষ্টগুলি নিজ হাতে যন্ত্র নির্মাণ করে অনুসরণ করতে চেয়েছে তাদের। কোথাও হয়েছে ব্যর্থ, আবার কোথাও হয়েছে সফল কাম।

জীবের বৈশিষ্ট্যে অনুকরণে মানুষ যে সব যন্ত্র নির্মাণ করেছে তা সত্যই বড আশ্চর্যজনক। প্রথমে নিশাচর প্রাণী বাদুড়ের কথা ধরা যাক। বাদুড়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওরা ওড়বার সময় মুখ থেকে উচ্চকম্পনযুক্ত এক ধরণের শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই শব্দ-তরঙ্গ সম্মুখের দিকে প্রেরিত হয়। তারপর কোন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। বাদুড় সেই প্রতিফলিত শব্দ তরঙ্গ কান পেতে গ্রহণ করে এবং এই কারণে দূরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব টের পায়।

মানুষের নির্মিত রেডার যন্ত্র কতকটা ঐ রকমই। বাদুড় মুখ দিয়ে উচ্চ কম্পনযুক্ত শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি করে আর মানুষ অদৃস্য কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উচ্চ কম্পনযুক্ত বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে। সেই বেতার তরঙ্গ বস্তুর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং বেতার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে।

এবার সামুদ্রিক জলচর প্রাণীদের কথা ধরা যেতে পারে। এমন

কতকগুলো সামুদ্রিক জীব আছে যারা গভীর সমুদ্রে বাস করে। এত গভীর যে, সেখানে সূর্য কিরণ প্রবেশ করতে পারে না—একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অথচ তারা যথেচ্ছভাবে তলদেশে বিচরণ করতে পারে। দেখা গেছে ওদের অনেকেই চলাফেরা করার সময় এবং শিকার ধরার সময় এক ধরণের শব্দ করে এবং অপেক্ষা করে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য। শুশুক জাতীয় প্রাণীরা এই শ্রেণীর। তাদের দৈহিক গঠন এমন যে এত গভীরে থেকেও অক্লেশে এবং দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। তাদের এই সব কার্য প্রণালীকে অনুকরণ করেছে মানুষ। তৈরী করেছে "সোনার" (Sonar) নামক যন্ত্রটি। এই যন্ত্রটির সাহায্যে মানুষ নদী ও সমুদ্রের গভীরতা মেপে নিচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত কোন পাহাড় পর্বতের অবস্থান দূরে থেকে নির্ণয় করে নিচ্ছে। আবার যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের কোন সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা টের পাচ্ছে। তার উপর এদের দৈহিক গঠন অনুকরণ করে তৈরী করছে অতি দ্রুতগামী সাবমেরিন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে তিমি, শুশুক, হাঙ্গর প্রভৃতি বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণীগুলির দেহের বিশেষ গঠনের জন্য অতি দ্রুত জল কেটে এগিয়ে যায় এবং শিকার ধরে। সাবমেরিনের খোলের গঠন প্রণালী অনেকটা ঐ সব জীবদের মত। গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা যেমন দেহের তুলনায় অতি অল্প শক্তি প্রয়োগ করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় তেমনই সাবমেরিনের খোলের বৈশিষ্ট্যের জন্য জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা থেকে মুক্ত এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন।

সাপদেরও একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন আঘাতকারীকে সাপ সহজে নিষ্কৃতি দেয় না। আঘাতকারী দূরে সরে গেলেও সাপ সঠিক পথ নির্ণয় করে আঘাতকারীর কাছে নিয়ে উপস্থিত হয় এবং ঘ্রাণশক্তির জোরে চিনে ফেলে। তাদের একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ও আছে। ঐ ইন্দ্রিয়টির সাহায্যে তারা মাথা না তুলেও শিকারের অবস্থান নির্ণয় করে। কোন কোন সাপ ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাতাসের সামান্যতম তাপমাত্রার পরিবর্তনও ধরে নিতে পারে। মানুষ

তাকেও অনুকরণ করেছে। নির্মাণ করেছে ক্ষেপনাস্ত্র। যুদ্ধকালেই সাধারণতঃ ক্ষেপনাস্ত্রের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্ষেপনাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা কেবল শত্রুপক্ষীয় বিমানের গতিপথ অনুসরণ করে বিমানটিকে ধ্বংস করে ফেলে।

এবার ইতর জীবদের কথা ছেড়ে দিয়ে মানব দেহের কোন কোন অঙ্গের কার্যপ্রণালীর কথা ধরা যেতে পারে। ঈশ্বর অকৃপণ হস্তে অনেক অনেক কিছু দান করেছেন মানুষকে। মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয় যাবতীয় জাগতিক বস্তুকে চিনে নিতে পারে। তাদের মস্তিষ্ক এত বেশী উন্নত যে, সে আজ বিধতার বিধানকেও ওলট পালট করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য জীবজন্তুদেরও মস্তিষ্ক আছে, তবে মানুষের মত এত উন্নত নয়।

মানুষ দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে আসছে। সফলও হয়েছে অনেকখানি। আবিষ্কার করেছে মানব শরীরের নানা তথ্য এবং সেই তথ্যগুলি প্রয়োগ করে নির্মাণ করেছে কত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যন্ত্র। যন্ত্রগুলির কার্যপ্রণালী অনেকটা মানুষের ইন্দ্রিয় গুলির মতই। যেমন এক ধরণের যন্ত্র আছে, যার মানুষের মত চোখ নেই অথচ পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে দেখে নিখুঁত ভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারে। কান নেই, তবুও যা শোনার কথা সবই ঠিক ঠিক শুনে নিয়ে লিখে ফেলতে পারে। ত্বক নেই, তথাপি পরিবেশের সব কিছু অনুভূতি জাগাতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে মানুষ থাকে অনুপস্থিত কিন্তু তার চোখ, কান, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক যে যে কাজগুলি করে সে সব কাজগুলি সবই করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ভুল করে কিন্তু মনুষ্য নির্মিত যন্ত্র কদাপি ভুল করে না।

আমরা প্রায়ই খবরের কাগজের পাতায় দেখতে পাই, মনুষ্য নির্মিত চালকবিহীন মহাকাশযান চন্দ্রপৃষ্ঠে এবং বিভিন্ন গ্রহে অবতরণ করছে। যেখানে অবতরণ করছে সেখানকার পরিবেশ, মহাকাশযানে

রক্ষিত যন্ত্রে আপনা হতেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। আর আমরা পৃথিবীতে বসে যন্ত্রের মাধ্যমে সব কিছু প্রত্যক্ষ করছি এবং শুনতে পাচ্ছি। এমন কি গ্রহউপগ্রহের তাপমাত্রার পার্থক্য, বায়ুর চাপ, সেখানকার মাটি এবং তার উপাদান, আবহমণ্ডলে কোন কোন গ্যাসের প্রাচুর্য প্রভৃতি বহু মূল্যবান তথ্য সেখানে না গিয়েও যন্ত্রের দ্বারাই সঠিক নির্ণয় করাটা আশ্চর্যজনক নয় কি ?

এবার মানুষের মস্তিষ্কের কথা ধরা যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনেকগুলি কাজ। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি কাজ হল, কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার পর মনে ধরে রাখা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে যথাযথভাবে চালিত করা। হাত পা প্রভৃতি চালনা করার মূলেও আছে মস্তিষ্ক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পথ চলতে চলতে সামনে একটা সাপকে দেখা গেল। মস্তিষ্ক তখন পা'কে চালনা করল পেছনের দিকে কিংবা আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোন বুদ্ধি বাংলে দিল। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে মস্তিষ্ক ঠিক ঠিক কাজ করে চলে। ঘুমন্ত মানুষের গায়ে মশা বসলে মস্তিষ্কের পরিচালনায় তার হাতখানা মশাকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ কিছুই টের পায় না।

মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী অতীব জটিল। সবকিছু বিশ্লেষণ করতে আজও মানুষ সমর্থ হয়নি। তবে যতটুকু পেরেছে তাও কম কোথায় ? আবিষ্কার করেছে কম্পিউটার নামে একটি বিস্ময়কর যন্ত্র। মস্তিষ্কের মতই এই যন্ত্রটির কার্য প্রণালী কিন্তু এত দ্রুত কাজ করে যে অবাক হতে হয়।

(কম্পিউটার যন্ত্র) গণনার কাজেই ব্যবহার করা হয়। বড় বড় যোগের অঙ্ক, যা একজন মানুষের কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে কম্পিউটারের সেখানে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। বড় বড় হিসাবনবীশদের ও বিরক্ত আসে কিংবা ভুলও হয় কিন্তু কম্পিউটারের ভুল হয় না। বড় বড় অফিসে এবং ব্যাঙ্কে, যেখানে প্রচুর গণনা করতে হয় সেখানে রাখা হয়েছে কম্পিউটার মেশিন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্র হল, এক ধরণের টাইপ মেসিন। যন্ত্রটি মানুষের মুখের কথা শোনামাত্রই অবিকল টাইপ করে দিতে পারে। বক্তার বক্তৃতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন মানুষই টাইপ করে যেতে পারে না। কিন্তু যন্ত্রটি এমন অসাধ্যকেও সাধন করতে পারে। দ্বিতীয় আর এক ধরণের যন্ত্র আছে যেটি মানুষের বক্তৃতাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারে। ধরা যাক বিদেশের কোন রাষ্ট্রনায়ক এসেছেন আমাদের দেশে। আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষি বহুজনে মিলিত হয়েছি। হয়ত তিনি বক্তৃতা দিলেন তাঁরই মাতৃভাষায়। কিন্তু অসুবিধা আমাদের হবে না, যদি একটি যন্ত্র থাকে। যন্ত্রটিতে বক্তৃতা আপনা হতেই টাইপ হয়ে যায় এবং অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে প্রচার করে। এমন আশ্চর্যজনক এই যন্ত্রটি। বড় বড় ব্যাঙ্কে আজকাল এক ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কোন মানুষের হস্তাক্ষরের সত্যতা যাচাই করতে পারে। যত নিখুঁতভাবেই হাতের অক্ষরকে নকল করা হোক না কেন এই যন্ত্রের কাছে রেহাই নেই।

আমাদের দেহের অন্যান্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে মানুষ সম্যক জ্ঞান লাভ করছে বলে কৃত্রিমভাবে হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসকে শরীরে স্থাপন করে রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনছে। শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাই এসেছে এক প্রবল আলোড়ন। মানুষ আশা করছে, সে ভবিষ্যতে সব কাজেই করবে যন্ত্রের মাধ্যমে। এমনও হয়ত একদিন আসতে পারে যেদিন জরা ও বার্দ্ধক্যকে দূর করে দীর্ঘ যৌবন ভোগ করতে পারবে। কৃত্রিমভাবে একটা মানুষকেও তৈরী করে ফেলতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা সবই সম্ভব। প্রকৃতি আজ পরাজিত হয়েছে মানুষের কাছে। বিজ্ঞানের কাছে আজ মানুষের জিজ্ঞাসা এই সভ্যতার পরিণাম কোথায়!

। মহাকাশযানের কথা ॥

সুদূরের পিয়াসী মানুষ। ঐ অসীন নীলাকাশ বারে বারে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু কোথায় তার ঠিকানা? দিগন্ত বিস্তৃত আকাশটাকে কেন্দ্র করে মানুষ যুগে যুগে চালিয়েছে তার কল্পনার রথ। প্রাচীন মহাকাব্যকার থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কত কবি, কত লেখক কাল্পনিক মহাকাশ অভিযানের কথা ব্যক্ত করে গেছেন। তাতে সাহিত্যের পুষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমার পথ এতটুকু পরিষ্কার হয়নি। এতকাল ধরে মানুষ মনের সাধ মনেই গোপন করে রেখেছিল। শেষে ১৯৫৮ সালে মহাকাশযান তথা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করে মানুষ দীর্ঘ দিনের আশাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে।

মহাকাশযানের কথা আলোচনা করতে হলে মহাকাশের কথাও একটু বলতে হয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যতদূর পর্যন্ত বায়ুস্তর ঘিরে রেখেছে, ততদূর পর্যন্ত আমরা মহাকাশ বলব না। আপাততঃ একশ মাইল বা তারও উপর থেকে মহাকাশ স্থুরু। পৃথিবীর সর্ব নিম্ন বায়ুস্তরে পরিভ্রমণ করা আদৌ কষ্টকর নয়। কিন্তু উপরের দিকে বায়ু ক্রমশঃ পাতলা সেখানে অক্সিজেন নেই। তারও উপরে বিরল বায়ুকণা সব সময় আয়নিত হচ্ছে, প্রবেশ করছে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি আর আছে অগণিত উল্কাপাত। এত বাধা অতিক্রম করে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া যায় না। কোন জীবের পক্ষেও সাধ্য নয় তাই মহাকাশে ভ্রমণ করতে হলে চাই এমন একটি বাহন, যা উপরের সব কিছু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু কে উপযুক্ত বাহন?

বাধার কথা মানুষ অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। আরও বুঝেছিল, পৃথিবীর টান বা আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করা কষ্টকর।

যেদিন মানুষ রকেটের কার্যপ্রণালী সম্যক উপলব্ধি করতে পারল, সেদিন তার মাথায় ভর করল আর এক চিন্তা—রকেটের মাথায় কোন কিছু বসিয়ে উপরে উৎক্ষিপ্ত করা যায় কিনা? মহাকাশযান নির্মাণের কল্পনা সেই থেকে উদ্ভব।

বিজ্ঞানীদের মতে মহাকাশযান নির্মাণের পেছনে "জিওলকভস্কি" নামে এক রুশ বিজ্ঞানীর অবদান সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। আজন্ম বধির, লাজুক ও নম্রস্বভাব বিজ্ঞানী ছিলেন এক দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। মহাকাশে যাত্রা করা যে একমাত্র রকেটের সাহায্যে সম্ভব সে কথা মনে হয় তিনিই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই রকেট যাতে খুব দ্রুতগামী হয় তার চেষ্টা করেছিলেন জিওলক ভস্কি। রকেটের উন্নতিসাধনের জন্য তিনিই প্রথম বিস্ফোরক পদার্থের পরিবর্তে দাহ্য ও দাহক হিসাবে দুটি তরল পদার্থকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা মত বর্তমানে রকেটগুলিতে দুটি পৃথক কক্ষে রক্ষিত তরল পদার্থকে পাম্পের দ্বারা সংমিশ্রণ করে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

এরপর এক ফরাসী বিজ্ঞনীর নাম করা যেতে পারে। নাম "রবেয়ার এনোপেল তৈরি"। রকেটযোগে চাঁদে এবং গ্রহান্তরে যাওয়ার এক চমৎকার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। রকেটের গতিপথ ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা,তাপাধিক্য ও ওজন হীনতার জন্য মহাকাশচারীর শরীরের সম্ভাব্য সমস্যা প্রভৃতি সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর প্রদত্ত তথ্য সেদিন কেউ বুঝতে পারেন নি। যদি তাঁর তথ্যকে সেদিন অবহেলা না করা হত তাহলে মহাকাশ যাত্রা এত বিলম্বিত হত না।

মহাকাশ যাত্রার আদিপর্ব রকেটের উন্নতি সাধনের ইতিহাস। বিজ্ঞানীদের স্থির বিশ্বাস ছিল, রকেটকে দ্রুতগামী সম্পন্ন না করতে পারলে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ছিন্ন করা যাবে না এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে উপেক্ষা করতে না পারলে মহাকাশে পাড়ি দেওয়াও সম্ভব হবে

না কোন কালে। সেই কারণে যত প্রতিভা সবই নিয়োজিত হল রকেটের পেছনে।

দীর্ঘ গবেষণার পর রকেটকে নব জীবন দান করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী "গডার্ড।" পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে রকেটটি উৎক্ষেপন করেছিলেন তার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৭৫০ মাইল। উক্ত গতিবেগ অবশ্য পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করতে পারে না তবুও এই প্রথম সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে তিনি রকেটটিকে তুলতে সক্ষম হলেন।

গডার্ডের পরে রকেট চর্চায় যিনি খ্যাতি অর্জন করেন তিনি বিখ্যাত জার্মান পদার্থ "বিজ্ঞানী হেরমান ওবের্থ"। তিনি একখানি পুস্তকে মহাকাশ অভিযানের বহু সমস্যার কথা আলোচনা করেন। মহাকাশে মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করার কৌশল ও পরিকল্পনা দুইটি তাঁরই মস্তিকপ্রসূত। পুস্তকখানি মহাকাশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের মনে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অপরাপর বিজ্ঞানীদের মতবাদও নতুন করে পরীক্ষা করার চেষ্টা হয় এই সময়। অবহেলিত জিওলকভস্কি এবং পেলতেরির বক্তব্যগুলোও আলোচিত হল। এবার আরম্ভ হল যৌথভাবে রকেট চর্চা। যোগ দিল বড় বড় বিজ্ঞান সংস্থা! ওবের্থের সহযোগিতায় এবং ফন ব্রাউন ভিল্লিলেই প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় V. F. R. নামে এক জার্মান সংস্থা এক উন্নত ধরনের রকেট তৈরি করলেন।

ঠিক সেই সময় ইউরোপের আকাশে ঘনিয়ে উঠল দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের কালো মেঘ। যুদ্ধের প্রয়োজন রকেট থেকে জন্ম নিল ক্ষেপনাস্ত্র। ওবের্থ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা রকেট চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন নিজেদের। কিন্তু ফন ব্রাউন সহয়তা করলেন হিটলার গোষ্ঠীকে। একদিন তৈরি হল মারাত্মক ক্ষেপনাস্ত্র—নাম ভি-২। ক্ষেপনাস্ত্রটির ওজন ছিল চৌদ্দ টন। পাঁচ মিনিটে ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করে এক টন বিস্ফোরক ঢেলে এল। চারিদিকে সৃষ্টি হল দারুণ

উত্তেজনা ও আতঙ্ক।

ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হলেও ভি-২ রকেটেই আধুনিক মহাকাশজয়ী রকেটের পূর্ব পুরুষ। এই রকেটটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে একশ মাইল উপরে উঠতে পেরেছিল।

যুদ্ধের চাকা একদিন ঘুরে গেল। মার্কিন সৈন্যরা রকেট ঘাঁটি অধিকার করে কিছু রকেট এবং প্রধান রকেট নির্মাতা ফন ব্রাউনকে স্বদেশে চালান দিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন দেশে শুরু হল মহাকাশ বিজয়ের নবোদ্যম। নেতা হলেন সেই ফন ব্রাউন। এদিকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও সুরু করলেন রকেট চর্চা। দু'দেশের পৃথক পৃথক চেষ্টার একে একে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল রকেট এবং রকেটের মাথা স্থাপন করা হল মহাকাশযান।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন পৃথিবীর টানকে অতিক্রম করতে হলে রকেটের গতিবেগ হতে হবে ঘণ্টায় ৪০২৫০ কিলোমিটার। এতকাল পরে যে রকেট তাঁদের হাতে এল তার গতিবেগ পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করতে পারল। কিন্তু মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করা যাবে কেমন করে?

আবার ভাবতে বসলে বিজ্ঞানীরা। পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন মহাকাশযান তৈরি করার। কিন্তু গঠন তার কেমন হবে, মনুষ্য বাসের পরিবেশই বা তার মধ্যে সৃষ্টি করা যাবে কিভাবে?

অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলেন, যদি পৃথিবীর পরিবেশটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। ভাবনার কিন্তু এইখানে শেষ নয়। পৃথিবীকে বায়ুমণ্ডল এবং ধুলি কণা ঘিরে রেখেছে বলে পৃথিবী পৃষ্ঠে গরম ও ঠাণ্ডা কোনটিই অতিরিক্ত নয়। উপরের দিকে যতই যাওয়া যাবে ততই ঠাণ্ডা বাড়বে। সূর্যরশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সংলগ্ন বায়ু মণ্ডল ও ধূলার সমুদ্রকে গরম করে রেখেছে। উপরের দিকে বায়ু কি বা ধূলা বালি কিছুই নেই। গরম হবে কেমন করে? এই কারণেই পৃথিবীর উচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলি বার মাস বরফে

ঢাকা থাকে।

শুধু কী তাপমাত্রার পার্থক্য? মহাকাশে ভ্রমণ করার আরও আছে হরেক রকমের বিপদ। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে, কসমিক রে প্রভৃতি কত ক্ষতিকারক রশ্মি, উল্কাপাতের ভয়, বায়ু হীনতা, কত কী? তাছাড়া কাউকে যদি মাসের পর মাস মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে হয় তাহলে একঘেয়েমি অবশ্যই আসবে। তার উপর আছে খাওয়ার সমস্যা।

অনেক কথা ভাবতে হল বিজ্ঞানীদের। শেষে ঠিক করলেন রকেটের মধ্যে এমন একটা প্রকোষ্ঠ তৈরি করতে হবে যার মধ্যে যাত্রীদের আহার-নিদ্রা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সবই যেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপে সম্পন্ন হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, কী দিয়ে তৈরি করা যাবে প্রকোষ্ঠটি? এমন কোন্ পদার্থ আছে, যার তাপ সহন ক্ষমতা অসাধারণ? তার উপর সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব মুক্ত এবং বায়ুহীন পরিবেশে চলতে থাকলেও ভেতরের বায়ুর চাপে প্রকোষ্ঠটি ফেটে যাবে না?

এ সমস্যারও সমাধান করলেন বিজ্ঞানীরা। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সঙ্কর দিয়ে তৈরি করা হল বিশেষ প্রকোষ্ঠ। সেই সঙ্কর ধাতুটির তাপ সহন ক্ষমতা অসাধারণ এবং অ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষা একশ গুণ শক্ত। নিশ্চিদ্র সেই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে রাখা হল ১৫২ মিলিমিটার পারদের চাপের সমান অক্সিজেন গ্যাস। ১৫২ মিলিমিটার চাপে কেন অক্সিজেন রাখা হল তার একটা কারণ আছে।

আমরা স্বাভাবিক বায়ুর চাপকে ৭৬০ মিলিমিটার পারদে প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু বায়ুতে অবস্থিত একমাত্র অক্সিজেন ছাড়া আর কোন গ্যাস আমাদের শ্বাস ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না। সেই অক্সিজেন আবার বায়ুতে মাত্র এক পঞ্চমাংশ রয়েছে। ৭৬০ কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে হয় ১৫২। তাই ১৫২ মিলিমিটার চাপে কেবলমাত্র অক্সিজেনকে রাখলে আমাদের শ্বাস ক্রিয়ার কোন অসুবিধা হবে না।

মহাকাশচারীদের যে পোষাক দেওয়া হল তাতেও থাকল অক্সিজেন। তাঁদের শ্বাস ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে রাসায়নিক উপায়ে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও হল। পরিশেষে খাওয়ার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করলেন বিজ্ঞানীরা। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানীসম্মত উপায়ে তৈরি করা হল ছোট ছোট পিল অথবা কাগজের মোড়কে পেস্ট। ওতে আমাদের জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা, খনিজ ও ভিটামিন সব কিছুর ভাগ ঠিক করে দেওয়া হল। সুবিধে হল এই যে, অতি সামান্য অংশ খেলেই কাজ চলে যাবে। পেট ভরানোর প্রয়োজন হবে না। হৃৎপিণ্ড, রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শারীরিক প্রক্রিয়াগুলির বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে পরিবেশেরও ব্যবস্থা করা হল।

এত সমস্ত কাণ্ড করেও বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম মহাকাশযানের মধ্যে মানুষ পুরে মহাকাশে উৎক্ষেপন করেন নি। সর্বপ্রথম খালি মহাকাশ যান, তারপর কুকুর, বানর প্রভৃতিকে পাঠিয়েছিলেন। তারপরে যখন পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে সফল হলেন, তখনই প্রেরণ করলেন মানুষকে।

মহাকাশযান বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্বলিত পৃথিবীর পরিবেশযুক্ত একটি শক্ত প্রকোষ্ঠ মাত্র। প্রচণ্ড গতিশীল রকেটরা তাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করাতে সাহায্য করে। মাধ্যকর্ষণ বল ছিন্ন করার পর আকর্ষণহীনতার জন্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এগিয়ে যায় দূরে গ্রহ উপগ্রহের দিকে। তারপর গ্রহ উপগ্রহদের আকর্ষণের আওতায় এলে আপনা হতেই নেমে পড়ে। তার জন্য অবশ্য বহু যাতিক ব্যবস্থা থাকে— যার খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাধ্য নয়। তবে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করার ব্যাপারে মহাকাশযান অপেক্ষা রকেটেরই কৃতিত্ব বেশী।

চন্দ্রাবতারণ

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন প্রথম পৃথিবীর মানুষ মহাকাশের বুক চিরে চন্দ্রে উপনীত হয়ে নিজেদের চরণচিহ্ন অঙ্কিত করে এসেছে চন্দ্র পৃষ্ঠে। তারপর নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছে পৃথিবীর বুকে। সাফল্যজনক এই অভিযানের ফলে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা হয়েছে অযুত রত্নরাজি। কিন্তু সমূহতথ্য এখন পৃথিবীর সব দেশের মানুষ জানতে পারে নি। তার একমাত্র কারণ, মহাকাশ বিজ্ঞানে সব চেয়ে অগ্রসর দেশ ছুটি সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজও বহু তথ্য গুপ্ত রেখেছেন। সেগুলি প্রকাশ ঘটবে সুদূর ভবিষ্যতে।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ২ মিনিটে আমেরিকার কেপকেনেডি থেকে তিনজন মহাকাশ যাত্রী নীল আর্মষ্ট্রং এডুইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্সকে নিয়ে অ্যাপোলো-১১ নামে মহাকাশযানটি চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করেছিল। মূলযানের সাঙ্কেতিক নাম ছিল কলম্বিয়া এবং চন্দ্রযানটির নাম ছিল ঈগল। পাঁচ দিনের পর অর্থাৎ ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ডে পৃথিবীর মানুষ টেলিভিশনে ছায়াছবিতে দেখলেন নীল আর্মষ্ট্রং চন্দ্রযান ঈগল থেকে বেরিয়ে মই লাগিয়ে অতি সন্তর্পনে অবতরণ করলেন চন্দ্র পৃষ্ঠে। তাঁর অবতরণ করার কুড়ি মিনিট পরে অলড্রিনও নেমে পড়লেন চাঁদের বুকে। তারপর উভয়ে মিলে আরম্ভ করলে পাথর কুড়াতে।

অপূতপূর্ব সেই দৃশ্য! যিনি দেখলেন তিনিই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। যে সব দেশে টেলিভিশনের ব্যবস্থা নেই সে সব দেশের মানুষ বেতারের মাধ্যমে শুনতে পেলেন সেই ঐতিহাসিক জয়ের কাহিনী।

যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষের এই চূড়ান্ত সাফল্য দেখে সারা পৃথিবী জয়ধ্বনি করে উঠল। ধন্য মানুষ, আর ধন্য তার বুদ্ধি।

কিন্তু এই যে এত বড় সাফল্য, সেটি এক আধ দিনে কিংবা এক আধ বছরে আসেনি। শত শত বছরের হাজার বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রমকে পাথেয় করে এত দিনের বিজ্ঞানীরা হলেন জয়যুক্ত।

চাঁদ, পৃথিবী থেকে কতই না সুন্দর দেখায় তাকে! কোন সৌন্দর্যের তুলনা করতে গেলে সব দেশের এবং সব যুগের কবিরা চাঁদকেই গ্রহণ করেছেন। সৌন্দর্যের আকর চাঁদ আবার প্রাচীন সাহিত্যে দেবতা বলে পূজিত। চাঁদের প্রতি একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা সব কালের মানুষের মধ্যে ছিল। সেই চাঁদকে প্রথম যে ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছিলেন তিনি গ্যালিলিও। নিজের তৈরী দূরবীন চোখে লাগিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে কেবল ক্ষান্ত হলে না তৈরী করলেন এক মানচিত্র। যদি সে মানচিত্র আজকেরদিনে অঙ্কিত চাঁদের মানচিত্রর সঙ্গে তফাৎ অনেকখানি। তথাপি তিনিই প্রথম পরিবেশন করেছিলেন, এত সৌন্দর্যের আধার পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী চন্দ্র, সে কেবল কঠিন কঠোর এক মূর্তি— পাহাড় পর্বত এবং আগ্নেয়গিরিতে ভরা। সেখানে আবহমণ্ডল নেই, বিরাজ করছে রুক্ষ ও প্রাণহীন ধূ ধূ মরুপ্রান্তর।

গ্যালিলিওকে অনুসরণ করলেন, গ্যালিলিওর পরবর্তী আরও বহু বিজ্ঞানী। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের উন্নতিও হল। মানুষ আবিষ্কার করল ক্যামেরা ও টেলিভিশন। দূরবীনও হল অনেক উন্নত। কেবল চন্দ্র নয় গ্রহান্তর থেকেও মানুষের হাতে আসতে লাগল কত খবরাখবর।

চাঁদ সম্বন্ধে যে সব খবর সংগ্রহ করল মানুষ তা সংক্ষেপে হল, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব দু লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল। ঘণ্টায় ২৩০০ মাইল বেগে সাড়ে উনত্রিশ দিনে সে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। প্রদক্ষিণের সময় একটা পিঠ সব সময় সূর্যের দিকে থাকে আর একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে। ওর ব্যাস ২১৬০ মাইল এবং ওজন পৃথিবীর আশি ভাগের এক ভাগ। দিনের বেলায় চাঁদের তাপমাত্রা ১০০°

সেন্টিগ্রেডেরও বেশী আর রাত্রির তাপমাত্রা 0° ডিগ্রীর অনেক নীচে নেমে যায়। অর্থাৎ চন্দ্র পৃষ্ঠে জলকে রেখে দিলে দিনের বেলায় আপনা হতেই ফুটবে আরম্ভ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে। রাতে জলটা রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ হয়ে যায়।

চাঁদ মূলত পাহাড়ী অঞ্চল। সেখানকার কোন কোন পর্বত শৃঙ্গের উচ্চতা এভারেষ্টের চেয়ে বেশী। পাহাড়গুলির অধিকাংশই মৃত অগ্নেয়গিরি। গোটা কয়েক সমুদ্রও আছে। সমুদ্র বটে কিন্তু জল নেই এক ফোঁটাও। কিছু কিছু গহ্বরও আছে। আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, গহ্বরগুলো আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন সে ধারণা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন, মহাকাশের বুক চিরে ছুটে আসা বিরাট বিরাট উল্কা পিণ্ডের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছে গহ্বরগুলো। তবে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির জালামুখও আছে।

এখন প্রশ্ন, চাঁদ কী জন্মাবধি এই রুক্ষ মরুময় শরীরটাকে নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করছে?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, চাঁদও জন্ম লগ্নে লাভ করেছিল পৃথিবীর মত একটা আবহমণ্ডল। কিন্তু তার ক্ষীণ অভিকর্ষের জন্য সে আবহমণ্ডলকে ধরে রাখতে পারেনি। তাই জন্ম থেকেই সে অভিশপ্ত। চাঁদে যাওয়ার জন্য মানুষের কেন এত অভিলাষ? এমন ব্যয়বহুল এবং বিপদসঙ্কুল অভিযানের কী কোন সার্থকতা আছে? সেখানে কী মানুষ বাস করতে পারবে?

আমরা দেখেছি চাঁদে বাস করার নানা সমস্যা। সেখানে আছে উল্কাপাত এবং সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাব। সেখানে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলাও অসম্ভব। পৃথিবীর মত চাঁদে বায়ু মাধ্যম নেই বলে একজনের কথা অপরের কানে হঠাৎ প্রবেশ করবে না। কথাবার্তা চালাতে হলে বেতার যন্ত্রের প্রয়োজন। তাতেও অসুবিধে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যতদূর সম্ভব চাঁদের উপরে আয়নমণ্ডল নেই। বেতার তরঙ্গ

প্রতিফলিত না হলে কতদূর আর এগুবে ? সেখানে চলাফেরা করারও অসুবিধে। চাঁদের জমি অমসৃণ আর ভাঙ্গাচোরা। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট বড় অসংখ্য পাথরের স্তূপ। তাপমাত্রার ব্যবধানও বিরাট। তার উপর আছে ক্ষীণ অভিকর্ষ। আজীবন প্রচণ্ড বায়ু চাপের মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত আমরা চাঁদে গেলেই অস্বস্তি অনুভব করব। শরীরটাকে মনে হবে ভয়ানক হালকা। খালি গায়ে থাকা যাবে না। সব সময় চাপিয়ে রাখতে হবে পৃথিবীর আবহাওয়াপূর্ণ পোষাক। এক এক লাফে এগিয়ে যাওয়া যাবে ৩০।৪০ ফুট পথ।

তবুও মানুষের কেন এত নেশা? এই প্রশ্নের একটিমাত্র সদুত্তর হচ্ছে, মানুষের রক্তে রয়েছে অজানাকে জানার একটা দুর্বার কৌতূহল। শুধু চাঁদ নয়, সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খবর সে ঘরে বসে পেতে চায়। জানতে চায়, আকাশের অসংখ্য তারামণ্ডলীর মধ্যে কোথাও কী আছে পৃথিবীর মত পরিবেশে? মানুষের মত উন্নত জীব কী আছে অন্য কোন গ্রহে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, চন্দ্রাভিযানের সব চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ উপযোগিতা হচ্ছে বিশ্ব রহস্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। তাঁরা মনে করেন সৌর জগতের বহু ইতিবৃত্ত চাঁদের বুকে পাওয়া যাবে। পৃথিবীর বুকে জল, ঝড়, সূর্যকিরণ প্রভৃতির ফলে কোথাও হয়েছে ভূমির অবক্ষয়, কোথাও হয়েছে সঞ্চয়। তাছাড়া নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো আছেই। এই সব কারণে পৃথিবীর বুকে সমস্ত প্রাচীন নিদর্শন আরও লুপ্ত। কিন্তু চাঁদে যে বিরাট বিরাট গহ্বরগুলি রয়েছে সেগুলি সৌর জগতের আদি যুগের নিদর্শন।

চন্দ্র পৃষ্ঠ থেকে গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করার সুবিধা অনেক। গ্রহনক্ষত্রাদি রহস্য উদ্ঘাটনে আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের একমাত্র সহায় হচ্ছে বেতার জ্যোর্তিবিজ্ঞান। বেতারদূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূরের গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় সত্য, কিন্তু সেখান থেকে আগত বেতার তরঙ্গ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে প্রবেশ করলে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। চন্দ্রে কোন আবহমণ্ডল নেই বলে ক্ষীণ বেতার তরঙ্গ বিশ্লেষণ করা যাবে

এবং সুদূর নীহারিকা লোক থেকে আগত বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বহু মহাজগতিক বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণের ফল যেমন পৃথিবী এবং সৌর জগতের উৎপত্তির বহু তথ্য জানা যাবে অপরদিকে তেমনই সীমাহীন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে। তাছাড়া আমরা দেখেছি, বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কার মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছে অনেক দূরে। এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হবে না।

আরও একটা চিন্তা বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। তাঁদের কাছে একটা প্রশ্ন, চন্দ্রে উপনিবেশ স্থাপন করা যাবে কিনা?

বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাঁদের মতে, চন্দ্রে বায়ুশূন্যতা এবং ক্ষীণ অভিকর্ষকে কাজে লাগিয়ে অনেক অসাধ্যকে সাধন করতে পারা যাবে। প্রথমতঃ সেখানে মানুষ বাস করলে দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চন্দ্রে চালান করে দিতে পারলে তার আর কোন ভয় থাকবে না। কারণ আমাদের হৃদযন্ত্রের উপর রক্তের চাপ কম পড়বে বলে হৃদযন্ত্র ক্ষয় হবে ধীরে ধীরে এবং ব্যার্ধক্যও আসবে ধীরে ধীরে। তৃতীয়তঃ বায়ুশূন্য অবস্থায় কার্যকারী এমন বহু শিল্প গড়ে তোলা যাবে।

কিন্তু কোথায় পাবে মানুষ চন্দ্র পৃষ্ঠে খাদ্য পানীয় এবং অক্সিজেন? বিজ্ঞানীরাঅক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এই অসুবিধাগুলি সমাধান করার উদ্দেশ্যে। হদিসও কিছুটা পেয়েছেন তাঁদের ধারণা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যখন মূলতঃ একই উপাদান নিয়ে গঠিত তাহলে চন্দ্র শিলা থেকে কার্বন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি উপাদানগুলো সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে পৃথক করা যেতে পারে এবং ঐ উপাদান গুলো থেকে প্রোটিন, শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ তৈরী করা যাবে। ক্লোরেলা নামে এক রকম শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এরা নাকি দ্রুত বেড়ে উঠে এবং অতি পুষ্টিকর বলে আহার্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই শেওলার আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এরা দ্রুত

বেড়ে উঠে এবং সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে গ্রহণ করে শর্করা তৈরি করতে পারে। ফলে অক্সিজেনকে আপনা হতেই পাওয়া যাবে।

আরও একটি মজার কথা। চাঁদের মাটির উপরের স্তরের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা পৃথিবীর যে কোন কঠিন বস্তুর চেয়ে অনেক কম। অনেকে তাই মনে করছেন, চাঁদের মাটির তলায় বরফের আকারে জলের অবস্থিতি সমুহ সম্ভাবনাএকেবারে বাতিল করা যায় না। মহাকাশচারীরাও চাঁদের কিছু কিছু মাটিকে অনেকটা ভিজা ভিজা ধরণের দেখেছেন। তাই তো চাঁদ যে সম্পূর্ণ এক মরা জগৎ, সেখানে যে প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই একথা জোর দিয়ে আজও কেউ বলতে পারেন না। আদ্যিকালের বদ্যি বুড়োর মত চাঁদ জন্মকাল থেকে একই অবস্থায় আছে বলে অনেকের বিশ্বাস তার মধ্যে এমন জায়গাও থাকতে পারে, যে স্থান মনুষ্য বাসের সম্পূর্ণ উপযোগী। তেমন জায়গা যদি পাওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর জন সমস্যারও কিছুটা সমাধান হতে পারে।

এই সব নানা কারণের জন্য পৃথিবীর মানুষের চন্দ্রে অবতরণ করার এত আগ্রহ। গ্যালিলিওর সময় থেকে দূরবীনের সাহায্যে চাঁদের রুক্ষ মূর্তিকে দেখেই মানুষ এক রকম তৃপ্ত ছিল। রকেটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদে যাওয়ার পরিকল্পনা সে গ্রহণ করে বসল।

চাঁদে যাওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা হয় ইংরাজী ১৯৫৮ সালে। ঐ বছর ১১ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পায়োনিয়ার-১ নামে সর্বপ্রথম একটি মহাকাশযান উপরে উৎক্ষিপ্ত করেন। তারপর ডিসেম্বর মাসে পায়োনিয়ার-৩ নামে আর একটি মহাকাশযানও প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু এই দুটির কোনটিই এক লক্ষ কুড়ি হাজার কিলোমিটারের বেশী দূরে উঠতে পারেনি। চাঁদের কাছাকাছি যাওয়ার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করলেন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী লুনা-১ নামে যে মহাকাশযানটি তাঁরা প্রেরণ করলেন, সেটি সত্তর ঘণ্টা মহাকাশে বিচরণ করে

চাঁদের ৫৯৬৫ কিলোমিটার দূর দিয়ে সোজা বেরিয়ে চলে গেল সৌরলোকে ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পাঠালেন আর একটি মহাকাশযান। লুনা-২ নামে সেই মহাকাশযানটি সোজা চাঁদের পিঠে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। মানুষের তৈরি যন্ত্র চন্দ্রে হাজির হতে পৃথিবীর মানুষ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। এবার জানল, মানুষ একদিন না একদিন চন্দ্র জয় করবেই।

সেই বছর অক্টোবর মাসে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আবার পাঠালেন লুনা-৩ নামে আর একটি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান। সেটি চাঁদের উল্টো পিঠের ছবি তুলে পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে। যদিও লুনা-ঃ কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারেনি।

এরপর প্রায় বছর দুয়েকের মত সোভিয়েত রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই ছিল চুপচাপ। ১৯৬২ সাল থেকে যেন প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল দু দেশের মধ্যে। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সর্বসমেত দশটি মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৬টি ছিল আমেরিকার আর ৪টি ছিল রাশিয়ার। দশটি মহাকাশযানের মধ্যে কয়েকটি চাঁদের পিঠে আছাড় খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল তবুও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাঁদের বহু খবর সংগ্রহ করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। এমন কি লুনা-৩ যে কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারেনি, সে কাজ সম্পন্ন করল সোভিয়েত মহাকাশযান জোনাদ-৩ এবং আমেরিকান মহাকাশযান অরবিটার-৫। চাঁদের ছবি তোলা শেষ হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। সেই সব ছবি থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠের বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা গেল চন্দ্রপৃষ্ঠে ছোট বড় বহু আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ভর্তি। তাদের কোন কোনটি প্রকৃত জ্বালামুখ, কোনটি হয়েছে চাঁদের মাটির বহু জায়গা থেকে ছিটকে ওঠা প্রস্তর খণ্ডের সংঘর্ষে। প্রায় ৩২০০০ জ্বালামুখের সন্ধান পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা।

প্রথম অক্ষতভাবে মহাকাশযানকে নামাতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। ৩রা জানুয়ারী লুনা-৯ অক্ষতভাবে অবতরণ করার পর পাঠিয়েছিল বহু ছবি। প্রকৃত পক্ষে মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করেছিল লুনা-৯। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, চাঁদের জমির গঠন বেশ শক্ত। পৃথিবীর মাটির মত না হলেও একজন লোক সাধারণভাবে চলাফেরা করলে জমি বসে যাবে না। চাঁদের মাটির উপরের স্তরটার গভীরতা খুব সামান্য। ভিজে বালিতে হাঁটলে যেভাবে পাটা বসে যায় চাঁদের উপরে হাঁটলে ঠিক তেমনটি হবে। মাটির গঠন বিশ্লেষণ করে দেখলেন চাঁদের জমি কালো ব্যাসল্ট শিলার লাভা প্রবাহ থেকে তৈরি হয়েছে।

১৯৬৭ সালে ২৪শে এপ্রিল আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সার্ভেয়ার-৩ নামে যে মহাকাশযানটি নামিয়েছিলেন, সই যানটি জানিয়েছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার বিরাট ব্যবধানের কথা। আরও জানিয়েছিল, পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে একটা জ্যোতির্বলয়। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন পৃথিবীর রায়ুমণ্ডলে সূর্য রশ্মির অবচ্যুতির ফলেই diffraction হয়েছে এই জ্যোতির্বলয়। সার্ভেয়ার-৩ এ মাটি খোঁড়ার জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিও ছিল। তবে চাঁদের উপরিভাগের মাটির রাসায়নিক গঠন নির্ণয় করার জন্য পাঠান হয়েছিল সার্ভেয়ার-৫ নামে আর একটি মহাকাশযান। সার্ভেয়ার-৫ জানাল চাঁদের জমির $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি গভীরের মৃত্তিকার রঙ আরও কালো। উপরের আস্তরণটা যেন একটা পাতলা ধূলোর আবরণ দিয়ে তৈরি এবং তার রঙ কালো। যেন কোটি কোটি বছর ধরে চাঁদের উপর ঝুল জমেছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, সৌর বাতাসের (solar wind) সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে এই ঝুল সৌর বাতাসে প্রধানতঃ থাকে কার্বন জাতীয় কিছু ভারি কণিকা। কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রকরা মিলিত হয়ে কোন গ্যাস সৃষ্টি করতে পারে। বরং কঠিন জায়গার উপর সংঘাত সৃষ্টি করে এবং তার উপর জমা হয়ে একটা কালো পাতলা স্তর গঠন করে।

কলকারখানা এলাকার ঘর বাড়িগুলো যেমন কালো হয়ে যায়, এও ঠিক তেমনটি? চাঁদের জন্মের পর থেকে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর ধরে জমেছে ঐ ঝুল। যদি এই ঝুলকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে তাহলে চাঁদকে আরও বেশী উজ্জ্বল দেখাত।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসের পর থেকে যতগুলি মহাকাশযান চাঁদের কক্ষ পথে স্থাপন করা হয়েছিল তাদের মধ্যে লুনা-১০ নামে সোভিয়েত মহাকাশযানটির গুরুত্বই সর্বাধিক। লুনা-১০ জানাল, চাঁদের উপরিভাগের শিলাস্তরের তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীর ত্বকের ব্যাসল্ট বা গ্রানাইট শিলার স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার খুব কাছাকাছি। আর একটা তথ্য জানাল লুনা-৯। সে তথ্যটা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে যেভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ঠিক সেই ভাবে হয়েছে চাঁদের সৃষ্টি। এতদিনে চাঁদের জন্ম রহস্য সম্বন্ধের যে বিতর্ক ছিল তার হল অবসান। লুনা-১০ আরও জানাল, চাঁদে একটা দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্র আছে এবং চাঁদের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের কাছে একেবারে নগণ্য অর্থাৎ কোটি ভাগের ভাগ মাত্র।

উল্কাপাত সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে ভয়টা ছিল, সে সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছিল লুনা-১০। সে উল্কাপাতের পরিমাণ নির্ণয় করে পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, প্রতি পাঁচ ঘণ্টায় চাঁদে উল্কাপাতের পরিমাণ ৫২টির মত। উল্কারা আকাশের বুক চিরে ছুটে এসে যখন চাঁদের পিঠে আছাড় খেয়ে পড়ে তখন কিছু শিলা ভেঙ্গে গুঁড়া হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়। সেই গুঁড়াগুলোর কিছু অংশ চন্দ্রপৃষ্ঠে ফিরে আসে, কিছুটা চাঁদের অভিকর্ষ বল কাটিয়ে বাইরে ছুটে বেরিয়ে যায়। বাকি অংশ পৃথিবী ও চন্দ্রের অভিকর্ষ বলের সম্মিলিত প্রভাবে কিছুদিনের জন্য আবর্তিত হতে থাকে। লুনা-১০-এ মধ্যে এই জাতীয় কণিকা অনেক পাওয়া গিয়েছিল।

এ পর্যন্ত যতগুলি মহাকাশযান প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের সবগুলি আরোহী শূন্য ছিল না। কোন কোনটিতে জীবজন্তু এবং কোনটিতে

মানুষকেও প্রেরণ করা হয়েছিল। মহাকাশ যাত্রার প্রথম গৌরব অর্জন করেছে সোভিয়েত রাশিয়ার "লাইকা" নামে একটি কুকুর। ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর মহাকাশ পরিক্রমা করে ফিরে এসেছিল লাইকা। ফিরে আসার পর অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল তাকে নিয়ে। জীব দেহে কোন বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হয়নি দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। তারপর পাঠান হয়েছিল দুটি বানরকে। বানর যুগলকেও পাঠিয়েছিলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। তারাও ফিরে এসেছিল সুস্থ শরীরে।

এত সব পরীক্ষার পর ১৯৫৮ সালে প্রথম মহাকাশচারী মানুষকে দিয়ে উঠল মহাকাশযান। আরোহী ছিলেন যুরি গ্যাগরিন। সোভিয়েত রাশিয়ার লোক তিনি। নিজের দেশের মহাকাশযানে চেপে পৃথিবীর মাধ্যাকর্যণ বলকে কাটিয়ে উপরে উঠতে পেরেছিলেন। তারপর ফিরে এসেছিলেন সম্পুর্ণ সুস্থ শরীরে। ১৯৬৭ সালে ভষ্টোক-৬তে চেপে মহাকাশ পরিক্রমা করেছিলেন একজন রুশ মহিলা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা। ইনিই বিশ্বের প্রথম মহিলা যিনি মহাকাশ যাত্রার গৌরব অর্জন করেছেন। ১৯১৪ সালের ১০ই অক্টোবর মহাকাশযান ভসখোদে চেপে মহাকাশ পাড়ি দিয়েছিলেন তিনজন নভশ্চর ভ্লাদিমির, কোমারোভ এবং কনস্তানতিন তাঁদের সঙ্গে বোরিশ নামে একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানীও গিয়েছিলেন। তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল, মহাকাশযাত্রার সময় মহাকাশচারীদের দেহে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিনা জানার জন্য।

১৯৬৬ সালের ২২শে ফ্রেব্রুয়ারী কসমস-১০ নামে একটি মহাকাশযান পাঠান হয়েছিল দুটি কুকুরকে। দীর্ঘ ২২ দিন ধরে ৩৩০ বার পৃঝিবীকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে এসেছিল তারা। দেখা গেল, এতদিন মহাকাশে অতিবাহিত করার ফলেও তাদের শরীরে কোন অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেল না বা তাদের মধ্যে কোন মানসিক প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হল না।

আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও কয়েকটি মনুষ্যবাহী মহাকাশযান প্রেরণ

করেছিলেন। তাদের মধ্যে ১৯৬৯ সালের মে মাসে প্রেরিত অ্যাপোলো-১০ এর ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ। অ্যাপোলো-১০ এর যাত্রী ছিলেন জন ইয়ং, শাংনাম ও টমান স্ট্যাফোর্ড। এঁরাই প্রথম প্রকাশ করেছিলেন এমন সব জ্ঞাতব্য বিষয়, যার ফলেই চন্দ্র জয় করা সম্ভব হয়েছে।

এরপরই এসেছিল সেই ঐতিহাসিক দিনটি। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের শুভ ১৬ই জুলাই তারিখটি। ঐ দিনই অ্যাপোলো-১১ মহাকাশ-যানটি তিনজন নভশ্চর কলিন্স, আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে চন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়েছিল। ২১শে জুলাই তাঁদের ছু-জন অবতরণ করলেন চন্দ্রপৃষ্ঠে। কলিন্স থেকে গেলেন মূল মহাকাশযানটিতে। তারপর আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন ছু ঘণ্টা কাল চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করে এবং কিছু পাথর কুড়িয়ে এনে পুনরায় মিলিত হলেন কলিন্সের সঙ্গে। মানুষের চন্দ্র বিজয় হল সম্পূর্ণ।

॥ মঙ্গল সমাচার ॥

বহুকাল ধরে মানুষ মঙ্গল গ্রহের প্রতি একটা বড় রকমের আকর্ষণ বোধ করে আসছে। তার প্রধান কারণ, দূরবীন আবিষ্কারের পর মানুষের যেদিন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে প্রথম তাকিয়েছিল মঙ্গলের দিকে সেইদিন দেখতে পেয়েছিল লাল বর্ণের এই গ্রহটির পৃষ্ঠ দেশে কোথাও কোথাও সবুজ অঞ্চল বিত্তমান। মেরুপ্রদেশে সাদা টুপির মত আঁকা-বাঁকা কতকগুলো রেখা এক এক জায়গায় পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। মানুষ ভেবে নিয়েছিল মঙ্গল পৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষের মত অথবা তদপেক্ষাও কোন উন্নত জীব বাস করে পৃথিবীর মত সমুদ্র আছে সেখানে। মঙ্গলের আকাশে জমে মেঘ, বারি ধারায় সিক্ত এবং সরস সেখানকার মাটি। সেখানে ঘন সমভূমি আছে আর আছে সবুজ শস্য ক্ষেত্র। নীলাভ সবুজ অঞ্চলকে

সেদিন তাই মনে করা হয়েছিল সমুদ্র। আঁকা বাঁকা রেখাগুলোকে ভাবা হয়েছিল মঙ্গলে বসবাসকারী বুদ্ধিমান জীব গোষ্ঠী কর্তৃক খনন করা খাল। পৃথিবীর মত মঙ্গলেরও মেরুশীর্ষ বরফে ঢাকা। গ্রীষ্মকালে সেখানকার বরফ গলে যায়। বরফ গলা জলে পুষ্ট নদী থেকে খাল কেটে বুদ্ধিমান জীবরা নিরক্ষ অঞ্চলের উর্বর জমিতে জল সেচ করে।

মঙ্গল গ্রহের উন্নত জীবের কাল্পনিক বর্ণনাও খাড়া করেছিলেন কেউ কেউ। যেমন তাদের মাথাটা হবে শরীরে অনুপাতে বড়, গায়ের রঙটা হবে সবুজাভ, বুদ্ধিতে পৃথিবীর মানুষ অপেক্ষাও বেশী, এমন আরও কত কী! অনেকে আবার তাদের সম্বন্ধে কত কাল্পনিক কাহিনীও লিখেছিলেন এককালে! সে সব কাহিনী হয়ত সাহিত্যের ভাণ্ডার কিছুটা পুষ্ট করেছে কিন্তু বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা পড়েনি একতিলও।

অতি সাম্প্রতিক কালে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সম্বলিত মনুষ্য প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত সে সব খবর সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে মনে হয় মঙ্গল পৃষ্ঠে কোন উন্নত জীবের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, যদি জীব ও উদ্ভিদ থাকে তাহলে সেগুলি অতি নিম্নস্তরের কিছু কিছু জীবাণু এবং শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ।

মঙ্গল গ্রহের ইংরাজী নাম মার্স। গ্রীক পুরাণে মার্সকে যুদ্ধের দেবতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় পুরাণে মঙ্গলকে কোথাও দেবতা বলে উল্লেখ নেই। তবে জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল একটি গ্রহ। এর প্রভাব যে অত্যন্ত অমঙ্গলকর এমন কথাও বলা হয়েছে।

এবার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মঙ্গলের দিকে তাকান যেতে পারে। অবস্থান হিসাবে সূর্যের চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল। সে একটা উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে নিয়ত পরিক্রমা করে চলেছে। ঘুরতে ঘুরতে যখন সূর্যের কাছে আসে তখন দূরত্ব হয় ১২·৮ কোটি মাইল এবং দূরে সরে গেলে দূরত্বটা বেড়ে হয়ে যায় ১৫·৫ কোটি মাইল। পৃথিবী থেকে মাত্র ৩·৪ কোটি মাইল দূরে আছে মঙ্গল কিন্তু সূর্যের দুপাশে যখন উভয়ে অবস্থান করে তখন উভয়ের মধ্যে দূরত্ব হয় ২৫ কোটি মাইলের মত।

মঙ্গলের দিন রাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর মত হলেও তার এক বছর পৃথিবীর প্রায় দু বছরের সমান। অর্থাৎ মঙ্গল নিজ মেরুদণ্ডের উপর পাক খায় ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিটে কিন্তু সূর্যের চার পাশে একবার পরিভ্রমণ করে আসতে তার ৬৮৭ দিন অতিক্রান্ত হয়। মঙ্গলের বছর তাই দীর্ঘ এবং সেই কারণে সেখানকার ঋতুগুলিও বেশ দীর্ঘস্থায়ী। প্রায় চার মাসের মত এক একটা ঋতু বিরাজ করে সেখানে। পৃথিবীর মত ঋতু পরিবর্তন হয় মঙ্গলে। তার কারণ পৃথিবীর মত মঙ্গল নিরক্ষবৃত্তের সমতল নেই। সামান্য একটা কোণ করে সব সময় কাৎ হয়ে আছে। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ঢের কম। কারও কারও মতে মঙ্গলের নিরক্ষ অন্তলের মাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে দুপুরে মাত্র ৩০° সেন্টিগ্রেডের মত হয় এবং রাতে হিমাঙ্কের ৯০° সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে যায়। বর্তমানে উপগ্রহের মারফতে যে খবর সংগ্রহ করা হয়েছে তাতে স্থির হয়েছে, তাপমাত্রার ব্যবধান নাকি আরও বেশী।

মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। তবে ব্যাস পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে কিছু বেশী। ভর পৃথিবীর ভরের এক দশমাংশ এবং অভিকর্ষীয় টান পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগের মত। এই কারণে মঙ্গল পৃষ্ঠের প্রস্থান বেগ অতি সামান্যই। অর্থাৎ সেকেণ্ডে মাত্র ৩·২ মাইল। কোন বস্তুকে মঙ্গলপৃষ্ঠ থেকে সেকেণ্ডে ৩·২ মাইল বেগে উপরে উৎক্ষিপ্ত করলে সে আর ফিরে আসে না। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রস্থান বেগ সেকেণ্ড প্রায় সাত মাইল। এত কম প্রস্থান সত্ত্বেও মঙ্গলে একটা আবহমণ্ডল আছে। যদিও সে আবহমণ্ডলটা অত্যন্ত হালকা। আবহমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রাচুর্য। আর আছে কিছু কার্বনডাই অক্সাইড ও স্বল্প আর্গন গ্যাস। অক্সিজেন প্রায় নেই বললেও চলে। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এক কালে নাকি মঙ্গলে ছিল প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন। সমূহ অক্সিজেন মঙ্গলপৃষ্ঠে লৌহশিলার সঙ্গে ক্রিয়া করে মরিচায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। তাই মঙ্গলকে এত লাল দেখায়। অক্সিজেনহীন পরিবেশে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর জীবন ধারণ অসম্ভব—একথা আজকের বিজ্ঞানীদের মত।

বর্তমান কালে মঙ্গল থেকে খবর আনার জন্য বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবী থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল। প্রথম যে উপগ্রহটি মঙ্গল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছিল সেটির নাম ম্যারিনার-৪। ১৯৬৫ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই ওকে মঙ্গলের কক্ষপথে স্থাপন করেছিল। প্রায় ৬ হাজার মাইলের মধ্যে এসে ২১টি টেলিভিশন ফটো পাঠিয়েছিল। সেইসব ফটো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, মঙ্গলের আবহমণ্ডলে অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প নেই বললেও চলে। সুগভীর খাদে ভরা মঙ্গল পৃষ্ঠ। খাদগুলো সৃষ্টি হয়েছে উল্কাপাতের ফলে। বৃষ্টি বায়ুপ্রবাহ না থাকায় খাদগুলির অবলুপ্তি ঘটেনি। যুগ যুগ ধরে এই ভয়ানক ক্ষত-চিহ্নগুলোকে বুকে ধারণ করে সূর্য পরিক্রমা করছে মঙ্গল। কোন পর্বত কিংবা কোন সমুদ্রের ফটো পাঠায়নি ম্যারিনার-৪। সেদিন থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, মঙ্গল চাঁদের মত সম্পূর্ণ মরা জগৎ না হলেও কোন উন্নত শ্রেণীর জীব সেখানে থাকতে পারে না কি বা উন্নত শ্রেণীরকোন উদ্ভিদ নেই সেখানে। যদিও আছে, তাহলো নিম্নস্তরের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু এবং শেওলা।

মঙ্গলের উপগ্রহ সংখ্যা দুই। একটির নাম ফোবাস এবং অপরটির নাম ডাইমস। ফোবাস মঙ্গল থেকে মাত্র সাড়ে ছ'হাজার মাইল দূরে থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টায় একবার করে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করেছে। মঙ্গলের চেয়েও ফোবাসের আবর্তন বেগ বেশী। সারাদিনে এবং রাতে কোনদিন তিনবার আবার কোনদিন চারবার পশ্চিমে উদিত হয়ে পুবে অস্ত যাচ্ছে। দ্বিতীয় উপগ্রহ ডাইমস মঙ্গল থেকে ১৪ হাজার মাইল দূরে থেকে ·০ ঘণ্টায় একবার মঙ্গলের চার পাশে ঘুরে আসছে। ডাইমসের উদয় অস্ত অনেকটা পৃথিবীর চাঁদের মতই হয়ে থাকে।

আরও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছে মঙ্গল থেকে। সেটিকেও প্রেরণ করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। সেটির নাম ম্যারিনার-৯। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলের অতি সন্নিকটে এসে এক বছর কাল ধরে মঙ্গলকে ৬৯৮ বার প্রদক্ষিণ করে সাত হাজার ফটো সংগ্রহ

করেছিল। এক বছর পরে ম্যারিনার-৯ এর যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাওয়ায় আর ফটো পাঠাতে পারেনি। তবে এখনও সে প্রদক্ষিণ করছে মঙ্গলকে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, প্রায় শত বছর ধরে মঙ্গলের কক্ষপথে থেকে মঙ্গলের উপগ্রহের মত সে ঘুরতে থাকবে মঙ্গলের চার পাশে।

ম্যারিনার-৯ যে খবরগুলি সংগ্রহ করেছে তা দস্তুরমত বিস্ময়কর। বিজ্ঞানীরা সমস্ত ছবিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন মেরু অঞ্চলে জমা হয়ে আছে বরফ। তবে সে বরফ সাধারণ ভাবে জল ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে হয়নি। প্রচুর শৈত্যের জন্য কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস শুষ্ক বরফে পরিণত হয়ে আছে। তাপমাত্রা সেখানে নিতান্তই কম। এমনকি নিরক্ষ অঞ্চলেও রাতের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের প্রায় দেড়শ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে আসে। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশেও জমা হয়ে আছে বরফ। সে বরফের গভীরতা কিন্তু বেশি নয়। ম্যারিনার প্রদত্ত তথ্য থেকে আরও জানা গেছে, আবহমণ্ডলে সবচেয়ে বেশী আছে কার্বনডাই অক্সাইড, আর আছে স্বল্প অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, ওজোন এবং কার্বন মনোক্সাইড নামে কার্বন ও অক্সিজেনের একটি বিষাক্ত যৌগিক গ্যাস। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছেন, আবহমণ্ডলে যেহেতু অল্প অক্সিজেন গ্যাস আছে, সেই হেতু কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণীর জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা আরও একটি বিস্ময়কর তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেই তথ্যটি হল, মঙ্গলে নাকি এখনও চলেছে তুষার যুগ। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, অতি সাম্প্রতিক কালেও মঙ্গলের আবহমণ্ডলে ছিল প্রচুর জলীয় বাষ্প। ম্যারিনার-৯ এর পাঠান ছবিতে কতকগুলো আঁকা বাঁকা রেখা ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানীদের মতে ঐ আঁকা বাঁকা রেখাগুলি মঙ্গল পৃষ্ঠের নদী। তাঁদের আরও ধারণা, মঙ্গল পৃষ্ঠে খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসে তুষার যুগ। পৃথিবীতেও আসে তুষার যুগ। তবে কেন যে আসে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও এক মত হতে পারেন নি। কারও কারও মতে গ্রহদের উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেলেও

অভ্যন্তরে এখনও আছে যত সব গলিত তরল পদার্থ। সেই কারণে সেখানে চলছে অহরহ পরিবর্তন। যদি কোন কারণে কোথাও খুব রকমের পরিবর্তন এসে যায় তাহলে গ্রহের মেরু দেশেরও পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। তেমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে পূর্বের মেরুদ্বয়ের বদলে নতুন দুটি মেরুর উদ্ভব হবে এবং ধীরে ধীরে নতুন মেরুদেশ বরফ আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। এবং পূর্ব মেরুদ্বয়ের বরফও হঠাৎ গলে যাবে না! ফলে সমুদয় গ্রহপৃষ্ঠে বরফাচ্ছন্ন হয়ে জীব ও উদ্ভিদের বংশ লুপ্ত করে দেবে। বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় কারণও অনুমান করেছেন। সে কারণটি হল, যদি কোন কারণে আবহমণ্ডলে অবস্থিত সমূহ জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে গ্রহপৃষ্ঠে অবতরণ করে তাহলে আবহমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের অনুপস্থিতি গ্রহপৃষ্ঠের তাপ ধরার ক্ষমতা হারাবে। তারই ফলে নেবে আসবে প্রচুর শৈত্য এবং সমূহ জল একদিন বরফে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রহপৃষ্ঠের সমূহ জলীয় বাষ্প কী বৃষ্টির আকারে নেমে আসতে পারে?

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, নেমে আসতে পারে যদি বহির্জগৎ থেকে আগত ধুলা বালি গ্রহের আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে। তাহলে আবহমণ্ডলে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তার সবটুকুই ধুলাবালিকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হবে। শেষে জলের ফোঁটাগুলি বড় হয়ে বৃষ্টির আকারে ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে।

এগুলি সবটাই অনুমান মাত্র। তবুও তুষার যুগ যে মাঝে মাঝে হানা দেয় সে বিষয়ে প্রায় সকলেই এক মত। মঙ্গলে তুষার যুগ ঘন ঘন আবর্তিত হয় বলে সেখানে জীবের ক্রমবিবর্তন দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না সেইজন্য মঙ্গলে কোন উন্নত শ্রেণীর জীব নেই। তুষার যুগ অবস্থান করার জন্য অবহমণ্ডলের বহু পদার্থ তুষারে পরিণত হয়ে আছে। একদিন ঐ তুষার শেষ হলে মঙ্গলের আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তখন নতুন করে উদ্ভব হবে জীব ও উদ্ভিদের। কিন্তু দু-এক হাজার বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই পুনরায় স্থরু হবে তুষার যুগ। অতএব বোঝা যাচ্ছে, মঙ্গল উন্নত জীবের আবাসস্থল কিছুতেই হতে পারে না। তাছাড়া

বর্তমানে যে তুষার যুগ চলছে, তা শেষ হতেও বেশ কয়েক হাজার বছরের প্রয়োজন। অতএব আমরা মঙ্গলকে এক উষর মরুময় ভূমি এবং লক্ষ লক্ষ খাদে ভরা জীবে বাসের অনুপযুক্ত স্থান বলেই মনে করব।

॥ টেলিভিশন ॥

প্রকৃতপক্ষে দূরকে কাছে এনেছে বেতার এবং টেলিভিশন। ধরা যাক, দিল্লীতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভাষণ প্রদান করছেন আর আমরা পশ্চিম-বাংলার কোন একটা শহরে কিংবা শহরতলিতে একটা যন্ত্রের সামনে বসে তাঁকে প্রত্যক্ষ করছি এবং তাঁর বক্তৃতা শুনতে পাচ্ছি। আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে পৃথিবী থেকে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে যেদিন মানুষ প্রথম অবতরণ করেছিল সেদিন আমাদের অনেকেই সেই অবতরণ দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলাম যন্ত্রের মাধ্যমে। সে যন্ত্রটি আর কিছু নয়—টেলিভিশন।

টেলিভিশন বিশ্বের আশ্চর্য জিনিসগুলির মধ্যে একটি। বেতার যন্ত্রের মত টেলিভিশন যন্ত্র আজও সহজলভ্য হয়নি। আজও সুযোগ হয়নি যে কোন স্থানে টেলিভিশনের মাধ্যমে কোন ছবি বা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার। তার একটা বড় কারণ, বহু দূরবর্তী কেন্দ্র থেকে আগত শব্দকে যেমন বেতার গ্রাহক যন্ত্রে ধরা যায় তেমনটি অতি দূরবর্তী কেন্দ্র থেকে প্রেরিত ছবি বা দৃশ্য টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রে ধরা যায় না। আর একটা কারণ, দেশের প্রতিটি জনপদে বৈদ্যুতিকীকরণ ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। হয়ত একদিন এই দুটি অসুবিধাই দূর হবে। তখন প্রতি ঘরে ঘরে না হোক গ্রামে গ্রামে দু দশটি করে টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্র পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় সরকারও বিভিন্ন স্থানে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন করে সর্বসাধারণের শিক্ষা এবং অবসর বিনোদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে উৎসাহী হয়ে উঠছেন।

টেলিভিশন হচ্ছে বিনা তারে শব্দ প্রেরণের মত বিদ্যুৎ তরঙ্গের

সাহায্যে বহু দূরের ঘটনাবলী বা দৃশ্যাবলী যে ভাবে ঘটে থাকে ঠিক সেই ভাবেই মানুষের চোখের সামনে উপস্থাপিত করা। যেমন কলকাতার মাঠে খেলা হচ্ছে, আমরা অনেক দূরে থেকেও খেলোয়াড়দের চেহারা এবং তাঁরা যে ভাবে খেলছেন সেই গোটা দৃশ্যটাই নিখুঁতভাবে যন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি।

বিনা তারে শব্দ প্রেরণ কৌশল আবিস্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে হয়ত ছবিকেও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান করা যেতে পারে। যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের গলার স্বর শোনা যাবে এবং তার অবয়বও দেখা যাবে—কী মজা হবে তখন!

বহু বিজ্ঞানী বসে গেলেন যন্ত্রপাতি নিয়ে—যেন একটা হিড়িক পড়ে গেল। কে এই কাজে প্রথম সাফল্য লাভ করতে পারেন!

প্রথমে অবশ্য চেষ্টা করা হয়েছিল দৃশ্যের বদলে কেবল মাত্র ছবিকে দূরে প্রেরণ করতে। একাজে যিনি প্রথম কৃতকার্য হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী ফর্ণ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তার বা অন্য কোন কিছুর সাহায্য না নিয়ে ইটালী থেকে বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলো ছবিকে প্রেরণ করেছিলেন। মাত্র দুবছর পরে অর্থাৎ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলেন মার্কিন বিজ্ঞানী রেঞ্জার। তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আটলান্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে ছবি চালান করতে সক্ষম হলেন। এই ছবি প্রেরণের ঘটনাকে ঠিক ঠিক টেলিভিশন বলা না গেলেও টেলিভিশনের আদি পর্বের সূচনা হয়েছিল এই ভাবে। এঁদের আবিষ্কৃত পন্থার সে যুগে ইংলণ্ডের বেতার কেন্দ্রগুলি ছবি আদান-প্রদান করত। তবে সে ছবি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না।

টেলিভিশন বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রথম প্রবর্তন হয় ইংলণ্ডে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। আবিষ্কর্তার নাম জন লোগি বেয়ার্ড। ভদ্রলোক ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। অপরাপর অনেক বিজ্ঞানীর মত তিনিও এ বিষয়ে

গবেষণা করতেন। একদিন জন সমক্ষে একটা পরীক্ষা করে দেখালেন তিনি। একটি ঘরের মধ্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে তিনি একাই থাকলেন। সেখান থেকে দূরে আর একটা বাড়ীতে থাকল দর্শকবৃন্দ। বেয়ার্ড আগে থেকে সেখানে রেখে দিয়ে এসেছিলেন একটা যন্ত্র এবং যন্ত্রের সামনে খাটান ছিল একটা পর্দা। দর্শকরা একসময় সবিস্ময়ে দেখল, পর্দার উপর ভেসে উঠেছে একজন মানুষের চলন্ত ছবি। ঠিক যেন সিনেমার পর্দায় দেখা জীবন্ত মানুষের অবিকল চলন্ত প্রতিমূর্তি। অবাক হয়ে গেল তারা। সেই সঙ্গে টেলিভিশন আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করলেন জন লোগি বেয়ার্ড। তাঁর এই মহৎ আবিষ্কারকে স্বীকৃতি জানালেন বিশ্বের বিজ্ঞান সমাজ নোবেল পুরস্কার প্রদান করে।

বেয়ার্ডের পরীক্ষা থেকে বোঝা যায়, প্রথমে দূরত্ব ছিল অতি সামান্য। পরে বেয়ার্ড নিজেই প্রেরক যন্ত্র এবং গ্রাহক যন্ত্র উভয় যন্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে সেই দূরত্বকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বেয়ার্ডের পরেও হয়েছে এই যন্ত্রের উন্নতি সাধন। বিশেষ করে জোরকিন নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী বেয়ার্ডের পদ্ধতির যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছিলেন। আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশন জোরকিনের পদ্ধতিকে গ্রহণ করেই প্রথম টেলিভিশন প্রদর্শনের সূচনা করেন। আজকের টেলিভিশন তারই উন্নত রূপ।

টেলিভিশনের মূলে আছে আমাদের চোখের সামান্যতম ত্রুটি। সে ত্রুটিটা হচ্ছে, আমাদের চোখের সামনে কোন জিনিসকে উপস্থাপিত করলে সেটি সঙ্গে সঙ্গে মস্তিকে অনুভূতি জাগায় না। অনুভূতি জাগতে অল্প একটু সময়ের প্রয়োজন হয়। যদিও সে সময়টা অতি নগন্য অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই সময়টুকুর মধ্যে একটা ছবিকে উপস্থাপিত করে এবং তাকে সরিয়ে নিয়ে আর একটা ছবিকে যদি উপস্থাপিত করা যায় তাহলে আমাদের চোখ কিছুতেই ধরতে পারবে না। ত্রুটিটুকু না থাকলে টেলিভিশন সম্ভব হত না।

প্রথমে বেয়ার্ড যে পদ্ধতিতে টেলিভিশন প্রদর্শন করেছিলেন সেই

পদ্ধতিটিই বর্ণনা করা হল। এর জন্য যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রটিকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন সেটির নাম ফটো ইলেকট্রিক সেল। গোটা ছবিটাকে একসঙ্গে চালান না করে বেয়ার্ড ছবি বা দৃশ্যকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করেছিলেন। ছবি বা দৃশ্যের কোন বিন্দুতে আলো ফেলে যদি সে আলোককে ফটো ইলেকট্রিক সেলের ভেতর পাঠান যায় তাহলে সেই বিন্দুর আলো তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত হবে। এই সত্যকে কাজে লাগিয়ে বেয়ার্ড সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট্য একটা গোলাকার ধাতব চাকতি ব্যবহার করেছিলেন। চাকতিকে জোরে ঘোরানোর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আর্কল্যাম্প থেকে আগত আলোক রশ্মিকে লেন্সের সাহায্যে চাকতির উপর ফেলেছিলেন। সেই আলো চাকতির ছিদ্রপথে গিয়ে ছবির উপর পড়েছিল। যেহেতু চাকতিকে ঘোরান হচ্ছিল ভয়ানক জোরে এবং এমন ভাবে ঘোরানো হয়েছিল সে আলো ছবির উপর প্রত্যেকটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে ক্রমিক পর্যায়ে পর পর গোটা ছবিটাকে আলোকিত করেছিল। ছবির বিভিন্ন বিন্দু থেকে যে আলো এসেছিল তার পরিমাণ ছিল বিভিন্ন। কম জোরে আলো ফটো ইলেকট্রিক সেলে কম জোরের বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল এবং বেশী জোরের আলো বেশী জোরের বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করেছিল। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সেইসব বিদ্যুৎপ্রবাহকে বেতার প্রেরক যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন উচ্চহারে বিদ্যুৎ স্পন্দনের উপর চাপিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল একটা মিশ্রণ বিদ্যুৎ তরঙ্গ। এখানেও ব্যবহার করা হয়েছিল প্রেরকযন্ত্র, আকাশতার এবং কাইক্রোফোন।

দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনা কিংবা কথাকে প্রেরণ করার জন্য বেরার্ড দ্বিতীয় একটি প্রেরক যন্ত্র, একটি আকাশতার এবং একটি মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। ঠিক বেতার প্রেরক যন্ত্রের মতই।

টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রেও ছিল অনুরূপ ব্যবস্থা। সেখানে যে আকাশতারের ব্যবস্থা ছিল তাতে ধরা পড়েছিল প্রেরক যন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ। গ্রাহক যন্ত্রের প্রধান কাজ ছিল মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ

থেকে কম ও বেশী জোরের বিদ্যুৎ প্রবাহকে পৃথক করে নেওয়া। এই উদ্দেশ্যে সেই বিদ্যুৎ প্রবাহকে বিশেষ এক ধরণের বায়ু শূন্য টিউবের ভেতর দিয়ে চালনা করা হয়েছিল। ফলে সেই আলো বিশ্লেষিত হয়ে কম জোরের আলোও বেশী জোরে আলোতে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রেরক যন্ত্রের মত এখানেও একটা চাকতিকে ঘোরানর ব্যবস্থা ছিল। টিউব থেকে আগত আলো এখানেও চাকতির ছিদ্র পথে চালিত হওয়ার ফলে পূর্বের মত পরপর ক্রমিকভাবে পর্দার উপর পড়েছিল। গান ও কথাকে শোনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বেতার গ্রাহক যন্ত্র, আকাশতার এবং মাইক্রোফোন।

জোরিকিনের পদ্ধতিতে প্রেরক যন্ত্রে ফটো ইলেকট্রিক সেলের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছিল ইকনোস্কোপ নামে যন্ত্র এবং গ্রাহক যন্ত্রে বায়ুশূন্য টিউবের পরিবর্তে কিনোস্কোপ নামে আর একটি যন্ত্র। উভয় যন্ত্রই ক্যাথডরে টিউব ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেই টেলিভিশন প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে আবার অথিকন, ইমেজ অর্থিকন্, ডিভিকন্ প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে টেলিভিশন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এই যন্ত্রগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ছবি বা দৃশ্যের সুস্পষ্ট রূপ তো পাওয়া যায়ই অধিকন্তু স্বাভাবিক রঙ দেখতে পাওয়া যায়। তবে টেলিভিশনের পর্দার উপর খুব বড় আকারের ছবি পাওয়া যায় না। টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রের দূরত্ব অধিক হলে ছবি অস্পষ্ট হয়ে উঠে। তার একটা কারণও আছে। প্রেরক যন্ত্র থেকে যে মিশ্র বিদ্যুৎ স্পন্দনের সৃষ্টি করা হয় তার কম্পাঙ্ক বেশী হওয়া দরকার। সাধারণতঃ সেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে ১০ সেন্টি-মিটারের কম হতে হয়। সেই কারণে প্রেরক যন্ত্রে ব্যবহার করতে হয় হ্রস্ব তরঙ্গ। কিন্তু হ্রস্ব তরঙ্গের অসুবিধা অনেক। আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে হ্রস্ব তরঙ্গ খুব বেশী দূর যেতে পারে না। পৃথিবীর উপর দিয়ে যেতে যেতে মাত্র পঞ্চাশ ষাট মাইলের পর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে শেষ হয়ে যায়। তাই টেলিভিশনের দৃশ্যাবলী ঐ পঞ্চাশ ষাট মাইল অথবা আশি থেকে নব্বুই কিলোমিটার পর্যন্তই পাঠান সম্ভব হয়।

টেলিভিশনের এই অসুবিধার জন্য বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। আমেরিকাই এই ব্যবস্থার প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে মহাকাশে টেলস্টার নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে। বেশ সফলও হয়েছিল। টেলস্টার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স এই তিন দেশের মধ্যে টেলিভিশনের যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই বছর ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে "রিলে" নামে আরও একটি কৃত্রিম উপগ্রহকেও মহাকাশে স্থাপন করেছিল আমেরিকা। সেটি সংযোগ রক্ষা করেছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সারা ইউরোপ ভূখণ্ড এবং ব্রাজিলের মধ্যে।

এখন অবশ্য আরও অনেক উপগ্রহকে স্থাপন করা হয়েছে মহাকাশে এবং ভবিষ্যতে এদের সংখ্যা আরও বাড়বে। ভারতবর্ষও বাদ পড়েনি। তারও পরিকল্পনা আছে কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত সারাদেশে টেলিভিশনের যোগাযোগ স্থাপন করবে।

এই জাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ সাধারণ মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ অপেক্ষা একটু আলাদা ধরণের। এদের মধ্যে থাকে অসংখ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে যে সঙ্কেত পাঠান হয় তা ঐ উপগ্রহে ধরা পড়ে। তারপর সেখানকার অসংখ্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে "রিলে" হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসে। সেই কারণে উক্ত ব্যবস্থায় টেলিভিশনের দৃশ্যাবলী বেশ জোরাল হয়।

পৃথিবী পৃষ্ঠ আবার সমতল নয়। পৃথিবীর সর্বত্র টেলিভিশন যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে অবশ্যই কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু মাত্র একটি উপগ্রহের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করতে হবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সর্বসমেত যদি তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহকে সব সময় চালু রাখা যায় তাহলেই সম্ভব হতে পারে। তিনটির কারণ, পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের মাথার উপর অন্ততঃ পক্ষে একটিকে যে কোন সময় পেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আজ

পর্যন্ত বেশ কিছু সংখ্যক উপগ্রহকে পাঠান হয়েছে। তাদের কোন কোনটির যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে, কোনটির বা সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদন করে চলেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশ সমূহ এখন এইভাবেই টেলিভিশনের যোগাযোগ হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যবহার আরও উন্নতি হবে।

॥ ডেভির নিরাপত্তা বাতি ॥

খনি গর্ভ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেখানে কাজ করার বিপদও অনেক। বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়ে থাকে, ধস নামে, আরও কত কী! কয়লার খনিতে আবার আলো নিয়ে ঢোকার উপায় নেই। কেননা কয়লার খনির সব জায়গায় জমা থাকে অল্প বিস্তৃত মিথেন গ্যাস বা মার্স গ্যাস। মিথেন গ্যাস কার্বন এবং হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক। পচা পুকুরে বা জলা ভুমিতে আপনা হতেই ঐ গ্যাসের জন্ম হয়। তাই গ্যাসটির নাম মার্স গ্যাস বা "জলাভূমির গ্যাস"।

মার্স গ্যাসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওর সঙ্গে বাতাসের মিশ্রণ ঘটলে অতি অল্প তাপমাত্রায় সামান্য আগুন কিম্বা আলোর সংস্পর্শে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে উঠে। কয়লা খনির খাদে মার্স গ্যাস জমা থাকে বলে মোমবাতি অথবা কোরোসিনের বাতি ব্যবহার করা ভয়াবহ বিপজ্জনক। কিন্তু খনিতে তো কাজ করতে হবে।

কয়লা হচ্ছে এমন একটি পদার্থ, যা না হলে মানুষের একদণ্ডও চলে না। এখন অবশ্য বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োগ করে মানুষ হরেক রকমের কাজ সম্পন্ন করছে তবুও কয়লার ব্যবহার আদৌ কমছে না। এখনও বহু ট্রেনে কয়লার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। কলকারখানায়, ধাতু নিষ্কাশনে, আলকাতরা উৎপাদনে রান্নার কাজে কয়লার ব্যবহার চিরকালই থাকবে। এ যে প্রয়োজনীয় জিনিস খনি থেকে উত্তোলন না করলে চলবে কেন ?

অপরাপর খনির চেয়ে কয়লার খনিতে কাজ করার বিপদ বেশী। সেখানে ধস নামে প্রচুর। বিষাক্ত গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে অনেক কর্মী মারা যায়। কখনও কখনও ভূগর্ভে সঞ্চিত জলরাশি হঠাৎ খাদের মধ্যে প্রবেশ করে কুলি কামিনদের ডুবিয়ে মারে। তার উপর তো আছে আলো জ্বালাবার বিপদ। এখন অবশ্য বহু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে তবে আলো জ্বালাবার বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ডেভির নিরপত্তা বাতি ব্যবহার করে।

এই বাতির আবিষ্কর্তা স্যার হামফ্রে ডেভি। খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। বাতিটি সাধারণ কেরোসিন ল্যাম্পের মত এবং কেরোসিনেই জ্বালান হয়ে থাকে। বাতিটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাতির উপর যে চিমনিটা ব্যবহার করা হয় তার উপরিভাগটা তামা কিংবা লোহার তার জালি দিয়ে তৈরি। তামা কিংবা লোহার তাপের অত্যন্ত সুপরিবাহী। অর্থাৎ এইসব তার-গুলোর কোন একটি স্থান তাপ লাভ করলে সেই তাপকে অতি দ্রুত অন্য স্থানে সরবরাহ করতে পারে। ডেভির আলো থেকে যে তাপ নির্গত হয়, উপরিভাগে তার জালি থাকার জন্য দ্রুত পরিবহনের দ্বারা অন্য জায়গায় চালনা করে দেয়। বাহিরের গ্যাস কিছুতেই জ্বলনাঙ্কে পৌছাতে পারে না। তাই মার্স গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রন বিস্ফোরক হওয়া সত্ত্বেও প্রজ্বলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কিছুতেই জ্বলে উঠে খনির মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটা দিয়াশলাইর কাঠিকে আগুনে গুঁজে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে না। অল্প একটু সময়ের দরকার হবে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে উত্তপ্ত হতে হতে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছে যায়। যে তাপমাত্রায় দিয়াশালাই কাঠির বারুদকে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। ঐ তাপমাত্রায় দিয়াশালাই কাঠির জ্বনাঙ্ক। যদি সেই তাপমাত্রার কম তাপমাত্রায় রাখা হত তাহলে সে কিছুতেই জ্বলে উঠতে পারত না। এইভাবে যে কোন পদার্থে প্রজ্জলিত হওয়ার একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে।

বিস্ফোরক পদার্থের বেলায় এই উষ্ণতা খুবই কম। তা সে কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস যাই হোক না কেন।

কয়লা খনিতে মার্স গ্যাসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। আলো কর্তৃক উদ্ভূত তাপকে তারজালি দ্রুত পরিবহন করে বাহিরের গ্যাস মিশ্রণকে একদিকে যেমন জ্বলনাঙ্ক পৌঁছাতে দেয় না অপর দিকে জ্বলে থাকার জন্য যে বাতাসের প্রয়োজন হয় তাকেও প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে না। খাদের মধ্যে মিথেন বা মার্স গ্যাসের অস্তিত্বও নির্ণয় করা যায় এই বাতির দ্বারা। যদি বাতাসের সঙ্গে মিথেন গ্যাস থাকে তাহলে বায়ু প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মিথেন গ্যাসও প্রবেশ করে এবং বাতিটি নীল শিখায় জ্বলতে আরম্ভ করে। তখনই বুঝে নেওয়া হয় খাদের মধ্যে মিথেন গ্যাস আছে। পরিমাণটা নির্ণয় করে নেওয়া হয় অপর একটা যন্ত্রের সাহায্যে। যদি দেখা যায় মিথেন গ্যাসের পরিমাণ ধীরে ধীরে বিপদসীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তখন সতর্কমূলক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত ডেভির নিরাপত্তা বাতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখন খনি গর্ভকে আলোকিত করার জন্য ও বাতির প্রয়োজন হয় না। বৈদ্যুতিক বাতিই এখন সে স্থান দখল করেছে। সেখানে দিনের আলোর মতই সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তবুও ডেভির নিরপত্তা বাতির চাহিদা কমে নি। খনিতে দাহ্য গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করার একটা বড় সহায় হচ্ছে এই বাতি। আলোটির কলকব্জা কিছুই নেই, তৈরী করাও এমন কিছু কঠিন নয়। তবুও এই সাধারণ একটি আলো লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করে আসছে। ডেভির এই আবিষ্কারের সত্যি কোন তুলনা হয় না।

॥ টারবাইন ও রিঅ্যাক্টর ॥

টারবাইন কথাটির সঙ্গে আমাদের প্রায় সবারই পরিচয় আছে। বিশেষতঃ নদীতে বাঁধ দিয়ে বা জলপ্রপাতের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে টারবাইন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই কথাটা কার না জানা আছে?

টারবাইন শব্দটি এসেছে প্রাচীন লাটিন ভাষা থেকে। এর অর্থ হচ্ছে যা আবর্তন করে বা ঘোরে। এটি কেবলমাত্র একটি ধাতু নির্মিত চক্র। গতিশীল জলের দ্বারা অথবা অন্য কোন তরল পদার্থের দ্বারা ওকে আবর্তন করান হয়।

টারবাইনের আবিষ্কার হয়েছে অতি প্রাচীনকালে। কে যে টারবাইনের আবিষ্কর্তা, সে কথা আজ কেউই বলতে পারেন না। শোনা যায়, সুদূর অতীতে গ্রীক ও মিশর দেশের অধিবাসীরা শস্যকে গুঁড়া করার কাজে এবং জল সেচের কাজে টারবাইন জাতীয় এক রকমের চাকা ব্যবহার করত। মধ্যযুগেও টারবাইনের ব্যবহার অব্যাহত ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। তবে সেগুলির কোনটিই আজকের মতো ছিল না।

আধুনিক টারবাইনের প্রথম রূপকার একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। নাম তাঁর ফুর্ণের। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিনি এক ধরনের টারবাইন নির্মাণ করেন। পঞ্চাশ অশ্বক্ষমতা যুক্ত এই টারবাইনটি অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। সেদিন ওটিকে ব্যবহার করে যখন সুফল পাওয়া গেল তখন অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী যন্ত্রটির আরও উন্নতি সাধনে যত্নবান হলেন। ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হল নানা ধরনের টারবাইন।

প্রথমে জলের দ্বারাই ঘোরানো হত টারবাইনকে। পরে জলীয় বাষ্প, গ্যাস এমন কি বাতাসের সাহায্যে টারবাইনকে ঘোরানোর প্রচেষ্টা চলল। বিজ্ঞানীদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। একে একে আত্মপ্রকাশ করল জলীয় বাষ্প, গ্যাস এবং বাতাসের উপযোগী টারবাইন।

বাষ্পীয় টারবাইনের আবিষ্কতা দুজন বিজ্ঞানী। তাঁদের একজন সুইডেনের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিয়িনার 'লাভাল' আর একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার 'পার্সন'। দুজনেই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে আবিষ্কার করেন বাষ্প চালিত টারবাইন। তাঁদের আবিষ্কারের পর থেকে গ্যাস এবং বায়ু চালিত টারবাইন আবিষ্কার করা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই টারবাইনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে সুরু হয়। আজকাল ঘুরন্ত টারবাইন বড় বড় কলকারখানায়, জলযানগুলিতে এমনকি উড়োজাহাজ চালানোর কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এককথায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র ডাক পড়েছে টারবাইনের।

বর্তমান চার রকমের টারবাইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেগুলি হল জলের উপযোগী টারবাইন, জলীয় বাষ্পের উপযোগী টারবাইন, গ্যাসের উপযোগী টারবাইন এবং বাতাসের উপযোগী টারবাইন।

জল টারবাইন নদী কিংবা জলপ্রপাতের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। উচ্চ স্থান থেকে জল যখন প্রবল বেগে টাই-বাইনের চক্রের উপর পতিত হয়, তখন টারবাইন আপনা হতেই প্রবল বেগে আবর্তন করে। টারবাইন চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে ডায়নামো। ডায়নামো ঘোরানোর জন্য আর ইঞ্জিনের আবশ্যক হয় না। টারবাইন ঘুরলেই ডাইনামো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখন অবশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বাষ্পীয় টারবাইন সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র। এই টারবাইনকে আবর্তন করানোর জন্য জলের পরিবর্তে উচ্চ চাপের জলীয় বাষ্প ব্যবহার করা হয়। টারবাইনের এক প্রান্ত দিয়ে গ্যাসকে অতিক্রম করান হয়, অপর প্রান্তে বাষ্পকে শীতল করে জলে পরিণত করার ব্যবস্থা থাকে। গ্যাস যখন টারবাইনের ভেতর দিয়ে পরিচালিত হয় তখন তার আয়তন পায় এবং টারবাইন চক্রকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করে। এই টারবাইন ইঞ্জিন অপেক্ষাও শক্তিশালী এবং ব্যবহার করার সুবিধে। যে সব জায়গায় ইঞ্জিন ব্যবহার

করার অসুবিধে আছে সেখানে বাষ্পীয় টারবাইন বেশ কার্যকরী হয়ে থাকে।

গ্যাস টারবাইন অনেকটা বাষ্পীয় টারবাইনের মতই। গ্যাস টারবাইনকে আবর্তন করান হয় জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের দ্বারা। সাধারণতঃ কেরোসিন গ্যাস বা অন্য কোন প্রাকৃতিক গ্যাস এই টারবাইনের উপযোগী। আজকাল হামেশাই জাহাজ, উড়োজাহাজ এবং রেল ইঞ্জিন চালানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে গ্যাস টারবাইনকে। উক্ত টারবাইন যন্ত্র ব্যবহার করার সবচেয়ে সুবিধা এই যে, যে কোন টারবাই অপেক্ষা গ্যাস টারবাইন হালকা এবং ছোট।

আজকাল আবার টারবাইনকে সুদৃঢ় এবং উচ্চ তাপ সহনশীল করার জন্য নানা প্রকার ধাতুসঙ্কর ব্যবহার করা হচ্ছে। জলীয় বাষ্প গ্যাস, বাতাস প্রভৃতি সব কিছুকে বাদ দিয়ে গ্যাস টারবাইনকে ঘোরানা হচ্ছে পরমাণু শক্তির দ্বারা, টারবাইনের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল।

আজকাল নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর দ্বারা উৎপন্ন তাপ শক্তির সাহয্যে বাষ্প বা উচ্চ চাপ যুক্ত উত্তপ্ত গ্যাস প্রস্তুত করে টারবাইন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রকে চালিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য ব্যবহৃত রিঅ্যাক্টরকে বলা হয় পাওয়ার রিঅ্যাক্টর।

সম্প্রতি নানা ধরণের রিঅ্যাক্টর আবিষ্কৃত হয়েছে। সব রিঅ্যাক্টরের মূল নীতি হল, পরমাণুর কেন্দ্রককে বিভাজন করে শক্তি উৎপন্ন করা। তবে বিভিন্ন প্রকার রিঅ্যাক্টরের কার্য প্রণালী বিভিন্ন। সাম্প্রতিক কালে যে রিঅ্যাক্টরগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে তাপীয় রিঅ্যাক্টর, ফাস্ট রিঅ্যাক্টর, ব্রীডার রিঅ্যাক্টর ও পাওয়ার রিঅ্যাক্টর প্রধান। তাপীয় রিঅ্যাক্টরের ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে ইউরেনিয়ামকে ব্যবহার করা হয়। অপরাপর ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা পরমাণু কেন্দ্রককে বিভাজন করে তাপ শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

তাপীয় রিঅ্যাক্টরে জল, গ্রাফাইট, ভারি জল প্রভৃতি প্রশমক বা মডারেটর ব্যবহৃত হয়। মডারেটরের কাজ হচ্ছে বিভাজন প্রক্রিয়ায়

নির্গত নিউট্রনের গতি মন্দীভূত করা। এই নিউট্রনরাই কেন্দ্রক বিভাজন ক্রিয়া সংঘটিত করে। কিন্তু নিউট্রনের পরিমাণও সীমিত করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার করা হয় নিউট্রন নিয়ন্ত্রক কোন বস্তু। উক্ত কাজে ক্যাডমিয়াম বা রূপা বেশ কার্যকরী বিভাজন ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন প্রভূত তাপশক্তিকে সংযত করার জন্য জল, তরল ধাতু প্রভৃতি প্রবাহিত করা হয়।

।। ট্যাঙ্ক ।।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব ধ্বংসকারী জিনিসগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে ট্যাঙ্ক একটি। ট্যাঙ্ক যুদ্ধযান বিশেষ। শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্কের প্রধান কাজ। প্রাচীন কালে যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্ক ব্যবহার না করা হলেও রথ প্রভৃতি ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন দেশে রথের চেহারা ছিল বিভিন্ন। ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যগুলিতে রথের যে বর্ণনা আছে তা থেকে মনে হয়, রথ এবং রথের আরোহীদের হঠাৎ ঘায়েল করা যেত না। তাছাড়া সে যুগে শত্রুর আঘাত যাতে গায়ে না লাগে তার জন্য বর্ম ব্যবহার করা হত।

সে সব দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে কত মারনাস্ত্র, কত কলা কৌশল। যুদ্ধের ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে সব যুগের উপর টেক্কা দিয়েছে বিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই সংঘটিত হয়েছিল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ এবং এই বিশ্বযুদ্ধেই প্রকৃত প্রয়োগ হয়েছিল ট্যাঙ্কের।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শত্রুপক্ষের গুলি বর্ষণকে উপেক্ষা করে সহজে এগিয়ে যাওয়া ও শত্রু সৈন্যের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর একজন ই. ডি. সুইনটনের পরামর্শে সৈন্যরা হোল্ট ক্যাটরপিলর ট্রাকটরকে স্থল যুদ্ধে ব্যবহার করল। শক্ত আবরণযুক্ত

ট্রাকটরটি শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হল না। অধিকন্তু এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় অবলীলাক্রমে গড়িয়ে চলে গেল। ট্রাকটরের মধ্যে যে সব সৈন্যরা ছিল তারা ভেতর থেকে প্রবল গুলি বর্ষণ করে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। সেই থেকে বন্দুক ও কামানের গোলা নিরোধক কঠিন ধাতব আবরণযুক্ত এক ধরণের যুদ্ধযান নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন বিশেষজ্ঞরা স্যুইটনের হোল্ট ক্যাটরপিলর ট্রাকটরেরই উন্নত রূপ হল আজকের ট্যাঙ্ক।

টি.জি. টুল্ক নামে আর একজন বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর অধিনায়কই ট্যাঙ্কের প্রকৃত পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ যে স্থলযানটি নির্মিত হল, সেটিকে প্রথম ব্যবহার করা হল, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ সৈন্য বাহিনী সোমের যুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে উনপঞ্চাশটি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল; যুদ্ধে এত অধিক সংখ্যক ও কার্যকরী স্থলযান এই প্রথম ব্যবহৃত হয়। সেই যুদ্ধে জার্মানীরা বড় অসুবিধায় পড়ে গেছিল। অপরাপর যুদ্ধেও ট্যাঙ্কের কৃপায় বৃটিশ বাহিনী বিপুলভাবে জয়লাভ করল। সত্য কথা বলতে কি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্থল ভাগের উপর জার্মানদের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল ঐ ট্যাঙ্ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে ট্যাঙ্কগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল তাদের গতিবেগ বেশী ছিল না। সে সময় খুব দ্রুতগামী ট্যাঙ্কের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র বার মাইল। মানুষ যেভাবে পথ হাঁটে তার প্রায় তিনগুণের মত ছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর টাঙ্কের আরও উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালান হয়। বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সেভিয়েত ইউনিয়ন নানা ধরণের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল। সে সময় ট্যাঙ্কের গতিবেগ ছিল ২০ মাইল থেকে পঞ্চাশ মাইল।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক ব্যবহারের একটা বড় সুবিধা এই যে, বন জঙ্গল পাথুরে এলাকা সব জায়গা দিয়ে ট্যাঙ্ককে চালনা করা যায়। অবশ্য ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান আবিস্কৃত হলেও সাধারণ গুলি গোলা ট্যাঙ্ক বা ট্যাঙ্ক

আরোহীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধান এবং শত্রু সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্যই ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা।

॥ সাবমেরিন ॥

সাবমেরিন এমন একটি জলযান যা ইচ্ছামত জলের উপরে অথবা গভীর সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে। এটিও একটি যুদ্ধযান। দুই বিশ্বযুদ্ধে সমুদ্রে শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলিকে ধ্বংস করার কাজে সাবমেরিন ও টির্পেডোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাবমেরিনকে বাংলায় বলা হয় ডুবোজাহাজ।

সাবমেরিনের আকৃতি অনেকটা সাধারণ জলযানের মত। মাঝখানটা মোটা এবং দুদিকে ক্রমশঃ সরু। সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ জলযানের মত ওর বাইরের খোল একটা থাকে না। খোলের একটা বহিরাবরণ থাকে এবং দুই আবরণের মধ্যবর্তী স্থান থাকে ফাঁকা। বাইরের আবরণ অপেক্ষা আরও বেশী শক্ত ও মজবুত। ফাঁকা অংশটুকু জল বা বাতাস দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়।

জলের ভেতরে ওঠানামা করতে হয় বলে সাবমেরিনে কতকগুলো জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। জলে ডোবার প্রয়োজন হলে স্বয়ংক্রিয় মেসিনের দ্বারা ট্যাঙ্কগুলিকে জলে ভর্তি করে নেওয়া হয়। ফলে আপনা হতেই জলে ডুবে যায় সাবমেরিন। জলের তলা থেকে উপরে উঠতে হলে ট্যাঙ্কগুলোকে খালি করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।

সাবমেরিন চালানোর জন্য দু-রকম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জলের উপর দিয়ে যখন অগ্রসর হয় তখন ব্যবহার করা হয় ডিজেল ইঞ্জিন। জলের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় ডিজেল ইঞ্জিন কাজ করতে

পারে না। তার একমাত্র কারণ, জলের তলায় বাতাস নেই এবং বাতাসের অভাবে ডিজেল ইঞ্জিন ক্রিয়া করতে পারে না। সেই কারণে জলের তলায় সাবমেরিনকে চালতে হলে ইলেকট্রিক মোটরের প্রয়োজন হয়।

জলের তলার অবস্থান কালে সমুদ্রের উপরের দৃশ্য অবলোকন করার জন্য ব্যবহার করা হয় পেরিস্কোপ নামে একটি বস্তু। আর বাতাস সংগ্রহের জন্য দরকার হয় স্নরকেল নামে একটি ফাঁপা নল বিশিষ্ট যন্ত্র। ইঞ্জিন চলাকালে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকেও প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা থাকে। কেননা শব্দ হলে দূর থেকে শত্রুপক্ষ সাবধান হয়ে যাবে।

সাবমেরিন মাঝে মাঝে বিপদেও পড়ে। তাই তার চালকদের নিরাপত্তার জন্য একটা বিশেষ বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ সাবমেরিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডুবোজাহাজটির ছিল "ফুলটন'। স্টীম বোট আবিষ্কর্তা রবার্টফুলটন নামে একজন জাহাজ প্রস্তুতকারক বিশেষ যানটি তৈরি করেছিলেন বলে আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই নাম। এই জাহাজটিকে ঠিক ঠিক সাবমেরিন বলা যায় না। তবে ফুলটন জাহাজটি সমুদ্রের তলদেশে ডুব দিয়ে অবস্থান করতে পারত। পরে সাইমন লেক সমুদ্রের তলায় চালনা করার ব্যবস্থা করে প্রকৃত সাবমেরিন আবিষ্কার করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে উভয় পক্ষই ব্যবহার করেছিল ইঞ্জিনযুক্ত ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় সাবমেরিনকে ধ্বংস করারও উপায় আবিস্কৃত হয়েছিল। বিশেষতঃ রেডার আবিস্কৃত হওয়ায় অতি সহজভাবে সমুদ্রের তলদেশে লুকিয়ে থাকা সাবমেরিনের খোঁজ পাওয়া যেত। ধ্বংসের হাত থেকে সাবমেরিনকে রক্ষা করার জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওকে আরও উন্নত করা হয়েছে। বর্তমানে আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সাবমেরিন চালনার কাজে পরমাণুশক্তিকে নিয়োগ করেছেন। এই প্রচেষ্টা প্রথম ফলপ্রসূ হয়েছিল ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে।

তারপর আরও উন্নতি সাধন করেছেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা। আজকাল আমেরিকা কর্তৃক নির্মিত ডুবোজাহাজগুলো মাসের পর মাস সমুদ্রের তলায় ডুবে থাকতে পারে। আমেরিকার দেখাদেখি বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিও পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন নির্মাণ করার জন্য তৎপর হয়েছে।

এবার টর্পেডোর কথায় আসা যাক। টর্পেডো হচ্ছে এক রকমের ডুবো বোমা। এই বোমার এত প্রচণ্ড শক্তি যে, একটা সুবৃহৎ জাহাজকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে জলের তলায় ডুবিয়ে দিতে পারে। টর্পেডো আবার স্বয়ংচালিত। জাহাজ ধ্বংস করার কাজে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজই ওকে ব্যবহার করে থাকে।

টর্পেডোতে থাকে শত্রু জাহাজ অনুসন্ধানের নিমিত্ত স্বয়ংক্রিয় ইলেট্রনিক যন্ত্রপাতি আর থাকে একটি নিস্ফোরণ কক্ষ। ওকে চালনা করা হয় ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে। কখনও কখনও ইঞ্জিনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যখনই টর্পেডোকে ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা হয় তখনই লিভারের সাহায্যে যন্ত্রপাতিসমূহ কার্যকারী হয়ে উঠে। দূরবর্তী জাহাজের শব্দ অনুসন্ধানের জন্য আপনা হতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিসমূহ সক্রিয় হয়। শ্রবনের উপযোগী যন্ত্রও বসান থাকে টর্পেডোতে। জাহাজের শব্দ শুনেই শব্দকে অনুসরণ করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় টর্পেডো। তারপর জাহাজের কাছাকাছি এলে চুম্বক শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রচণ্ড-ভাবে জাহাজের গায়ে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে এবং জাহাজের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তাছাড়া জাহাজের গায়ে আগুন ধরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটির সলিল সমাধি ঘটে। টর্পেডোর ওজন বড় কম নয়। এক একটা ওজনে দশ থেকে বিশ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

টর্পেডোর আবিষ্কর্তা অস্ট্রিয়ার নৌ-সেনা বিভাগের অধ্যক্ষ 'স্যার লুপিস'। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ ধ্বংস করার জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। তবে সে সময় ওকে ব্যবহার করা হত না কিন্তু তৈরি করার পদ্ধতিটি জেনে

নিয়েছিল অনেক দেশ। টর্পেডো প্রকৃত পক্ষে ব্যবহার হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে ঐ বছরে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে জাপানীরাই প্রথম ব্যবহার করেছিল টর্পেডো। জাপানীদের টর্পেডো ছিল এক রকম স্বয়ং চালিত বোমা। ওজন তত বেশী ছিল না। এবং যন্ত্রপাতিও তেমন কিছু ব্যবহার করা হত না। সে সময় টর্পেডোকে দূর থেকে শত্রু জাহাজের দিকে নিক্ষেপ করা হত।

টর্পেডোকে ভয়াবহ করে গড়ে তোলার মূলে আছে জার্মানীদের প্রচেষ্টা। দুটি বিশ্বযুদ্ধে টর্পেডোকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের বুকে একরকম বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল জার্মান সাবমেরিনগুলো। তবে জার্মানদের সেই টর্পেডো আর নেই। বর্তমানে ওর ভয়াবহতা অনেক গুণে বেড়ে গেছে। উন্নত গবেষণার ফলে পূর্বের টর্পেডো আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং নিশানাও এদের অব্যর্থ।

॥ থার্মোমিটার ॥

আমরা জানি তাপের শক্তি ভয়ানক। তাপ প্রয়োগে যে পরিবর্তন হয় না এমন বস্তু বোধ করি পৃথিবীতে কিছুই নেই। তবে পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কোথাও তাপ প্রয়োগ করতে হয় বেশী, আবার কোথাও কম। তাপ কঠিন বস্তুকে তরকে রূপান্তরিত করে এবং তরলকে রূপান্তরিত করে গ্যাসে। কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে তাপ বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। তারপর বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। প্রথম যে পরিবর্তন সাধিত হয়, সেটি উষ্ণতা বৃদ্ধি। সেই কারণে তাপ ও উষ্ণতা এক কথা নয়। তাপ হচ্ছে কার্য এবং উষ্ণতা হচ্ছে কারণ অথবা উষ্ণতাকে তাপের ফলও বলা যেতে পারে।

এক কেটলি ঠাণ্ডা জলকে যদি জ্বলন্ত উনানের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কেটলির ঠাণ্ডা জল ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠবে। পরিশেষে কেটলির জল ফুটতে আরম্ভ করবে। এখানে উনান থেকে তাপ ধাতব

কেটলির মধ্য দিয়ে জলের ভেতর সঞ্চালিত হল। তাপের ফলে এই যে পরিবর্তন - মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে ভাবিয়ে এসেছে। তাপ সম্বন্ধে মানুষ যখন কোন তথ্যই আবিষ্কার করেনি তখন বুঝতে পারত উষ্ণতার পরিবর্তন ও তাপের অপরিমেয় শক্তির কথা। তাই তো কৌতূহলী মন নিয়ে আরম্ভ করেছিল তাপ সম্বন্ধে গবেষণা।

তাপ প্রয়োগে যে উষ্ণতা বাড়ে, সেই তথ্যটি বেশ কিছু জনকে আকৃষ্ট করে তাঁদের অনেকেই চেষ্টা করেন উষ্ণতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে। কিন্তু কাজটা তো সোজা নয়।

প্রথমে যখন তাপমান যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি তখন কোন বস্তু উষ্ণ কি শীতল হাতের স্পর্শে অনুভব করা হত। কিন্তু তাতে অসুবিধা অনেক। প্রথমতঃ তাপমাত্রা বেশী হলে হাত অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ স্পর্শানুভূতির দ্বারা তাপের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। তা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় ভুলও করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমরা যদি দুটি হাতের একটিকে গরম জলে এবং অপরটিকে ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পর দুটি হাতকেই ঈষদুষ্ণ জলে ডোবাইলে তাহলে যে হাতটি গরম জলে ডোবান ছিল সেটিতে গরম বোধ হবে আর যেটি ঠাণ্ড জলে ডোবান ছিল সেটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হবে। অতএব স্পর্শের দ্বারা কোন বস্তুর সঠিক ভাবে তাপ নিরূপণ করা যায় না। তাই উষ্ণতা নির্ণয় করার জন্য হয়েছিল যন্ত্রের পরিকল্পনা। কারণ মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু বিকল না হলে যন্ত্র ভুল করে না।

তাপমাত্রা নির্ণয়ের প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন সেই ইটালী দেশের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। তিনি একটা যন্ত্র ও নির্মাণ করেছিলেন তবে সে যন্ত্রটি যে কেমন ছিল সে কথা বলা আজ বড় শক্ত।

গ্যালিলিও। পর কেটে গেল কতকাল। আর কোন বিজ্ঞানী উষ্ণতা মাপক কোন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন কিনা সঠিক কিছু জানা যায় না। শেষে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই ইটালী দেশেরই এক বিজ্ঞানী তৈরি করলেন বিশেষ ধরণের এক তাপমান যন্ত্র। বিজ্ঞানীর নাম ফ্লোবেন্স।

তিনি কাচ নির্মিত একটি সরু নলের মধ্যে আলকোহল রেখে থার্মোমিটার রূপে ব্যবহার করতেন। তবে তাতে দাগ কাটা ছিল না। প্রকৃত থার্মোমিটার বলতে যা বোঝায়, সেটি প্রথম আবিষ্কার করার গৌরব অর্জন করেছেন "গ্যাব্রিয়েল ফারেন হাইট"। তাঁর থার্মোমিটারটিও ছিল কাচ নির্মিত। তবে ফ্লোরেন্সের মত অ্যালকোহল ব্যবহার না করে তিনি পারদকে ব্যবহার করেছিলেন এবং থার্মোমিটারে দাগও কেটে ছিলেন।

ফারেন হাইটের ধারণা ছিল মনুষ্য দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬° ডিগ্রী এবং জল ৩২° ডিগ্রীতে জমে বরফে পরিণত হয়। জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হওয়ার অবস্থাকে ধরে ছিলেন ২১০° ডিগ্রী। তাপমাত্রার সর্বনিম্নে এবং সর্বোচ্চ মান তিনি নির্ধারণ করেছিলেন থার্মোমিটারকে বরফের কুচির মধ্যে রেখে এবং ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে ধরে রেখে। এই দুই তাপমাত্রাকে নির্দিষ্ট রেখে আজও থার্মোমিটারের দাগ কাটা হয়ে থাকে। ফারেন হাইটের থার্মোমিটারের ঘর সংখ্যা ১৮০।

ফারেন হাইটের পর রোমার নামে এক বিজ্ঞানী দুই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অর্থাৎ হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ককে যথাক্রমে ০° এবং ৮০° ধরে আর এক ধরণের মান প্রচলিত করেন। সেই মানটি আবিষ্কর্তার নামানুসারে "রোমারের মান" নামে পরিচিত।

তাপমাত্রার সেন্টিগ্রেড মানে প্রচলন করেন সুইডেনের এক বিজ্ঞানী। নাম তাঁর "সেলসিয়াস"। তিনি হিমাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক ০° এবং ১০০° ধরে অন্য একটি মানের প্রবর্তন করনে। সেই মানটিই বহুল প্রচলিত "সেন্টিগ্রেড' মান। কখনও কখনও আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই মানকে বলা হয় "সেলসিয়াস"।

উষ্ণতা পরিমাপে সেন্টিগ্রেড মানটিই বেশী ব্যবহার করা হয়। আমরা শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করি সেটি ফারেন হাইটের মান অনুসারে দাগ কাটা। বর্তমানে আবার সেই থার্মোমিটারের দাগ কাটা হচ্ছে সেন্টিগ্রেডের মান অনুযায়ী।

থার্মোমিটারের জন্য প্রয়োজন হয় সর্বত্র সমান এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট একটা কাচের নল। প্রথমে কাচ নলের এক পাশ গলিয়ে নিয়ে ও অপর পাশে ফুঁ দিয়ে একটা কুণ্ড প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। পরে কুণ্ডটিকে পারদ পূর্ণ করে খোলা মুখটা গরম করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থার্মোমিটারের উপরে দাগ কাটার পালা। পূর্বের মত প্রথমে বরফ কুচির মধ্যে কুণ্ডটিকে স্থাপন করে ও পরে ফুটন্ত জলে বাষ্পে থার্মোমিটারকে ধরে রেখে দুটি স্থিমাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে এই দুই স্থিমাঙ্ক ০° এবং ১০০°। তারপর দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানকে একশ সমান ভাগ করে দাগ কাটা হয়।

থার্মোমিটারের তরল হিসাবে পারদ এবং অ্যালকোহল উভয়কেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে পারদ ব্যবহারের সুবিধা বেশী। পারদ চকচকে, কাচের দেওয়া ভিজায় না এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনে পারদের আয়তনের পরিবর্তন খুব নিয়মানুগ হয়। তাছাড়া প্রসারিত হওয়ার জন্য পারদ বস্তু থেকে অতি সামান্য তাপ গ্রহণ করে। আরও সুবিধে আছে। পারদ ৩৫০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার বাষ্পীভূত হয় এবং—৩৯° সেন্টিগ্রেডে জমে যায় বলে—৩৯° থেকে ৩৫০° ভেতর যে কোন তাপমাত্রাকে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

নিম্ন তাপমাত্রা নির্ণয়ের কাজে অ্যালকোহলের একটু সুবিধা আছে। অ্যালকোহলের হিমাঙ্ক—১৩০° সেন্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক মাত্র ৭৮°৫° সেন্টিগ্রেড। তাই অ্যালকোহল থার্মোমিটারের দ্বারা ৭৮°৫° সেন্টিগ্রেডের উপরের তাপমাত্রা নির্ণয় করা না গেলেও নীচের দিকে –১৩০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। কিন্তু অ্যালকোহল জলের মত স্বচ্ছ বলে ওকে ঠিক ঠিক কাচ নলের মধ্যে দেখা যায় না। সেইজন্য অ্যালকোহলকে একটু রঙ করে নিতে হয়।

বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আবহাওয়ার উষ্ণতা জানার জন্য চরম ও অবম থার্মোমিটার শরীরের তাপ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারী থার্মোমিটার ইত্যাদি। ডাক্তারী থার্মোমিটারের

একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ওর ভেতরের রন্ধ্র পথটা কুণ্ডের উপরে একটু বাঁকান থাকে। তার জন্য মানুষের দেহ থেকে থার্মোমিটার বের করে আনলে বাইরের তাপমাত্রা কম থাকা সত্ত্বেও পারদ বাঁকান পথ দিয়ে সহজে নেমে আসতে পারে না। অথচ প্রসারিত হতেও তার কোন অসুবিধা হয় না।

আজকাল অতিশয় উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা মাপার জন্য বহুথার্মোমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথমে গ্যাস থার্মোমিটারের নাম করা যেতে পারে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিন্সেপ এই থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন। এটি উচ্চ তাপমান যন্ত্র নাম "পাইরোমিটার"। পরবর্তীকালে ডেভি, রেনোঁ, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই থার্মোমিটারের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে গেছেন।

সর্ব নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা আছে। অর্থাৎ—২৭৩° সেন্টিগ্রেডের নীচে আমরা তাপমাত্রার কল্পনা করতে পারি না। ঐ তাপমাত্রাকে বলা হয় চরম শূন্য। এত নিম্ন তাপমাত্রায় অ্যালকোহল থার্মোমিটার অচল। তাই সর্ব নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকনডাক্টিং পদার্থ, যেমন পরিশুদ্ধ অঙ্গার নির্মিত বিদ্যুৎ রোধক ব্যবহার করা হয়।

উচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্কে কোন পরিসীমা নেই। গবেষণাগারে বিস্তৃত পরিবেশে অতি অল্পক্ষণের জন্য হলেও তিন হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য দেহের আভ্যন্তরীন তাপমাত্রা ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। মহাশূন্যে এমন সব নক্ষত্র আছে যাদের দেহের তাপমাত্রা সূর্য অপেক্ষাও অনেক বেশী। এত উচ্চ তাপমাত্রা মানুষের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে এক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা অতি সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্লাটিনাম থার্মোমিটার। অতি ও নিম্ন তাপমাত্রার সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য থার্মোকাপল এবং থার্মোপাইল ব্যবহার করা হয়। থার্মোকাপল নির্মাণের জন্য তামা ও কন্‌স্ট্যানটন

নামক মিশ্র ধাতুর তার মলিব্‌ডেনাম ও টাংস্টেন তার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। থার্মোকাপল—২০০° সেন্টিগ্রেড থেকে হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রাকে পরিমাপ করতে পারে।

॥ বিজ্ঞানী আইনস্টাই ও তাঁর আবিষ্কার ॥

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক মহাবিজ্ঞানী, যাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শে দূরীভূত হয়েছে বিজ্ঞান রাজ্যের কত কালের কত পুঞ্জীভূত অন্ধকার। তাঁর সুচিন্তিত তথ্যাবলী নিরসন ঘটিয়েছে কত দিনের কত জল্পনাকল্পনাকে, আবার কত নতুন সত্য হয়েছে উদ্ঘাটিত।

অনন্যসাধারণ ছিল সেই বিজ্ঞানীর প্রতিভা। কোন সুবৃহৎ যন্ত্র নির্মাণ করে তিনি বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দেননি কিংবা কোন আশ্চর্যজনক তথ্য পরিবেশন করে বিশ্বকে সচকিতও করেননি। তিনি ছিলেন শুধু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানের একজন গবেষক। অথচ বিস্ময়ের কথা, তাঁর তত্ত্বগুলিকে কেন্দ্র করে অতি অল্প দিনের মধ্যেই বিজ্ঞান জগতে এসেছিল প্রবল এক আলোড়ন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উন্মোচিত হয়েছিল নতুন দিগন্ত। সত্যই এক মহা বিস্ময় তিনি। গ্যালিলি ও নিউটনের পরে এত বড় প্রতিভা বিজ্ঞান লাভ করতে পারেনি।

অমিত প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানীর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। অতলান্ত বিজ্ঞান মহাসমুদ্রের দিকে তাকালে মনে হবে দুই পারে স্মিতহাস্যে পদ চারণা করছেন গ্যালিলিও এবং আইনস্টাইন। মাঝখানে এক অপূর্ব কারুকার্যখচিত ছোট্ট এক ময়ূরপঙ্খীতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন নিউটন। কেবল আইনস্টাইন নন, গ্যালিলিও নিউটনও পৃথিবীর দুই বিস্ময়।

আইনস্টাইনের আবির্ভাবের পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ

যাবত বিজ্ঞানের বহু শাখায় বহুভাবে প্রয়োগ হয়েছে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি। সর্বাধুনিক কালে বহু বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র নির্মিত হয়েছে তাঁর তত্ত্বগুলি প্রয়োগ করে। কত গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু সেগুলি আবার বহু বিজ্ঞনী যশস্বীও হয়েছেন তথ্যগুলি অনুসরণ করে। তুচ্ছ দেশ কালের বহির্ভূত তিনি—বিশ্বের অনন্য সাধারণ গবেষক। তাই তো তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দেশে দেশে সাড়া পড়ে গেছিল। সেই সঙ্গে নতুন করে মূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছিল তাঁর গবেষণাবলীর এবং আয়োজন করা হয়েছিল জ্ঞানী গুণী ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাঁর অমূল্য তত্ত্বগুলি পরিবেশন করতে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তারই প্রচেষ্টা মাত্র।

আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত তথ্যগুলি খুব বেশী নয়। তবে যে তথ্যটি বিজ্ঞানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে তাঁর "আপেক্ষিকতাবাদ। প্রথম ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে "ইলেকট্রো ডাইন্যামিকস্ অফ মুভি বডিজ" নামে যে মৌলিক প্রবন্ধটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাতেই ছিল আপেক্ষিকতার সুর। তার পরেই তিনি প্রচার করেন "Special or Restricted Theory of Relativity and General Thnory of Relativity."

তাঁর এই জটিল তত্ত্ব সেদিন পৃথিবীর খুব কম বিজ্ঞানীই বুঝতে পেরেছিলেন। কথিত আছে, একদিন কোন একটি সভায় তাঁর আবিষ্কৃত এই তথ্যটি ব্যাখা করে শোনাচ্ছিলেন। শ্রোতরা কিছু বুঝতে না পেরে পরস্পর হাসাহাসি করছিলেন। বড় দুঃখিত হয়েছিলেন আইনস্টাইন। জোরের সঙ্গে বলেছিলেন 'আমার তত্ত্বের যদি যথার্থ প্রমাণিত হয় তাহলে সুইজারল্যাণ্ডবাসীরা বলবে আমি সুইস, জার্মানীরা বলবে আমি জার্মান'। বস্তুতঃ তাঁর সত্যের যথার্থ প্রমাণিত হতে খুব বেশি দেরী হয়নি। অচিরে মানুষ বুঝতে পেরেছিল আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি এক একটি মূল্যবান হীরকখণ্ড।

আপেক্ষিতাবাদ পদার্থ বিজ্ঞানে নতুন নয় গ্যালিলিও এবং নিউটনের বলবিদ্যায় স্থির ও চলমান বস্তুর ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদ প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা আলোকের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বে এক নতুন

ধরণের কল্পনার অবতারণা করেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। সেই সব ব্যাখ্যা ও কল্পনা আইনস্টাইনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি বলবিদ্যা এবং তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বকে একই আপেক্ষিতা-বাদের সীমায় আনয়ন করতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে যে তত্ত্বটির অবতারণা করেন সেইটিই বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ।

এই আপেক্ষিকতাবাদকে সবাই "যুগান্তকারী" আখ্যা দিয়ে থাকেন। ভর ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। সে সম্পর্কে তিনি একটি বিশেষ সূত্রেরও অবতারণা করেন। সূত্রটি $E = mc^2$। এখানে E হচ্ছে শক্তি, m হচ্ছে ভর এবং c হচ্ছে শূন্য মাধ্যমে বা বাতাসে আলোর গতিবেগ। এই সূত্রটি থেকে বোঝা যায় শক্তির সঙ্গে ভর এবং ভরের সঙ্গে শক্তি সংশ্লিষ্ট। সূর্য কিংবা যে কোনো নক্ষত্রের শক্তি, পরমাণুর শক্তি প্রভৃতি সব শক্তির মূল উৎস ভর। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট জাপানের হিরোসিমার উপর যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল তার পেছনে ছিল "অটোহান" ও "ট্রাসমান" নামে দুজন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার—পরমাণু কেন্দ্রকের বিভাজন। বিভাজনের ফলে যে প্রচণ্ড তাপশক্তি মুক্ত হয় তার মূলে আছে আইন-স্টাইন প্রবর্তিত উপরোক্ত সূত্রটি। যদিও আইনস্টাইন কোন দিন কল্পনার মধ্যেও আনতে পারেননি তাঁর সূত্রটির এমন অপপ্রয়োগ হবে। সেদিন গভীর দুঃখে তিনি বলেছিলেন "যদি নতুন করে জীবন সুরু করা যেতো তাহলে বিজ্ঞান চর্চা ছেড়ে দিয়ে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করতাম।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ প্রয়োগ করে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। আইনস্টাইন তাঁর সূত্রের তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কোন আলোক রশ্মি সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ১·৭ সেকেণ্ড কোণে বেঁকে যায়। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বানী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ সূর্য গ্রহণের সময় মানমন্দিরে গৃহীত আলোকচিত্র থেকে।

আইনস্টাইনের আর একটি সিদ্ধান্ত ছিল, মহাকর্ষজ ও অতিকর্ষজ

ক্ষেত্র দিয়ে আলোক রশ্মি যাওয়ার সময় আলোকের স্পন্দন সংখ্যা কমে যায় এবং আলোককে ঈষৎ রক্তাভ দেখায়। তাঁর জীবদ্দশায় এই সত্যটি প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোসবাউয়ার নামে এক বিজ্ঞানী গামা রশ্মির উপর পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তটি সত্য বলে প্রমাণিত করেন। আরও একটি মজার কথা, আইনস্টাইনের তত্ত্বকে অবলম্বন করে ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বা কস্‌মলজি গড়ে উঠেছে।

প্রথমে বলা হয়েছে আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুব বেশী নয়। তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্বগুলি নিম্নে প্রদান করা হল।

১। ব্রাউনিয়ান মুভমেণ্টের ব্যাখ্যা।

২। বিশেষ বা পরিমিত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ও সাধারণ আপেক্ষিকতাতত্ত্ব।

৩। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টর ব্যাখ্যা।

তৃতীয় তত্ত্বটির জন্যই তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার।

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ জার্মানীর উলম্ শহরে। শিক্ষা লাভ করেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা সমাপনান্তে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়াররূপে কর্মজীবন স্বরু করেন এই সময় থেকেই তাঁর কিছু কিছু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'আলোর উদ্ভব ও পরিণতি সম্বন্ধে' প্রবন্ধটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারপরে যে প্রবন্ধটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে প্রবন্ধটি হচ্ছে "ইলেকট্রো ডাইন্যামিকস অফ মুভিং বডিজ।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক-রূপে যোগদান করেন এবং তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণায় মত্ত হয়ে উঠেন। তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং তত্ত্বগুলির নতুনত্ব সবাইকে ভাবিয়ে তোলে। পরের দিকে সেই তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করে পৃথিবীর মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায় এবং যথার্থ যাচাইয়ের চেষ্টা হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানান হয়

নোবেল পুরস্কার প্রদান করে।

আজীবন আইনস্টাইন নিজ জন্মভূমিতে কাটাতে পারেন নি। তার জন্য কোন দুঃখও ছিল না তাঁর। নিজে বহুবার বলেছেন "আমি জীবন পথে একক যাত্রী। আমি কোন দেশকে নিজের বলে মনে করি না। আমার গৃহ, আমার বন্ধুবান্ধব, এমন কি, আমার নিকটতম পরিবারবর্গকেও আমি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারিনি।" যেন প্রাচীন আর্য ঋষিদের কণ্ঠস্বর পুনরায় উচ্চারিত হয়েছিল আইনস্টাইনের কণ্ঠে।

আইনস্টাইন ছিলেন ইহুদী। তৎকালীন জার্মানীর চ্যান্সেলার হিটলার ইহুদীদের দুচোখে দেখতে পারতেন না। তাছাড়া রাজনৈতিক কারণে হিটলারের সঙ্গে মতবিরোধও হয়েছিল আইনস্টাইনের। সেই কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে স্বদেশ পরিত্যাগে বাধ্য হতে হয়। সেই বছর গোপনে একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হন। আমেরিকা সরকার কিন্তু তাঁকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন এবং সব রকমের সুযোগ সুবিধা দান করেন। শোনা যায় সরকারের পরামর্শ-দাতাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে আইনস্টাইন তাঁকে গোপনে জানিয়েছিলেন, জার্মানীরা পরমাণু শক্তিকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে তারা যদি সফল হয় তাহলে সমগ্র বিশ্বের দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে।

আইনস্টাইনের উপদেশানুসারে রুজভেল্ট পরমাণু শক্তিকে কাজ লাগিয়ে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করার জন্য বহু সংখক বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করে-ছিলেন এবং কোটি কোটি মুদ্রাও ব্যয় করেছিলেন। তার প্রত্যক্ষ ফল মহা শক্তিধর সেই পরমাণু বোমা।

কিন্তু পরমাণু বোমার শক্তিয় পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠেছিলেন আইন-স্টাইন। এই বোমাকে কাজে না লাগানোর জন্য বহু অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন সরকারকে। তবুও তাঁর অনুরোধকে উপেক্ষা করে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল হিরোসিমা এবং নাগাসাকির উপর। লক্ষ লক্ষ

লোকে সেদিন প্রাণহানি ঘটেছিল। কত হাজার হাজার ব্যক্তি পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। দুঃখে শোকে ভেঙ্গে পড়েছিলেন আইনস্টাইন।

আইনস্টাইনের চরিত্রের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সর্ব্ব শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালবাসা ও মমত্ব বোধ। উচ্চ নীচ কোন ভেদাভেদ ছিল না তাঁর কাছে। আমেরিকার অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গেও ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। জীবনে কোনদিন কোন অন্যায় কিংবা অবিচারকে সহ্য করতে পারেন নি। যেখানে দেখেছেন অন্যায় সেইখানেই তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এমন কি হিটলারের কাজের বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এত বড় দুঃসাহস সে যুগে বোধ হয় একমাত্র আইনস্টাইনেরই ছিল।

একনায়কত্বকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছেন "আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু কোন নেতাকে, সে ধর্মীয় হোক অথবা রাজনৈতিকই হোক, তাকে দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। জনগণ, যারা পরিচালিত হবে তাদের যেন জোর করে নেতার পথে চলতে এবং তার মতবাদ মানতে বাধ্য না করা হয়। একনায়কত্ব যা নিজের মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে বলপূর্ব্বক কিছু চালাতে চায়, তা বেশী দিন সুষ্ঠু-ভাবে চলতে পারে না। একদিন না একদিন তার অবনতি ঘটতে বাধ্য।"

তিনি ছিলেন পরম শান্তিকামী। যুদ্ধকে তিনি মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। স্বার্থের জন্য এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যুদ্ধ, লোকক্ষয় তার মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বিখ্যাত শান্তিবাদী মনীষী রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে সারা পৃথিবীতে তিনি যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি সব জায়গায় বলতেন, বিশ্বের সকল রাষ্ট্র একই শাসনের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। পৃথিবী থেকে দেশের সীমারেখাগুলো মুছে ফেলা দরকার। তাঁর বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন পৃথিবীর সব রাষ্ট্রগুলি একই কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসবে। প্রকৃত বিশ্ব মৈত্রীর সুরু আমরা প্রথম শুনেছি আইনস্টাইনের কণ্ঠে।

ভারতীয় ভাবধারার প্রতি আইস্টাইনের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। মহাত্মা গান্ধীর ছিলেন তিনি পরম ভক্ত। তাঁকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের সময় পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন এক মহামানব। তিনি আপন সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিরাট বৃটিশ শক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।" যীশু, মোজেস প্রভৃতি মহামানবদের সঙ্গে তিনি গান্ধীজীর তুলনা করতেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। এই দুই মহামানবের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল, সেগুলি বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বিশেষ।

সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকে। অতি শৈশবে তিনি বেহালা বাজাতে শিখেছিলেন। পরিণত বয়সে তাঁর মত এত সুন্দর বেহালাবাদক খুব কমজনই ছিলেন। যেখানে যেতেন কাছে থাকত তাঁর প্রিয় বেহালাটি। সুরের মুর্ছনায় স্তব্ধ করে দিতেন সবাইকে।

আইনস্টাইন ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক ও ভাব ভোলা। তবে তাঁর প্রকৃতির প্রতি যে কত গভীর প্রেম ছিল সে কথা তাঁর নিজেরই বক্তব্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন "সব চেয়ে সুন্দর জিনিস, যা আমরা অনুভব করতে পারি সেটি হচ্ছে রহস্যাবগুণ্ঠিত এই প্রকৃতি। এই অনুভতিই হচ্ছে প্রকৃত কলা এবং বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র। যে ব্যক্তি এটি বোঝে না বা ভাবতে চেষ্টা করে না কিংবা বিস্ময়ে অভিভূত হয় না সে বেঁচে থেকেও মৃত।"

আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন, প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি মানবীয় সদগুণগুলির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তিনি বিশ্ব শান্তির বাণী শুনিয়ে গেছেন। এই সম্বন্ধে লিখে গেছেন বহু প্রবন্ধ। তাঁর লেখা সেই প্রবন্ধগুলি বিশ্বের সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা বই-এর সংখ্যাও খুব কম নয়। কালজয়ী খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এমন পুস্তকের মধ্যে নাম করা যেতে

পারে "দি মিনিং অফ রিলেটিভিটি" এবং "ইনভেস্টিগেশনস্ অন দি থিওরী" নামে দুখানি পুস্তক।

আইনস্টাইনের গবেষণায় কোনদিন ছেদ পড়েনি। জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ধরে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল কতকগুলি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে মহাকর্ষ ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্র, পরমাণু কেন্দ্রকের ক্ষেত্র প্রভৃতি প্রধান। সফল তিনি হতে পারেননি। কিন্তু বিশ্বাস ছিল তাঁর সুদৃঢ়। আশাও পোষণ করে গেছেন, বলেছেন "একদিন না একদিন বিজ্ঞানীরা এই ধরনের সমন্বয় তত্ত্বের আবিষ্কার করবেনই।"

১৯৫৫ সালের ১৮ই এপ্রিল এই মহামানবের জীবনাবসান ঘটেছে।

॥ প্ল্যানেটেরিয়াম বা আকাশঘর ॥

প্ল্যানেটেরিয়াম বা আকাশঘর সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। প্ল্যানেটেরিয়ামকে আকাশঘর বলার কারণ, একটি বিশেষ ধরণের কক্ষে বসে মহাকাশের ছবিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। কলকাতায় যে প্ল্যানেটেরিয়ামটি আছে তার নাম বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম। ঘরখানি গম্বুজাকৃতি। দূর থেকে ভারি সুন্দর দেখায়। ভেতরটা আরও চমৎকার। একদিকে সিনেমা দেখার মত অবসর বিনোদন করা যায় অপরদিকে মহাকাশ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ হয়। যুগপৎ শিক্ষা ও অবসর বিনোদন প্ল্যানেটেরিয়ামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীর সব প্ল্যানেটেরিয়ামের চেহারা ঐ একই তবে সেখানে যে মহাকাশকে দেখা যায় সেটি কিন্তু আসল মহাকাশ নয়। মহাকাশকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়। যে যন্ত্রটির দ্বারা এই আশ্চার্যজনক কাজটি করা হয়ে থাকে তার নাম আলোক প্রক্ষেপক যন্ত্র বা অপটিক্যাল প্রোজেক্টর। যন্ত্রটি ভয়ানক শক্তিশালী এবং কারিগরিবিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শন। যন্ত্রটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর দ্বারা ছোট বড় হরেক

রকমের আলোক বিন্দুকে প্রক্ষেপ করা যায়। গোলাকার ছাদে অন্ধকারের মধ্যে সঠিক দূরত্বে নক্ষত্র কিংবা গ্রহ উপগ্রহের অনুরূপ আলোক বিন্দুগুলোকে প্রক্ষেপ করলে আমাদের চোখের সামনে মহাকাশের ছবিই ফুটে উঠে। অবশ্য আলোক বিন্দুগুলোকে সাজিয়ে প্রক্ষেপ করার মধ্যে আছে যথেষ্ট কৃতিত্ব। বিদ্যুৎ চালিত প্রক্ষেপযন্ত্রের সাহায্যে ছবিকে গতিশীলও করা যায়। যার ফলে গ্রহ নক্ষত্রদের সঠিক গতিবিধিও আমরা বুঝতে পারি। আলোক বিন্দুগুলোকে যথোপযুক্ত ভাবে প্রক্ষেপ করে গ্রহণ এবং ধূমকেতু প্রভৃতির ছবিও ফুটিয়ে তোলা যায়। এমন নিপুণ ভাবে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা হয় যে, দর্শকরা তিল মাত্র বুঝতে পারে না ওটি সম্পূর্ণ কৃত্রিম। বুঝবেই বা কেমন করে? বাস্তব মহাকাশের সঙ্গে প্ল্যানেটেরিয়াম সৃষ্ট মহাকাশের যে কোন প্রভেদ নেই।

প্রকৃত পক্ষে প্ল্যানেটেরিয়াম একটা বড় রকমের বিস্ময়। কিন্তু কৃত্রিম ভাবে মহাকাশ সৃষ্টির পরিকল্পনা আজকের নয়। এর পিছনে আছে সুদীর্ঘ কালের প্রচেষ্টা। শোনা যায় খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে গ্রীক পণ্ডিতরা নক্ষত্র খচিত ঐ বিশাল ও বিস্ময় ভরা মহাকাশকে কৃত্রিম ভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। সে যুগে মানুষের ধারণা অবশ্য অন্য ধরণের ছিল। মনে করা হত এই পৃথিবীটা সমতল এবং আকাশটাও সমতল। পণ্ডিতেরা সমতল প্রস্তর খণ্ডের উপর আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদিকে খোদিত করতেন। সম্পূর্ণরূপে না হলেও কিছুটা মহাকাশের রূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁরা। মহাকাশের ছবি সম্বলিত সেই সব প্রস্তরখণ্ড মাটি খুঁড়ে অনেক জায়গায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কোন কোন যাদুঘরে সেগুলো রক্ষিত আছে।

পরের দিকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। তারা চিন্তা করতে আরম্ভ করে, পৃথিবীর আকাশ সবই যদি সমতল হয় তাহলে আকাশটা নেমে এসে কেন ঐ দূর পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেছে। সেদিন হয়ত ভেবেছিল, আকাশটা পৃথিবীর উপর একটা চাঁদোয়ার মত। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সবাই আকাশ পরিক্রমা করছে আর সমতল পৃথিবীটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এই সব প্রাচীন ধারণার কোনটিই ঠিক নয় তবু প্রাচীন

রোমানরা কল্পনা করেছিলেন আকাশটা গোলাকার। তাঁরাও মহাকাশের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ মহাকাশের কৃত্রিম রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন নভোগোলক বা সিলেশ্চিয়েল গ্লোব। নভোগোলকের উপরে সূর্য, চন্দ্র, কয়েকটি গ্রহ এবং পরিচিত তারকাগুচ্ছকে খোদাই করেছিলেন। নিদর্শনও পাওয়া গেছে। প্রাচীন যুগের এই নিদর্শন রোম রেখেছে পরম যত্ন সহকারে।

এই সব ঘটনা ঘটে গেছে খৃষ্ট জন্মের প্রায় দু'শ বছর আগে। আকাশকে জানার জন্য এবং পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য জন্য আদি যুগ থেকে মানুষের চেষ্টার বিরাম 'ছিল না। রাত্রির আকাশ পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারল, একই নক্ষত্রপুঞ্জ বছরের সবসময় একই স্থানে অবস্থান করে না এর যথার্থ কারণ তারা আবিষ্কার করতে পারেনি বটে কিন্তু এমন সব নভোগোলক তৈরি হয়েছিল যাকে মেরুরেখার চারপাশে ঘোরান যেত। ঘূর্ণনের ফলে দেখান হত সূর্য চন্দ্রের উদয় অস্ত এবং বছরের বিভিন্ন সময়ে নক্ষত্র পুঞ্জ ও গ্রহদের অবস্থিতি। প্রায় তিন'শ বছর ধরে চলেছিল এই প্রচেষ্টা অর্থাৎ নভোগোলকের উন্নতি বিধান করে মহাকাশের প্রকৃত ছবি ফুটিয়ে তোলা। তারপর এল প্রাচীন কালের সেরা বিজ্ঞানী আর্কিমিদিসের কাল।

আশ্চর্য বিজ্ঞানী ছিলেন আর্কিমিদিস। যেন বিজ্ঞানের যাদুকর। যা দেখতেন এবং চিন্তা করতেন তাকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হতেন। কিংবা সত্য অনুসন্ধানে যত্নবান হতেন। মহাকাশ সম্পর্কে তাঁরও কৌতূহলের সীমা ছিল না। একদিন নভোগোলক দেখে তাঁর কী মনে হয়েছিল জানা যায় না। তবে নভোগোলকের উন্নত রূপদানে সবিশেষ যত্নবান হলেন। তিনি যে নভোগোলকটি তৈরি করেছিলেন সেটি ছিল পূর্বাপেক্ষা ঢের বড়। এবং তাতে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির নিখুঁত রূপ দিয়েছিলেন। সেই গোলকে গ্রহনক্ষত্রাদির উদয়, অস্ত এবং গতিবিধি ছাড়াও গ্রহদের বিশেষ বিশেষ গতি, সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ প্রভৃতিও দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। গোলককে ঘোরানোর জন্য এবং তাকে বিভিন্ন

ভাবে গতিসম্পন্ন করার জন্য আর্কিমিদিস জল শক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম নভোমণ্ডল সৃষ্টির পেছনে আছে তাঁরই অবদান। সেই জন্য অনেকের মতে প্ল্যানেটেরিয়াম বা আকাশ-ঘরের আবিষ্কর্তা আর্কিমিদিসই।

কিছুকাল পরে আর্কিমিদিসের নভোগোলকও সন্তুষ্ট করতে পারল না মানুষকে। ঐ বিস্তৃত মহাকাশটা যে বারে বারে মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে! ওর আঙ্গিনায় হাজার রকমের বিস্ময়। সত্য কথা বলতে কী, ঐ মহাকাশের পেছনে হাজার হাজার বছর ধরে যত প্রতিভার নিয়োগ হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। সেই অ্যারিস্টটল থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত কেউ বাদ পড়েননি। এখনও কী বিজ্ঞানীদের বিরাম আছে?

বিরাম কোনদিনই ছিল না। তাই তো আর্কিমিদিস নভোগোলকে উন্নত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। এককালে আরবীয় পণ্ডিতগণ গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিলেন। তাঁরা নভোগোলকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একটা ঘরের মধ্যে মহাকাশের ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হলেন। দামাস্কাসের কোন একটি রাজপ্রাসাদের ছাদ ছিল গম্বুজাকৃতি। আরবীয় পণ্ডিতরা ঐ ঘরটাতে মহাকাশের চিত্র খোদাই করতে সচেষ্ট হলেন। কৃতকার্যও হয়েছিলেন তাঁরা। ঘরের মধ্যে থেকে মহকাশকে প্রত্যক্ষ করার প্রচেষ্টা এই প্রথম হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় বার'শ বছর আগে এই প্রচেষ্টা বিস্ময়কর নয় কী?

মধ্যযুগেও চলেছিল নভোমণ্ডলকে কৃত্রিমভাবে রূপ দেওয়ার ক্ষীণ প্রচেষ্টা। তবে আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম প্রথম রূপকার বলতে হবে আমেরিকাকে। তখন বিদ্যুৎকে কাজে লাগাতে পেরেছে মানুষ। ১৫ ফুট ব্যাসের এক বৃহৎ গোলক নির্মাণ করে তার গায়ে আকাশের জ্যোতিষ্কদের প্রকৃত অবস্থান এবং প্রতিকৃতি অনুযায়ী বহু ছিদ্র রচনা করা হয়েছিল। গোলকের ভেতরটা অন্ধকার রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল আর বাইরে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে আলোকিত করা হত। গোলকের

ভেতরে এইভাবে ফুটে উঠত মহাকাশের তারামণ্ডল। তখন প্রক্ষেপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি।

প্রক্ষেপক যন্ত্রবিহীন প্ল্যানেটেরিয়ামের আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নিউনিখ শহরে স্থাপিত প্ল্যানেটেরিয়ামটি। এখানেও গোলাকার ছাদ থেকে ছিদ্র পথে বৈদ্যুতিক আলো ফেলে আকাশের জ্যোতিষ্কদের প্রতিকৃতি ও অবস্থান দর্শকদের চোখের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াস ছিল। তবে আমেরিকার প্ল্যানেটেরিয়াম অপেক্ষা মিউনিখের প্ল্যানেটেরিয়াম ছিল আরো উন্নত।

বর্তমানে আমরা যে প্ল্যানেটেরিয়াম দেখতে অভ্যস্ত তার পরিকল্পনার মূলে আছেন হাইডেনবার্গেন রাডেন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ "ম্যাক্সজেফ" এর অবদান। স্বীয় পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে বহুদিন ধরে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, বহু সঙ্গীসাথীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, কঠোর শ্রমও করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। পরিশেষে তাঁরই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে এবং নতুন কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে মিউনিক শহরে প্রথম প্ল্যানেটেরিয়াম নির্মাণ করেন বাউয়ের্স-ফোল্ড। তাঁকেও নিয়োগ করতে হয়েছিল দীর্ঘশ্রম, নিষ্ঠা এবং প্রচুর অর্থ।

প্রক্ষেপক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে অল্প পরেই। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে গ্রহ নক্ষত্রদের প্রতিকৃতি দান করা যথেষ্ট সহজ হল। বাউয়ের্স ফোল্ড এর নির্দেশমত গম্বুজাকৃতি বা বৃত্তাকার কক্ষ নির্মাণ করে তার মধ্যে বসান হল প্রক্ষেপক যন্ত্র। কক্ষের মধ্যে কৃত্রিম মহাকাশ সৃষ্টি করে একই সঙ্গে দর্শকদের মনোরঞ্জন এবং তাদের শিক্ষাদান দুইই চলতে লাগল।

প্রক্ষেপক যন্ত্র সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেটেরিয়াম প্রথম স্থাপিত হয়েছে লণ্ডনে ১৯৫৮ সালে। তারপর লণ্ডনের দেখাদেখি অন্যান্য দেশে স্থাপিত হয়। কলকাতায় বিডলা প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপিত হয়েছে ১৯৬: সালে। পৃথিবীতে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেটেরিয়ামের সংখ্যা প্রায় যাটটির মত। তন্মধ্যে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম অন্যতম। এই প্ল্যানেটেরিয়ামের গম্বুজের ব্যাস ২৩ মিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপিত হয়েছে

মস্কোতে। সেখানকার গম্বুজের ব্যাস ২৫ মিটার—কলকাতার চেয়ে ছু মিটার বা সাড়ে ছ ফুটের মত বেশী। লণ্ডনের পরেই কলকাতার প্ল্যানেটেরিয়ামের স্থান।

এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপন করা হয়েছিল জাপানে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। বলা বাহুল্য তখন প্রক্ষেপক যন্ত্র ছাড়াই কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে মহাকাশের চিত্র দেখান হত। জাপান বরাবরই কারিগরিবিদ্যায় উন্নত। প্রক্ষেপক যন্ত্রই জাপানতৈরি করতে পারে। তাই লণ্ডনের সমসাময়িক সময়ে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যানেটেরিয়াম প্রস্তুত করে নিয়েছিল সে।

আধুনিক প্ল্যানেটেরিয়াম বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার এক অভিনব সৃষ্টি। কৃত্রিম ভাবে মহাকাশ সৃষ্টি করে দেখান যায় বলে পৃথিবীর এক আশ্চর্য জিনিস থেকে আমরা বঞ্চিত নই। ইচ্ছা করলে আমরা অতি অল্প ব্যয়ে মহাকাশের প্রকৃত রূপটাকে দেখে নিতে পারি এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানও লাভ করতে পারি। সেই সঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাব আমাদের কলকাতার প্ল্যানেটেরিয়াম প্রতিস্থাপককে। যিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সর্বসাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত এমন এক বিস্ময়কর জিনিস গড়ে দিয়েছেন।

।। অসিলোগ্রাফ ।।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন একটা পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাটি নিম্নরূপ—

একটি গ্যাসপূর্ণ বদ্ধ কাচনলের এক প্রান্তে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথড এবং অন্য প্রান্তে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানড সংযুক্ত করে ধীরে ধীরে কাচনলের অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের চাপকে কমিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেছিলেন। গ্যাসের চাপ কমতে কমতে যখন ০·০০০১ মিলিমিটারে পৌঁছেছিল তখন অন্ধকার নলের মধ্যে এক আশ্চর্য ধরণের রশ্মি নির্গত

হয়েছিল। এই আলোকরশ্মি ক্যাথড বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার থেকে নির্গত হয়েছিল বলে গোল্ডষ্টাইন উক্ত রশ্মির নাম দিয়েছিলেন ক্যাথড রে বা ক্যাথড রশ্মি।

সেদিন গোল্ডস্টাইন পরীক্ষাটির ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। পরে নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তড়িৎগ্রস্ত ইলেকট্রন কণিকারা সোজা পথে প্রবলবেগে ক্যাথড থেকে অ্যানডের দিকে প্রবাহিত হয়ে এই ধরণের রশ্মি সৃষ্টি করে। তাই ক্যাথড রে ইলেকট্রন স্রোত ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে এবং কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে।

ক্যাথড রের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে অতি প্রয়োজনীয় যে যন্ত্রটির উদ্ভব হয়েছে সেটির নাম অসিলোগ্রাফ।

পুর্বে রেডারের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে অসিলোগ্রাফের কথা বলা হয়েছে। কেবল রেডার নয়, টেলিভিশন এবং আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্মাণেও প্রয়োজন হয়ে থাকে অসিলোগ্রাফের। এই যন্ত্রকে অসিলো-স্কোপও বলা হয়ে থাকে। এটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং ইলেকট্রন বিজ্ঞানের একটি মহত্তর অবদান।

অসিলোগ্রাফ প্রকৃতপক্ষে বায়ুশূন্য একটি ক্যাথড রে টিউব। এক পাশে থাকে ক্যাথড বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার অপরপাশে বসান থাকে একটি পর্দা। টিউবের ভেতরে পর পর বসান থাকে একটি ইলেকট্রন রশ্মি কন্ট্রোল ইলেকট্রোড, তুটি অ্যানড বা ধনাত্মক তড়িৎদ্বার এবং বিক্ষোপণ প্লেট। বিত্যুৎ প্রবাহের দ্বারা ক্যাথডকে উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং অ্যানডের দিকে প্রবাহিত হয়। তারপর সেই ইলেকট্রনগুচ্ছ অ্যানডকে অতিক্রম করে বিক্ষেপন প্লেটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ প্রান্তে ফ্লুওরিসেন্ট পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়।

বিক্ষেপণ প্লেট তুটিতে একটি নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করা হয়। এই বিভব প্রভেদ একটা নিম্নতম মান থেকে নির্দিষ্ট হারে বর্দ্ধিত হতে থাকে এক সময় সর্বোচ্চ মান প্রাপ্ত হয়। তারপর বিভব

প্রভেদ কমতে কমতে একেবারে নিম্নতম মানে ফিরে আসে। এই ব্যাপারটা ঘটে খুব তাড়াতাড়ি।

বিভব প্রভেদ বাড়া এবং কমার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন রশ্মি তরঙ্গের আকারে পর্দার উপর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে দেখা যায় ফ্লুওরিসেন্ট পর্দার উপর একটি উজ্জ্বল আলোক রেখা ফুটে উঠেছে। প্রয়োজন হলে ফটোগ্রাফিক প্লেট যুক্ত করে ছবি তোলারও ব্যবস্থা থাকে।

টিউবের মধ্যে যে ছুটি বিক্ষেপণ প্লেট ব্যবহার করা হয় তাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম বিক্ষেপণ প্লেট পর পর ছুটি ক্ষণস্থায়ী বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করলে ইলেকট্রন রশ্মির পর্দার উপর ছুটি স্থানে বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের দূরত্ব থেকে ছুটি সংঙ্কেতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান জানা যায়। দ্বিতীয় বিক্ষেপণ প্লেটটির দ্বারা বিভবের কম্পন সংখ্যা উচ্চ করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা যে সংকেত লাভ করা যায় তাতে অতি সামান্যতম সময়ের ব্যবধানও নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

রেডারে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ প্রতিফলকে বাধা পেয়ে ফিরে আসতে যে স্বল্প সময় ব্যয় হয় তাও ধরা পড়ে যায়। সময়ের সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম ব্যবধান নির্ণর করার জন্য এমন নির্ভর-যোগ্য যন্ত্র আর নেই।

চিকিৎসা জগতে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে বহু জটিল বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। অসিলোগ্রাফ সম্বলিত একটি যন্ত্রের নাম "ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ"। সাধারণতঃ মৃগীরোগ, মস্তিষ্কে ভাইরাস ঘটিত রোগ এবং কোন অপরাধীর মস্তিষ্কের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যন্ত্রটি আবিস্কৃত হয়েছে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ 'স্যার হানস বার্জার'। যন্ত্রটির প্রধান অংশই হচ্ছে একটি অসিলোগ্রাফ। যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে কতকগুলি স্বল্প তড়িৎ পরিবাহী ছোট ছোট তড়িৎদ্বার। রোগীর মাথায় চামড়ার সঙ্গে তড়িৎদ্বারগুলি আটকে দেওয়া হয়। স্বল্প তড়িৎ পরিবহনের ফলে

রোগী বা অপরাধী কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভব করে না।

এখানে ব্যবহৃত অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে একটি লেখনীর সংযোগ থাকে। বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিলে মস্তিষ্কের কোষ সমূহের বিদ্যুৎ লেখনীর দ্বারা একটি পর্দার উপর রেখাচিত অঙ্কন করে। সেই রেখা চিত্র থেকে বোঝা যায় মস্তিষ্কের অবস্থা। বলা বাহুল্য সুস্থ মস্তিষ্কের রেখাচিত্র এবং অস্থির মস্তিষ্কের রেখাচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের হয়ে থাকে।

স্বয়ংক্রিয় রেখাচিত্র অঙ্কনের আর একটি যন্ত্রের নাম ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ। অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের মতই এর কার্য প্রণালী। বিশেষ করে হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সঠিকভাবে নিরূপণ করার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ শারীরতত্ত্ববিদ ডবলিউ আইন থোভেন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্রের সঙ্গেও যুক্ত থাকে কয়েকটি তড়িৎদ্বার। তড়িৎদ্বারগুলি রোগীর হাতে অথবা শরীরের অন্য কোথাও চামড়ার সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা একটা রেখার মাধ্যমে ফুটে উঠে। বড় বড হাসপাতালে কারোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসার জন্য ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ ব্যবহার করতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সঠিকভাবে নির্ণয় হওয়ার জন্য চিকিৎসকদের রোগীকে চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়।

।। আলোক তরঙ্গের কথা ।।

আমাদের চোখ দুটি যেন স্পর্শ মণি। যা কিছু আমাদের চোখে পড়ে সবই সজীব হয়ে উঠে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গাঢ় অন্ধকারে চোখ দুটি খুলে রাখলেও আমরা কিছু দেখতে পাই না। দেখার জন্য প্রয়োজন হয় আলো। এই আলো এমন একটি জিনিস, যাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না অথচ যে বস্তুর উপর পড়ে সেই বস্তুটিকেই দেখি। যেমন ধরা যেতে পারে, ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতি থেকে

এমন কিছু নিঃসরণ হচ্ছে যা আশে পাশের চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বই, সব কিছুকে দৃষ্টি গোচর করে তুলছে।

এই আলোটি কী? কেমন করেই বা প্রজ্বলন্ত কোন বস্তু থেকে ছুটে এসে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয় চক্ষুতে অনুভূতি জাগায়?

চিন্তাটা বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের। তবে এ সম্বন্ধে প্রথম যিনি আলোকপাত করেন, তিনি বিজ্ঞানী কুলধন্য মহামতি নিউটন। নিউটন একদিন জানালেন, কোন আলোকিত বস্তু থেকে সব সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল কণিকা। তারা এত ক্ষুদ্র যে তাদের ওজনও নেই। কণিকাগুলি চারিদিকে সরলরেখায় ছুটে গিয়ে চারপাশের বস্তুর উপর পড়ে এবং আমাদের চোখে আঘাত করে। তাই আমরা বস্তুকে আলোকিত দেখি নিউটনের এই মতবাদকে বলা হল কণিকাবাদ বা কণিকাতত্ত্ব।

কণিকাতত্ত্বের সাহায্যে আলোর কিছু কিছু ধর্মকে ব্যাখ্যা করা গেলেও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল না। বিজ্ঞানীরা আবার ভাবতে বসলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হাইগন নতুন আর একটি তত্ত্বের অবতারণা করলেন। সেই তত্ত্বটির নাম হল তরঙ্গবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী আলো তরঙ্গ বিশেষ। কোন আলোকিত মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তরঙ্গ আমাদের চোখে আঘাত করলেই অনুভূত জাগে।

আলোক তরঙ্গের বাহকরূপে হাইগেন ঈথারের কল্পনা করেছিলেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজগৎ এক ধরণের অদৃশ্য এবং ওজনহান পদার্থের সমষ্টি বিশেষ। ঈথারের সাহায্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। কিন্তু কণিকা তত্ত্বের মত এই তত্ত্বেও থেকে গেল ত্রুটি। বিজ্ঞানীরা আবার বসলেন ত্রুটি সংশোধন করতে। এবার এগিয়ে এলেন ইয়ং, ফ্রেনল প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। নতুন তত্ত্বের অবতারণা করে কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করা গেলেও তাঁরা সেই কাল্পনিক বস্তু ঈথারকে বাদ দিলেন না। সিন্ধবাদ বণিকের ঘাড়ে ভূতের মত ঈথার

বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে ভর করেই থাকল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ফ্যারাডে চৌম্বক ও তড়িৎক্ষেত্রের উপর আলোকের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, অসলসত্ব এবং স্বচ্ছ কোন বস্তুকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে বস্তুটি আলোকে সক্রিয় হয়ে উঠে। ফ্যারাডের এই পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন আলোক, তড়িৎ এবং চুম্বক পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল আবার আবিষ্কার করলেন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করলেন আলোক প্রকৃতিতে এক প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদিনে বাদ পড়ল আলোকের ঈথার তরঙ্গের কথা।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ম্যাক্সওয়েলের মতবাদকে সত্য বলে মেনে আস-ছিলেন বিজ্ঞানীর ততদিনের বিজ্ঞানের পরিধি হয়েছে আরও বিস্তৃত। কত বিজ্ঞানীর কত মতবাদ জমা হয়েছে বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই সব মতবাদের ভিত্তিতে পূর্বের মতবাদগুলিকে যাচাই করার প্রবণতা দেখা দিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্বও বাদ পড়ল না। কিন্তু যাচাই করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সংশয় ক্রমশঃ ঘণীভূত হল। ঠিক মত মেনে নিতে পারলেন না ম্যাক্সওয়েলের মতবাদকে।

সেই সময় প্ল্যাঙ্ক নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রবর্তন করলেন নতুন এক মতবাদ। আবিষ্কর্তার নামানুসারে সেই মতবাদটির নাম "প্ল্যাঙ্কের কোয়ণ্টাম থিওরী"। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আলোকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন কোয়াণ্টাম তত্বকে। প্রমাণ করলেন আলোক শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ধারা নয়। আলোর কণিকাগুলি উৎস থেকে শক্তির আকারে গুচ্ছে গুচ্ছে নির্গত হয়।

আবার সেই কণিকা বাদ। দেখা গেল আইনস্টাইনের মতবাদ নিউটনের কণিকাবাদেরই পরিবর্তিত রূপ। ইথারের কল্পনাকে নাকচ করলেন তিনি। তাঁর তত্ব অনুসারে আলোক কণিকাগুলি শক্তির আকারে নির্গত হয়। সেই কণিকার নাম ফোটান। বিজ্ঞানীরা এবার

স্থির করলেন, আলোকরশ্মি কণা এবং তরঙ্গ দুই আকারে বিরাজ করছে।

আইনস্টাইনের উপরোক্ত মতবাদটি আলোকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। নামে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা অনেকক্ষেত্রে সুফল লাভ করলেন। তবে দু চার জায়গায় অকৃতকার্যও হলেন।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করেছেন ইলেকট্রনকে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আলোকের ধর্ম প্রযোজ্য কিনা পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ইলেকট্রনেরও আছে তরঙ্গ ধর্ম। উদ্‌ঘাটিত হল আর এক সত্য! দেখা গেল তরঙ্গের যেমন ফোটন রূপ আছে তেমনই কণারও আছে তরঙ্গ রূপ।

বিজ্ঞানীরা এবার দু উপায়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন যেখানে আলোকের সঙ্গে আলোকের পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে হল সেখানে প্রয়োগ করলেন তরঙ্গ বাদ আর যেখানে পদার্থ এবং বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হল সেখানে প্রয়োগ করলেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব। পরে অবশ্য বিজ্ঞানী ডি. ব্রগলী পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন, ফোটন এক মুহূর্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গ এবং পর মুহূর্তে এটি কণিকা।

আকাশের নীলিমা গোধূলির রক্তরাগ ও রমন এফেক্ট

আকাশের নীলিমা :—

আমরা জানি, সূর্য রশ্মিকে বিশ্লেষণ করলে সাতটি রঙ পাওয়া যায়। রঙগুলি হচ্ছে, বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। ঐ সব রঙের আলোক রশ্মির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওদের সবার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সমান নয়। আবার আলোক তরঙ্গ যখন কোন ক্ষুদ্র কণিকার উপর আপতিত হয় তখন কণিকা তরঙ্গের আঘাত থেকে শক্তিলাভ করে। এই ঘটনাকে আলোক বিজ্ঞানীরা বলেন 'বিক্ষেপণ'। পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে, বিক্ষেপণ, নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর। ক্ষুদ্র তরঙ্গ

দৈর্ঘের আলো বেশী বিক্ষেপণ ঘটায় এবং বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো অপেক্ষাকৃত কম বিক্ষেপণ ঘটায়। সূর্য রশ্মির বিভিন্ন বর্ণগুলির মধ্যে একমাত্র বেগুনী রঙের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম। তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দিক থেকে বেগুনীর পরে নীলের, তারপর আসমানী, সবুজ প্রভৃতির স্থান। অর্থাৎ এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেগুনী অপেক্ষা একটু একটু বেশী।

পৃথিবীর উপরিভাগের অনেকটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল। বায়ু-মণ্ডলটা উপরের দিকে ক্রমশ পাতলা হয়ে গেছে। তাহলেও বায়ুমণ্ডলের সব জায়গায় অবস্থান করছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং গ্যাসীয় অণু। উপরের দিকে যদিও ওরা অত্যন্ত বিরলভাবে বিরাজ করছে।

সূর্য রশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও গ্যসীয় অণুর উপর আপতিত হয় যখন ঐ বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ প্রভৃতি কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রঙগুলি বিক্ষিপ্ত হয়। হলদে, কমলা, লাল প্রভৃতি বড় তরঙ্গ দৈর্ঘের রঙগুলি বিক্ষিপ্ত না হয়ে ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। নীল জাতীয় রঙগুলো বিক্ষিপ্ত হয় বলেই আকাশকে নীল দেখায়। যেন একটা নীল চাদর পৃথিবীর মাথার উপর পাতা আছে। আসলে সবটাই ফাঁকি।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল না থাকলে আকাশকে নীল দেখাত না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছেড়ে উপরের দিকে উঠলে দেখা যাবে আকাশটা ঘোর অন্ধকার। যেন বিশ্বের সমূহ কালিমাকে গ্রাস করে আছে।

গোধুলির রক্তরাগ :—

কেবল গোধূলির সময় নয়, উষাকালেও দেখা যায় দিগন্তের পাশে সিঁদুর মাখান একখানা প্রকাণ্ড থালার মত সূর্য উঁকি দিচ্ছে। অন্য সময় সূর্যকে এমনটি দেখায় না। কোন্ নিপুণ শিল্পী সূর্যকে অলক্তকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়? না, কারিগরের কোন কারিগরি নেই।

সকাল সাঁঝে সূর্য থাকে দিগন্তের কাছাকাছি। সেই সময় সূর্য রশ্মিকে পৃথিবী পৃষ্ঠে আসতে হয় সুগভীর বায়ুস্তর ভেদ করে। এক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈঘ্যের রশ্মিগুলি বিক্ষেপণ ঘটে যায়। কেবল লাল রঙের রশ্মিগুলির বিক্ষপণ ঘটে না। কারণ ওদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যই সব চেয়ে বেশী। তাই লাল

রঙের রশ্মিগুলি বিক্ষিপ্ত না হয়ে সোজাসুজি চলে আসে পৃথিবীর দিকে। সেইজন্যে উষা ও গোধূলি বেলায় সূর্যকে এত লাল দেখায়।

গোধূলি এবং উষার আকাশটাকেও অনেক সময় লাল দেখায়। তার কারণ, দিগন্ত থেকে সূর্য রশ্মিকে ধূলিকণা এবং জলকণাকে ভেদ করে আসতে হয়। এরা সূর্য রশ্মির সকল রঙকে শোষণ করে নিতে পারে। পারে না কেবল লাল রঙটিকে। যেমন গাছের পাতার ক্লোরোফিল একমাত্র সবুজ রঙ ছাড়া আর সব রঙকে শোষণ করে নেয় বলে গাছের পাতাকে সবুজ দেখায়। যারা সব রঙকে শোষণ করতে পারে তাদের দেখায় কালো, আর যারা কোন রঙকে শোষণ করতে পারে না তাদের দেখায় সাদা। সাতটি রঙের সমাহারে যে সাদা রঙটি উৎপন্ন হয়, এই সত্য বিজ্ঞানী নিউটন তাঁর বর্ণ চাকতির পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন।

রমণ এফেক্ট :—

আগে বলা হয়েছে কোন বস্তুতে আলোক রশ্মি পড়লে কোন কোন রশ্মি শোষিত হয় আর কোন কোনটি বিকিরিত হয়ে যায়। কোন জিনিষকে লাল দেখায় তার কারণ একমাত্র লাল ছাড়া আর সব রঙের রশ্মিগুলিকে শোষণ করে নেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আলোকের শোষণ এবং বিকিরণ সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানী বহু রকমের পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের পরীক্ষাটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কোন বস্তুর অণুতে আলো কিভাবে বিকিরিত হয় সেই নিয়েই গবেষণা করেছিলেন অনেক দিন ধরে। একদিন তিনি বুঝতে পারলেন, নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার আলোক তরঙ্গের সঙ্গে যদি অণুর সংঘাত ঘটে তাহলে আলোর দীপ্তির হ্রাস ঘটবে। কিন্তু কম্পন সংখ্যা আপতিত আলোর সমান থাকবে। তিনি আরও জানালেন, আলোক বিকিরণের সময় কম্পন সংখ্যার যদি হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহলে যে আলো বিক্ষিপ্ত হবে তার দীপ্তি বড়ই ক্ষীণ।

র‍্যালের আগেও দু একজন বিজ্ঞানী ঠিক এইভাবেই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের কেউই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নি।

এক ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. ভি. রমন আলোকের এই ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করেন এক বিশেষ ধরনের বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। বস্তুর অণুতে আলোকের কম্পন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ফলে যে আলোকের বিকিরণ ঘটে তার দীপ্তি অতীব ক্ষীণ হলেও একদিন ধরা পড়ল রমনের বর্ণালীবিক্ষণ যন্ত্রে। ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার। পরীক্ষালব্ধ উক্ত ঘটনাই আলোক বিজ্ঞানে রমন এফেক্ট বা রমন ক্রিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

রমন এফেক্টের ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। তরঙ্গ তত্ত্ব, তাপগতিবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগে রমন ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এবং বর্তমানে এই ক্রিয়ার সীমা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

॥ মহাজাগতিক রশ্মি ॥

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানীরা এক রহস্যময় ও অন্তর্ভেদী রশ্মির সন্ধান লাভ করেন। সেই রশ্মির প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষণা সত্ত্বেও অনেক তথ্য এখন অনাবিষ্কৃত। তথাপি যে তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিও চমকপ্রদ নয়।

অনেকের মতে সৌর জগতের বাহির থেকে এক ধরণের রশ্মির আগমন ঘটে এবং মহাকাশের সর্বত্র অনুভূত হয় এই রশ্মির প্রভাব। এর উৎসস্থল অতি দূরবর্তী নক্ষত্র সমূহের অভ্যন্তর ভাগ। বিশ্বের সব জায়গায়, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র অনুভূত আশ্চর্যজনক এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এই রশ্মির এককালে নামকরণ হয়েছিল "মহাজাগতিক রশ্মি" বা "কসমিক রে"। এখনও অবশ্য এই নামেই অবিহিত করা হয়ে থাকে।

মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে'র আবিষ্কার খুব বেশী দিনের নয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'উইলসন,' 'এলস্টার' প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় আকস্মিক ভাবে এই রশ্মির সন্ধান লাভ করেছিলেন।

একদিন বিজ্ঞানী উইলসন দেখলেন, আহিত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র আপনা হতেই আধান ছাড়াতে আরম্ভ করল। তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রটিকে এবার তিনি অন্তরিত করে রাখলেন। তবুও দেখা গেল সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তিনি এবং তাঁর সহযোগিগণ ভাবলেন, পৃথিবীজাত কোন বিকিরণ অথবা পৃথিবীর মধ্যে মিশে থাকা কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।

তাঁদের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় মন ভরল না বিজ্ঞানীদের। প্রবৃত্ত হলেন মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল অনুসন্ধানে। দীর্ঘ পরীক্ষার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, এই রশ্মি বিকিরণের ফলে বায়ু আয়নিত হয়ে যায়।

পৃথিবীর স্থলভাগ ছাড়া অন্য কোথাও এই রশ্মি অনুভূত হয় কিনা জানার জন্যেও অনেক সচেষ্ট হলেন। তাঁদের মধ্যে 'রেনার' নামে এক বিজ্ঞানী সমুদ্রের তলদেশে কতকগুলো পরীক্ষা চালালেন। বুঝতে পারলেন এই অদ্ভুত রশ্মি জলের তলায়ও অনুভূত হয় এবং আয়ননে ক্ষমতা রাখে। "হেস" নামে আর একজন বিজ্ঞানী বেলুনে গ্যাস ভর্তি করে পৃথিবী থেকে কয়েক-হাজার ফুট উপরে তুলে পরীক্ষা করে দেখতেন। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা। অজানা এই রশ্মির উপরের দিকে ক্ষমতা অনেক বেশী। সেখানে বাতাসকে অতি দ্রুত আয়নিত করছে এবং দিনে রাতে সব সময়ই অনুভূত হচ্ছে।

হেসের এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল, মহাজাগতিক রশ্মির উৎসস্থল পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের জন্য নয়। আবার সূর্যও তার একমাত্র উৎসস্থল নয়। কেন না সূর্যই যদি উৎসস্থল হত তাহলে রাতে কিছুতেই এই রশ্মি অনুভূত হত না। এতদিনে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এই রশ্মির উৎসস্থল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে আছে।

এবার এই রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে দেখার পালা। প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, এই রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশেষ। এরা হয় গামা কণিকা, নয়ত ফোটন কণিকা। বিজ্ঞানী মিলিকান ঘোষণা করলেন, এই বিকিরত রশ্মি প্রোটন কণিকা ছাড়া আর কিছু নয়। সৌর জগতের

বাহিরে হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে যে সমস্ত নক্ষত্র অবস্থান করছে তাদের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনের সংযোজনের সময় যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তখনই উদ্ভূত হয় এই রশ্মি। অবশ্য আমাদের সূর্য থেকেও নির্গত হচ্ছে। যদিও মিলিকানের আবিষ্কারের পূর্বে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে "বেটে" এবং কোল্‌হুর স্টার নামে দুজন বিজ্ঞানী "গাইগার" "ম্যূলার" নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেম মহাজাগতিক রশ্মি কতকগুলো কণিকার সমষ্টি এবং কণাগুলি বিদ্যুতাশ্রিত।

এমনই করে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হল অনেক রহস্য। বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমে ফলে জানা গেল, এই রশ্মির উপাদান প্রধাধনতঃ প্রোটন কণিকা হলেও এতে আছে কিছু কিছু আলফাকণা, নিউট্রন মেসন প্রভৃতি। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ভারি নিউক্লিয়াসও পাওয়া গেল। তাদের উপাদান লৌহ, অক্সিজেন, কারবন প্রভৃতি। তাছাড়া এই রশ্মির মধ্যে ইলেকট্রন কণিকাও থাকতে পারে।

অন্যান্য পরীক্ষাটি থেকে আরও জানা গেল, নক্ষত্রের আলোতে যে শক্তি বর্তমান মহাজাগতিক রশ্মির কণিকার শক্তি তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশী। যে কোন বস্তুপিণ্ড ঐ কণিকার সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে এক ধরনের নতুন কণিকার সৃষ্টি হয়। সেই কণিকার নাম মেসন। এই কণিকাকে সচরাচর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

আরও মজার কথা, মহাজাগতিক রশ্মিস্থিত বিভিন্ন কণিকাগুলি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসে তখন বায়ুমণ্ডলস্থিত বিভিন্ন বস্তুকণার সংঙ্গে সংঘাত হয়। তারই ফলে আরও এক ধরণের রশ্মির উদ্ভব হয়। সেই রশ্মির উপাদান মেসন, পজিট্রন ও ফোটন।

বায়ুমণ্ডলকে অতিক্রম করে আসার সময় মহাজাগতিক রশ্মি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন কণিকাগুলি একসময় তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেবল মেসন কথাগুলো পৃথিবীর ভূস্তর ভেদ করে নীচে চলে যায়। কিন্তু তারাও বেশীক্ষণ স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে না। এক সময় সম্পুর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মূল মহাজাগতিক রশ্মি উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও আছে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ। "সোয়ান" প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য বং অন্যান্য নক্ষত্রে যে সৌর কলঙ্কের উদ্ভব হয়, তারই ফলে পরিবর্তিত হয় তাদের চৌম্বক ক্ষেত্র। চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনই হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক্‌রের উৎস।

॥ শীততাপ নিয়ন্ত্রণের কথা ॥

বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এবং বায়ুর তাপমাত্রা আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধের একমাত্র কারণ। গরমদেশে গ্রীষ্ম-কালে ভয়ানক গুমোটের কথা কে না জানে? অথচ একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে গুমোটের সময় বসে থাকলে কতই না আরাম বোধ হয়! শীতের সময়ও তাই। বাহিরে যখন হাড় কাঁপান শীত, প্রচুর শীতের পোষাক গায়ে জড়িয়েও দাঁত কপাটি লেগে যায় তখন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সাধারণ একটা জামা গায়ে দিয়েও বসে থাকতে অসুবিধা হয় না। তাই আজকাল বড় বড় অফিস, কোন কোন কলকারখানা এবং প্রেক্ষাগৃহ গুলিতে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বায়ুর তাপমাত্রা যদি সব সময় একই থাকত এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি হ্রাস বৃদ্ধি না হত তাহলে আমাদের কোন সময় অস্বস্তি বোধ হত না। আমাদের অস্বস্তি বোধের একটা বড় কারণ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি।

সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে এবং গরম দেশে জলের বাষ্পীভবন দ্রুত হয় বলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী থাকে। ঐ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাতাসে যখন বেশী থাকে না তখন আমাদের শরীরের ঘাম সহজে

বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কারণ, বাতাসে জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত না থাকার জন্য বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা যথেষ্টই থাকে। বাষ্পীভবনে শৈত্যের উৎপত্তি হয় বলে দেহের ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাওয়ায় বেশী অস্বস্তি বোধ হয় না।

অতএব বোঝা যায়, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়া এবং কমার সঙ্গে আমাদের দৈহিক অস্বস্তি বোধ বাড়ে কিংবা কমে। বাতাসের উষ্ণতা যদি বেশীও হয়, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে অস্বস্তি তেমন হবে না। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বায়ুতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে এমন একটা পরিস্থিতি আসবে, যখন বায়ু আর এক তিলও জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখতে পারবে না। তখন আমরা বলব, বাতাস জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ উপায়ে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে।

কোন এক সময়ে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুর কোন নির্দিষ্ট আয়তনে অবস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরের সঙ্গে সেই আয়তনকে সেই উষ্ণতায় সম্পৃক্ত করতে যে ভরের জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয়, সেই দুই ভরে অনুপাতকে বলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা। কোন কোন সংবাদপত্রে সেই দিনের আবহাওয়া সংবাদে লেখা থাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০%। কথাটির অর্থ হচ্ছে, সেই দিনের একটা নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন শতকরা ৮০ ভাগ জলীয় বাষ্প বায়ুতে আছে। সাধারণতঃ বায়ুর তাপমাত্রা যদি ৭৫ ফারেনহাইট বা ২৪° সেন্টিগ্রেড থাকে এবং ঐ তাপমাত্রায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি শতকরা ৫০ ভাগ হয় তাহলে আমাদের দৈহিক অসাচ্ছন্দ্য বোধ থাকবে না। বায়ু ঐ তাপমাত্রায় অধিক উষ্ণ হলে এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে অস্বস্তি অনুভূত হবেই।

উপরোক্ত নীতিটিকে কাজে লাগিয়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কক্ষকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, সেই কক্ষের বাতায়নে বসাতে হয় একটি বিশেষ ধরণের যন্ত্র। যন্ত্রটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে

একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর দ্বারা ইচ্ছামত শৈত্য উৎপাদন করা যায় যন্ত্রে একটা ফিল্টার বা পরিশোধক ব্যবহার করা হয়। তার কাজ হচ্ছে, কক্ষের অভ্যন্তরের বায়ুকে পরিশুদ্ধ করা! আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করার জন্য যন্ত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে বিশেষ এক ধরণের পাখা। অর্থাৎ এক কথায় শীত, গ্রীষ্ম, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, এমন কি বায়ুকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে। সেই কারণে যন্ত্রটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। নিয়ন্ত্রক যন্ত্র সমূহের এক একটির এমন ক্ষমতা যে, প্রতি ঘণ্টায় ত্রিশ লক্ষ ক্যালরি পর্যন্ত তাপ অপসারণ করতে পারে।

আগে যখন শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, তখন বড় বড় বাড়ী অথবা অফিসের দরজা জানালায় খসখস নামে একরকম শুকনো ঘাসের পর্দা তৈরী করে টাঙান হত। খসখসের পর্দায় জল ছিটিয়ে দিলে সেই জল বাষ্পীভূত হবার সময় ঘরের ভেতর থেকে তাপ গ্রহণ করত। তারপর ঘরটা তাপ হারাতে হারাতে এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত।

এখন কোন কোন জায়গায় তেমন ব্যবস্থা চোখে পড়ে। তবে এই পুরাতন পদ্ধতি আর চলছে না। শহরের বড় বড় সৌধকে প্রায়ই শীততাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে! শীততাপ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কেবল মাত্র শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয় না—কতকগুলি যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতার জন্যেও প্রয়োজন হয়।

॥ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ও বর্ণালী বিদ্যার কথা ॥

বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় একটি কলিমেটর টিউব, একটি কাচের প্রিজম ও একটি ছোট্ট দূরবীন।

কলিমেটর টিউবটি একটি ধাতু নির্মিত সরল চোঙ। ওর এক মুখে দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি অনচ্ছ কোন ধাতব পাতের ঢাকনি দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং এই দুই ধাতব ঢাকনির মাঝখানে থাকে খুব সরু একটুখানি ফাঁক।

কলিমেটর টিউবের অপর প্রান্তে বসান থাকে একটি উত্তল লেন্স। ধাতব পাতের ঢাকনার মধ্যস্থলে যে সরু ছিদ্রটা থাকে, সেটি ঐ উত্তল লেন্সের ফোকাসে থাকে।

কলিমেটর যে মুখে লেন্স থাকে, সেই মুখটিকে একটি প্রিজম বা ত্রিশিরা কাচের সামনে রাখা হয়। প্রিজমের অপর পাশে স্থাপন করা থাকে ছোট দূরবীন বা টেলিস্কোপটি। সমস্ত যন্ত্রগুলি কাঠের অথবা ধাতব পাটাতনের উপর কম উচ্চতায় ফাঁকে ফাঁকে সাজান থাকে।

কলিমেটর টিউবের সরু ফাঁক দিয়ে অতি সামান্য আলোক রশ্মি প্রবেশ করে অপর মুখের লেন্সের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। সামনে প্রিজম থাকার জন্য আলোক রশ্মি প্রিজমের পিঠে পড়ে বর্ণালীরূপে নির্গত হয়। তার কারণ, প্রিজমের দুই পিঠে পড়ে আলোক রশ্মি প্রতিসরিত হয় এবং কলিমেটর টিউব থেকে নির্গত সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করে। দূরবীনের সাহায্যে সেই বর্ণালীকে দেখা হয় বলে প্রতিটি রঙের জন্য একটি সরু ফাঁকের প্রতিচ্ছবি পর পর সাজানো আছে দেখা যায়। দূরবীনের অক্ষিকাচের সামনে একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেট রেখে ছবিও তোলা যায়। যদিও সে ছবির বিভিন্ন রঙ পাওয়া যাবে না তবুও সেই সাদা কালো ছবিতে বর্ণালীর সাতটি রঙ গায়ে গায়ে লেগে থেকেও কোনটির বিস্তার কতখানি ভালভাবেই জানা যায়।

পরীক্ষাটি অতি সাধারণ সন্দেহ নাই। সূর্য রশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করে সাতটি রঙে ভাগ করা হয়। এইমাত্র। কিন্তু এই পরীক্ষা থেকে এবং সূর্য রশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করা থেকে উদ্ভূত হয়েছে আলোক বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা— নাম যার বর্ণালী বিদ্যা। বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে ঐ বিদ্যাকে প্রয়োগ করে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করেছে।

বর্ণালী বিদ্যা বলতে বোঝায় বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মিশ্রিত আলোককে বিশ্লেষণ করা। প্রতিসারিত ও শোষিত দু ধরণের আকোককেই বিশ্লেষিত করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণ করার কাজে মূল যে জিনিসটির ব্যবহার করা হয় সেটির নাম প্রিজম। এই প্রিজমের কোন

কোনটি ক্রাউন কাচদিয়ে তৈরী, কোনটি বা কোয়ার্টজ নির্মিত। আবার কোথাও কোথাও সমতল অথবা অবতল গ্রেটিং যন্ত্র বা ঝাঁঝরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনেকের ধারণা, বর্ণালীবিদ্যা কেবল মাত্র জোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সে ধারণা ভুল। জ্যোতিবিজ্ঞানে বর্ণালী বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এর দান আদৌ অকিঞ্চিৎকর নয়। রমন ক্রিয়া আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার কোন আলোকের সঙ্গে যদি কোন অনুর সংঘাত ঘটে তাহলে আলোর দীপ্তির হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি ঘটবে। 'রমন' আরও প্রমাণ করেছিলেন, আলোর ফোটন কনিকা অণুর সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে পরমাণুর গতি শক্তি থেকে কিছু শক্তিসংগ্রহ করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। যার ফলে আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায়। রমন আবিষ্কৃত বিশেষ বর্ণালী মাপক যন্ত্রের দ্বারা বর্ণালী বিশ্লেষণ করে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ বল প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেছে। এমনকি হাইড্রোজেনের বর্ণালীর সন্ধান করতে গিয়ে একদিন বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী "নীলস বোর" পরমাণুর গঠনের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরমাণু বিজ্ঞানে বর্ণালীবিদ্যার প্রয়োগ আরও আছে। বিশেষ করে পরমাণুর কেন্দ্রক সম্বন্ধে গবেষণায় এই বিদ্যার প্রয়োগ করে সমস্থানিক মৌলগুলিকে সনাক্ত করণ ও অনেক সুবিধা হয়েছে।

সমস্থানিক মৌলগুলি বা আইসোটোপ সম্বন্ধে একটু বলার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাহিরে বিভিন্ন কক্ষে আবর্তন করে ইলেকট্রন। পরমাণুর কেন্দ্রে যতটা প্রোটন থাকে বাহিরের কক্ষে আবর্তন করে ঠিক ততটা ইলেকট্রন। তাই পরমাণু তড়িৎ নিরপেক্ষ। মৌলের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে ঐ প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর। পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থিত নিউট্রন তড়িৎ নিরপেক্ষ কণিকা বলে ওর অবস্থিতিতে পরমাণুর তড়িৎ সাম্যের পরিবর্তন ঘটেনা। নিউক্লিয়াসে

নিউট্রনের সংখ্যা বাড়ালে কিংবা কমালে পরমাণুর ধর্মের পরিবর্তন না হয়ে কেবলমাত্র পারমাণবিক ভর বাড়ে কিংবা কমে। নিউক্লিয়াসে একই সংখ্যক প্রোটন সমন্বিত বিভিন্ন ভরের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুকেই বলা হয় সমস্থানিক মৌল বা আইসোটোপ। বলা বাহুল্য নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রনই সমস্থানিকতার একমাত্র কারণ। সমস্থানিক মৌল কৃত্রিমভাবে যেমন প্রস্তুত করা যায়, তেমনই স্বাভাবিক ভাবে কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়।

সমস্থানিক মৌলগুলির ক্ষেত্রে বর্ণালী বিদ্যা প্রয়োগ করা হয়। দেখা গেছে ওদের বর্ণালী রেখার মধ্যে থাকে বেশ একটু তফাৎ। অতি সূক্ষ্ম বর্ণালীমাপক যন্ত্রেই সেই তফাৎটুকু ধরা পড়ে। হাইড্রোজেনের সমস্থানিক মৌল ডয়টেরিয়ামকে একদিন সনাক্ত করা হয়েছিল এইভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে। ডয়টেরিমামের আবিষ্কর্তা "ইউরে নামে একজন বিজ্ঞানী।

এবার বর্ণালী বিদ্যার আবিষ্কারের ইতিহাসটুকু এবং জ্যোতিবিজ্ঞানে এর প্রয়োগ সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

সূর্যের আলোককে বিশ্লেষিত করার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন বিজ্ঞানী নিউটন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই জানালেন, সূর্যের আলো সাদা নয়। সাতটি রঙের মিশ্রণে ঐ সাদা সূর্যালোক। সেদিন অবশ্য বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। তবে নিউটনের ঘোষণার পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানা ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরি করে। এগিয়ে এলেন সূর্য রশ্মিকে বিশ্লেষণ করতে। সাত রঙ ছাড়াও অন্য কোন রঙ আছে কিনা এ নিয়েও বহু বিজ্ঞানী গবেষণা আরম্ভ করলেন। প্রায় দেড়শ বছর পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী "হার্সেল" সূর্য রশ্মির মধ্যে সন্ধান পেলেন অবলোহিত রশ্মির। তাঁর কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী ফ্রনহোপার নিজের তৈরি বিশেষ এক ধরণের বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কতকগুলো কালো কালো রেখার সন্ধান পেলেন। তিনি দেখলেন, সূর্যালোক থেকে এত যে সাত রঙের বর্ণালী পাওয়া যায় তাতে থাকে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণের রেখা বা দাগ। আবিষ্কর্তার নামানুসারে সেই সব রেখাকে বলা হয় "ফ্রনহোপার

রেখা।" ব্যাখ্যা স্বরূপ ফ্রনহোপার নিজেই বর্ণনা করেছেন, সূর্য থেকে আগত আলোক যখন বিশ্লেষণ মণ্ডল এবং পৃথিবীর শীতল আবহমণ্ডলকে ভেদ করে আসে তখন সেখানকার গ্যাসগুলো নিজ নিজ বর্ণালীর আলোককে শোষণ করে নেয়। সেই কারণেই দেখা যায় কালো কালো দাগ।

ফ্রনহোপার রেখা থেকে সূর্য পৃষ্ঠের তাপ এবং সূর্যের গঠন উপাদান জানা যায়। এই বিষয়ে গবেষণা করে যিনি সবচেয়ে বেশী সুনাম অর্জন করেছেন, তিনি ভারতের মহান বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা! বর্ণালী সংক্রান্ত বহু তথ্যের আবিষ্কর্তা তিনি। কেবল সূর্যের নয়, অন্যান্য নক্ষত্রদের আলোককেও ডঃ সাহা বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন নক্ষত্রের গঠন উপাদান।

বর্ণালী বীক্ষণ দ্বারা কোন রাসায়নিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কিরসফ ও বুনসেন নামে দুজন বিজ্ঞানী। কিরসফের তথ্য থেকে জানা গেল, প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের রেখাবর্ণালী রূপ আলাদা। অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থের রেখাবর্ণালী সঙ্গে অপর মৌলিক পদার্থের রেখা বর্ণালী একটু না একটু তফাৎ থাকবেই। উদাহরণ সরূপ বলা যায়, মানুষকে না দেখে ও কণ্ঠস্বর শুনে অনেক সময় চেনা যায়। কারণ একজন মানুষের গলার স্বরের সঙ্গে অন্য লোকের গলার স্বরের বেশ কিছুটা বৈসাদৃশ্য থাকে।

কিরসফ এবং বুনসেন বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দুটি মৌলিক পদার্থের ও সন্ধান পেয়েছিলেন। সে দুটি মৌলিক পদার্থের নাম সীজিয়াম এবং রুবিডিয়াম।

বর্ণালী বীক্ষণযন্ত্রে ব্যবহৃত প্রিজম নানা রককের হয়ে থাকে। সাধারণ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রে কাচ নির্মিত প্রিজম ব্যবহার করা হলেও অতি বেগুনী রশ্মি বিশ্লেষণ করার কাজে কোয়ার্টজ নির্মিত প্রিজম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দূরাগত নক্ষত্রের আলোককে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় ইন্টার ফেরোমিটার নামে বিশেষ এক রকমের বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র। এতে

প্রিজমের বদলে গ্রেটিং বা ঝাঁঝরি ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী ফাব্রি এবং বিজ্ঞানী "পেবো" এই বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

মহাকাশের খবর সংগ্রহের ব্যাপারে বর্ণালী বিদ্যা এখন একরকম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে! এই উদ্দেশ্যে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। সেই তত্ত্বটির নাম "ডপলার তত্ত্ব"। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে এগিয়ে এলে তার বর্ণালী বেগুনী আলোক দিকে একটু সরে যায় আবার কোন নক্ষত্র যদি দূরে সরে যায় তাহলে তার বর্ণালী লাল আলোর দিকে সরে যাবে। এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় কোন নক্ষত্র কোন্ দিকে কত গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া নক্ষত্রদের আবর্তন সম্বন্ধেও বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায় নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে। দেখা গেছে কেবল গ্রহরা নয় নক্ষত্ররাও নিজ মেরু অবলম্বন করে আবর্তন করে। ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা যায় বর্ণালীতে আছে কতকগুলে আড়াআড়ি ভাবে রেখা। নক্ষত্রদের আবর্তনের ফলে রেখাগুলি বেশ চওড়া হয়। নক্ষত্র যত দ্রুত আবর্তন করে তার রেখা তত বেশী চওড়া।

এক কথায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে বর্ণালী বিদ্যা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আজকের দিনে অকল্পনীয় মহাবিশ্বের যে রূপটি বিজ্ঞানীরা শোনাচ্ছেন তার মূলে আছে বর্ণালী বিদ্যা। ভবিষ্যতে এই বিদ্যার আরও উন্নতি হবে।

———

তৃতীয় খণ্ড

॥ গ্যাসের আলো ॥

এক ছিলেন তরুণ। নাম তাঁর মার্ডক। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন কর্মঠ ও বুদ্ধিমান, অপরদিকে লেখাপড়ার প্রতি ছিল তেমনই আগ্রহ। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। গরীব পিতার সন্তান বলে বেশিদিন স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলেন না। তাই সেই বয়সেই রোজগারের জন্য নিযুক্ত হতে হল গরু চরানোর কাজে।

মার্ডকের বয়স তখন বার থেকে চৌদ্দ-এর মধ্যে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাহাড় তুলিতে গরুর পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন আর সন্ধ্যে হলেই ফিরে আসতেন বাড়িতে। সঙ্গে একটি থলিতে থাকতো ছুরি, কাঁচি, পেরেক, হাতুড়ি, বাটালি এবং ছোট্ট একটি করাত। যখন গরুগুলো বিশ্রাম করতো অথবা একমনে ঘাস খেতো তখন মার্ডক তাঁর যন্ত্রপাতি বার করে কাঠ কিংবা শোলাকে কেটে কত চমৎকার খেলনা, টুপি প্রভৃতি তৈরি করতেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসেও চুপচাপ বসে থাকতেন না। তখন ও চলতো তাঁর যন্ত্রপাতির কাজ।

মার্ডকের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত হলেন সবাই। পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন বলাবলী করতে আরম্ভ করলেন, মার্ডক যদি কোন একটি কারিগরি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেতো তাহলে ভবিষ্যতে একজন দক্ষ কারিগর হয়ে উঠতো। মার্ডকের পিতা শুনলেন সব কথা আর আপন অক্ষমতা স্মরণ করে কেবলই দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন।

আরও একটু বড় হলেন মার্ডক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যন্ত্রপাতির নেশাও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। মনে রঙীন স্বপ্ন আর প্রবল উচ্চাকাঙ্খা। একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কারখানার মিস্ত্রীদের মত তিনিও একজন বড় মিস্ত্রী হবেন। কিন্তু কেমন করে লাভ করবেন তেমন সুযোগ।

একবার এক ভদ্রলোক মার্ডকে জানালেন, মাঝে মাঝে বড় বড় কারখানাগুলো শিক্ষানবীশ হিসাবে তরুণদের গ্রহণ করে থাকে। মার্ডক ইচ্ছা করলে বার্মিহাম শহরে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে পারেন।

কথাটা মার্ডকের খুবই মনে ধরলো। একদিন পিতাকে বললেন: আমি শহরে গিয়ে কোন কারখানায় কাজ শিখতে চাই বাবা। পুত্রের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন পিতা। বললেন: লেখাপড়া জানা নেই, পয়সা কড়ি নেই, কেমন করে কাজ শিখবি সেখানে? মার্ডক হেসে বললেন: শুনেছি, ওরা বিনা পয়সায় কাজ শেখায় এবং একটা মাসোহারাও দেয়। খোঁজ করে দেখাই যাক না কেন, যদি তেমন কোন কাজ জুটে যায়।

খুশি হয়ে পিতা সম্মতি দান করলেন। আর মার্ডকও বেরিয়ে পড়লেন কাজের খোঁজে।

শহরে গিয়ে বড় কারখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন মার্ডক। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। মার্ডকের ব্যবহার এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে মালিকের খুবই ভাল লাগলো। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন শিক্ষানবীশরূপে।

এত সহজে কাজটা পেয়ে যাবেন বলে মার্ডকের ধারণাই ছিলনা। ভারি আনন্দিত হলেন তিনি এবং খুব মন দিয়েই কাজ শিখতে আরম্ভ করলেন।

অল্প দিনে মার্ডকের কাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল কারখানায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ মিস্ত্রীদের তাঁর কাছে। হার মানতে হল। যেন একেবারে জাত শিল্পী! যা একটি বার দেখেন, তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে নেন। খুব প্রীত হলেন মালিক এবং কয়েক মাসের মধ্যেই একজন স্থায়ী কারিগর হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করলেন কারখানায়।

মার্ডক ছিলেন একেবারে কাজ পাগলা যাকে বলে। দুর্দান্ত পরিশ্রমও তিনি করতে পারতেন। এমন কি কাজের শেষে বাসায় এলেও এক দণ্ড বিশ্রাম করতেন না। নিজের যন্ত্রপাতি দিয়ে খেয়াল খুশি মত এটা ওটা

তৈরী করতেন। এক কথায় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন তিনি। কিন্তু আজকের মত বিজলী বাতির প্রচলন সে যুগে না থাকায় রাতে কাজ করার ছিল ভয়ানক অসুবিধা। লণ্ঠন জ্বালিয়ে যে টুকু আলো পাওয়া যেত, তাতে কোন সূক্ষ্ম কাজ করা যেত না। বড্ড অসুবিধা অনুভব করলেন মার্ডক। মনে মনে ঠিক করলেন, যেমন করে হোক এই অসুবিধা তাঁকে দূর করতেই হবে।

সুরু হলো মার্ডকের চিন্তা-ভাবনা। সে কী চিন্তা! কাজ করার সময় ভাবেন, বেড়াতে গেলে ভাবেন, এমন কি খেতে শুতে গেলেও ভাবেন। ভাবতে ভাবতে একদিন মনে এলো, কয়লা পোড়ানর সময় তাপ ও আলো দুইই পাওয়া যায়। আবার কয়লা যখন পুড়তে থাকে তখন পাওয়া যায় প্রচুর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াটা কী দাহ্য? একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়!

যেইই ভাবা সেইই কাজ। এক দিন রাতে মার্ডক একটা কেট্‌লিকে কয়লা ভর্তি করে জ্বলন্ত উনানে চাপালেন। উপরের মুখটা ভালভাবে বন্ধ করে দিলেন আর কেট্‌লির নলটার সঙ্গে যুক্ত করলেন একটা রবারের নল। তারপর নলের শেষ প্রান্তটা একটি মোটা ধাতব চোঙের তলায় বায়ু নিরুদ্ধ করে যুক্ত করলেন। চোঙের অপর প্রান্তেও যুক্ত করলেন আর একটি রবারের নল। এই নলের অপর প্রান্তটা শোলার ছিপি দিয়ে বন্ধ করে ছিপিতে একটা খুব সরু ছিদ্র করলেন।

কেট্‌লির কয়লা উত্তপ্ত হতেই ছিদ্র দিয়ে হুস হুস করে গ্যাস বার হতে আরম্ভ করলো। অম্‌নি মার্ডক গ্যাসের মুখে ধরলেন একটি জ্বলন্ত কাঠি। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো গ্যাস। সে কী তীব্র ও চোখ ধাঁধান আলো। নিজের কাজে নিজেই অবাক হলেন মার্ডক।

মার্ডকের আবিষ্কারের কথাটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল এখানে ওখানে। অনেকেই এই অসম্ভব ব্যাপারটা দেখার জন্য ছুটে এলেন। এলেন বন্ধু-বান্ধব, এলেন কারখানার মালিক, এলেন অগণিত কৌতুহলী দর্শক। এমন কি বিজ্ঞানীরাও বাদ পড়লেন না। শেষ পর্যন্ত ডেভির মত নাম করা

বিজ্ঞানীও একদিন ছুটে এলেন মার্ডকের কাছে। মার্ডক ডেভিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। শেষে মত প্রকাশ করলেন, কয়লার গ্যাসের সাহায্যে লণ্ডনের মত বিরাট বিরাট শহরকেও আলোকিত করা যেতে পারে।

ডেভি কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না মার্ডকের কথায়। অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

মাড´ক কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। বরং ডেভির অনাস্থা তাঁর উৎসাহকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। আগে তাঁদের বার্মিংহাম শহরটাকে আলোকিত করার জন্য প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এত অর্থ তাঁর কোথায়? অগত্যা বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ করলেন কিছু সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। অধিকন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপও করলো অনেক।

এবারও উদ্যম হারালেন না মার্ডক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, গ্যাস জ্বালিয়ে শহরময় আলোকিত করা যাবেই যাবে।

মার্ডক তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন কারখানার মালিককে। কি ভেবে মালিক কিছু অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হলেন। মার্ডক খুশি হয়ে আরম্ভ করলেন কাজ। কিন্তু খুব গোপনে সংগ্রহ করলেন কয়লা। গোপনে কিনে আনলেন শ' শ' গজ রবারের নল, গোপনে তৈরি করলেন বয়লার ও গ্যাস ট্যাঙ্ক। পরিশেষে একদিন রাতে শহরের লোক দেখতে পেল, চারিদিকে আলোর বন্যা। সারা শহর আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। মার্ডকের এই অসাধারণ কীর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। পরদিন সকালে তাঁর জয় জয়াকার পড়ে গেল। কারখানার সামান্য এক কারিগর হয়েও শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করলেন। অধ্যবসায় এমনই জিনিস।

মার্ডকের আবিষ্কারের পর থেকে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সব শহরকে আলোকিত করা হতো গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে। বর্তমানে যদিও গ্যাস আলো ব্যবহার করা হচ্ছে না তবুও ল্যাবরোটারিতে

কাজ করার সময় এখনও কয়লা থেকে গ্যাস তৈরি করে গ্যাস বার্ণার জ্বালান হয়।

পোলিও রোগের টিকা

এক ছিলেন তরুণ ডাক্তার। চিকিৎসা করা যেমন ছিল তাঁর পেশা, তেমনই গবেষণা করা ছিল নেশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বিভিন্ন রোগ জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে গবেষণা করতেন তিনি। বড় কিছু একটা আবিষ্কার করা হয়ত তাঁর ইচ্ছা ছিল না।

ডাক্তারের ছিল দয়ার শরীর। মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়েই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। অর্থের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। তাই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। বহু দূর দূর জায়গা থেকে সুচিকিৎসার জন্য মানুষ ছুটে আসতো তাঁর কাছে। তিনি তখন এক হাসপাতালের ডাক্তার।

একবার এলেন এক মা—তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে করে। শিশুটির হয়েছিল পোলিও রোগ বা শিশু পক্ষাঘাত। রোগ ভোগ করতে করতে তাঁর শরীরটা তখন হয়ে গেছে বিবর্ণ ও বিশুষ্ক। জীবনের আশা একেবারে নেই বললেও চলে।

তখনও পর্যন্ত পোলিও রোগের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। তাই শিশুটিকে পরীক্ষা করে চিন্তিত হলেন ডাক্তার। সেই সঙ্গে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে একটি কুঁড়িকে অকালে ঝরে যেতে হবে মনে করে মনটাও ব্যাথায় ভরে উঠলো। সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলেন ডাক্তার, ঐ পোলিও রোগটার প্রতিষেধক আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর জননীদের দুঃখ মোচন করবেন।

ডাক্তার তখন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবাণু তত্ত্ববিভাগে

কয়েকজন গবেষকদের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। উপরোক্ত ঘটনাটির পর তাঁর দৃষ্টি পোলিওর দিকে আকৃষ্ট হলো। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেই বিভাগে যাঁরা পোলিও সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন, এই ডাক্তার তাঁদের সহযোগী হয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। হাসপাতাল এবং চিকিৎসা করা এবার মাথায় উঠলো। রাতদিন কেবল চলতে লাগল গবেষণা-গবেষণা আর গবেষণা।

ঐ পোলিও রোগটা সাধারণতঃ অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদেরই হয়ে থাকে। বড়দের যে একেবারে হয়না এমন নয়। সে সময় প্রতিবছর পৃথিবীর হাজার হাজার শিশুকে এই রোগ আক্রমণ করতো। কেউ প্রাণে বাঁচতো, কেউ বা দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর মারা যেত। আবার প্রাণে যারা বেঁচে থাকতো, তাদের অনেকের দেহই বিকলাঙ্গ হয়ে যেত এবং দুর্বিসহ জীবন যাপন করতো, চিকিৎসকদের মতে, শিশুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের পেশীগুলি অপুষ্টির জন্য ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় বলে ওরা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এই সব কারণে সেদিনও পৃথিবীর বহুদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানী উক্ত রোগটির প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন এবং কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যও আবিষ্কার করেছিলেন। তরুণ ডাক্তারটির সুবিধা হলো অনেকখানি। গবেষকদের অধীনে কিছুকাল গবেষণা করার পর তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে আরম্ভ করলেন গবেষণা।

কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর। ডাক্তারের কঠিন তপস্যা একদিন সার্থক হলো। বহু বছরের সাধনার ফলে লাভ করলেন পোলিও রোগের প্রতিশেধক টিকা। কিন্তু পরীক্ষার এখনও বাকি। ডাক্তার হঠাৎ ভেবে পেলেন না—কার উপরে তিনি প্রথম প্রয়োগ করবেন এই টিকাকে।

অনেক ভেবে ডাক্তার ঠিক করলেন, নিজ শরীরেই গ্রহণ করবেন পোলিওর টিকা। খারাপ যদি কিছু হয় তাহলে নিজেরই হোক।

শুভদিনে নিজের দেহে নিজেই টিকা নিলেন ডাক্তার। তারপর একদিন শরীরে প্রবেশ করালেন পোলিওর ভাইরাস। একটুও কাঁপল না তার হাত, কুঞ্চিত হলোনা মুখমণ্ডল।

একদিন একদিন করে দিন কাটতে লাগল। কোন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন না তিনি কিংবা পোলিওর লক্ষণও দেখা গেল না শরীরে। নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার এবার পরিবারের অপর সবাইকে দিলেন আবিষ্কৃত টিকা। অচিরে বুঝতে পারলেন, তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত টিকা গ্রহণ করলে শরীর পোলিও রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে।

ডাক্তার সেদিন ইচ্ছা করলে তাঁর আবিষ্কারটিকে পেটেন্ট করে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জগৎকে জানিয়ে দিলেন। ফলে যেন হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল ডাক্তারের নাম। সেই থেকে দূরীভূত হলো পোলিওর ভয়াবহতা।

এই ডাক্তারটির নাম জোনাস শালক। তাঁরই উদ্ভাবিত টিকাকে শিশুর জন্মের কয়েক মাসের পর থেকে এক মাস অন্তর অন্তর তিনবার প্রয়োগ করতে হয়। যে সব শিশু এই টিকা ঠিকমত গ্রহণ করে তাদের শিশু-পক্ষাঘাত বা পোলিওমাইলাইটিস বা সংক্ষেপে পোলিও নামক রোগটি হয় না।

পরবর্তীকালে সাবিন নামে আর একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী পোলিওর টিকার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। তাই শালক্ ও সাবিন উভয়েই অমর হয়ে আছেন পৃথিবীতে।

যক্ষ্মার প্রতিষেধক

অতি প্রাচীনকাল থেকে কতকগুলি ব্যাধিকে চিকিৎসকরা "দুরারোগ্য ব্যাধি" রূপে চিহ্নিত করে এসেছিলেন। সেই ব্যাধিগুলির মধ্যে যক্ষ্মা ছিল একটি। এমন একদিন ছিল, যক্ষ্মার নাম শুনলে মানুষ শিউড়ে উঠতো। সম্পুর্ণরূপে পরিহার করে চলতো যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শ। প্রাচীন ভারতীয়

চিকিৎসকরা বলতেন "শিবের অসাধ্য ব্যাধি"। অর্থাৎ তাঁদের মতে, যে দেবাদিদেব মহাদেব মানুষের রোগ নিরাময় কল্পে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন এবং যাঁর কৃপায় যে কোন রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যেতে পারতো সেই শিবেরই যক্ষ্মা নিরাময় করানোর ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজ আর এই রোগটি দুরারোগ্য ব্যাধির তালিকায় নেই। ঘরে বসে ঔষধ সেবন করে এবং পুষ্টিকর খাবার খেয়েই যক্ষ্মা রোগীরা সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করতে পারছে। তাছাড়া শরীর যাতে যক্ষ্মা রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য বি, সি, জি, টিকার-ও প্রবর্তন হয়েছে। এককথায় যে রোগে আগে একশ জনের মধ্যে একশ' জনের মৃত্যু হতো, সেই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারে "আমি মরবো না।—আমি মরতে পারিনা।" অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, মনুষ্যসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে যক্ষ্মার প্রতিষেধক একটি অতি উল্লেখ-যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। যাঁর কৃতিত্বে এই রোগটা অপর দশটা সাধারণ রোগের পর্যায়ে এসে গেছে তাঁর নাম ডঃ সেলমন এব্রাহাম ওয়াক্সম্যান। সর্বযুগের এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষী বিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি। অথচ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না—ছিলেন এক কৃষিবিজ্ঞানী। বিধাতার কি অদ্ভূত খেয়াল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটি এল তাঁরই হাত দিয়ে। আবিষ্কারটি একরকম আকস্মিক বলা যেতে পারে।

ডঃ সেলমন এব্রাহাম ওয়াক্সম্যানের ডাক্তার হওয়ারই কথা ছিল। যখন তিনি কিশোর, সেই সময় তাঁর একটা ছোট বোন ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। সেলমন ছোট বোনটিকে অত্যন্ত আদর করতেন। বোনের মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলোকে দূর করতে তিনি ডাক্তার হবেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! একটু বড় হতেই বালক ভুলে গেলেন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। আকর্ষণ বোধ করলেন কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি। হয়ত সেদিন বালকের আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিক প্রার্থনায় তুষ্ট হয়েছিলেন

ঈশ্বর। তাই কৃষিবিজ্ঞানীরই হাতে অর্পন করেছিলেন একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ—তার ভগিনীর প্রতি ভালবাসার পুরস্কার।

সেলমনের মনটাও ছিল অত্যন্ত সাদা। কৃষকদের উন্নতির জন্যই তিনি কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে মৃত্তিকার উর্বতাবৃদ্ধি ছিল তাঁর গবেরণার বিষয়। এ বিষয়ে কৃতকার্যও হয়েছিলেন তিনি। নাইট্রোজেন ঘটিত সার যে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক, এই তথ্য আবিষ্কার করে কৃষিবিজ্ঞানে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেন। উক্ত আবিষ্কারের পরও বিভিন্ন প্রকার মাটি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা অব্যাহত ছিল। একদিন মাটিকে নিয়ে গবেষণাকালে আকস্মিকভাবে লাভ করেক "ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস" নামক একধরণের জীবাণুর সন্ধান। সেলমন তাঁর এই আবিষ্কারটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে বেশ কিছুকাল গবেষণা করেন এবং কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যও সংগ্রহ করেন।

তারপর গত হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বছর। পৃথিবীর আকাশে একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের আগুন। একদিকে ধ্বংস, অপরদিকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, সূচিত হলো মনুষ্য জাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সবচেয়ে কল্যাণকর অবদানটি হলো পেনিসিলিন। ওর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কাছে মাথা হেঁট করলো অধিকাংশ দুরারোগ্য ব্যাধি। বিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়ে গেল এক দারুণ রকমের সাড়া। পেনিসিলিন নোটেটাম জাতীয় ছাত্রাকের মত আশ্চর্য গুনসম্পন্ন অপর কোন ছত্রাক পাওয়া যায় কি না—সে বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেকেই হলেন যত্নবান। ডঃ সেলমনও বাদ পড়লেন না। তাঁর পূর্ব আবিষ্কৃত "ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস" জীবাণুদের সূত্র ধরে আরম্ভ করলেন গবেষণা। পরিশেষে পচা-মৃত্তিকাও জাত এক ধরণের ছত্রাক থেকে নিষ্কাশিত করলেন "ট্রেপটোমাইসিন" নামক একটি অ্যান্টিবায়েটিক। ঐ ট্রোপটোমাইসিনই যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক।

ডঃ সেলমন এব্রাহাম ওয়াক্সম্যানের আবিষ্কার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অমূল্য আবদানের জন্য তাঁকে ঐ বছরই নোবেল

পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে। আজ পৃথিবী থেকে যক্ষ্মা একরকম নির্বাসিত। অথচ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাতো। স্ট্রেপটোমাইসিনই রুদ্ধ করেছে এত মানুষের অকাল মৃত্যু। 'ওয়াক্সম্যানের' অবদানের তাই কোন তুলনা হয় না। মানুষের হৃদ্‌সিংহাসনে তিনি চিরকালই অধিষ্ঠিত থাকবেন।

কালাজ্বরের ওষুধ

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে মাঝে মাঝে এক ধরণের মারাত্মক রোগ আত্ম-প্রকাশ করতো এবং ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষকে অকালে প্রাণ হারাতে হতো। রোগটির নাম ছিল কালাজ্বর। এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় দেহে অল্প অল্প জ্বর আসতো। তারপর প্লীহা এবং যকৃৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতো। মাস খানেকের মধ্যে প্রকাশ পেতো রক্তল্পতার লক্ষণ, মাথার চুলগুলো উঠতে আরম্ভ করতো এবং শরীরটা হয়ে যেতো একেবারে কালিবর্ণ। অবশেষে রোগী ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতো মৃত্যুর দিকে।

কালাজ্বরে কোন একক রোগী প্রায়ই আক্রান্ত হতো না। একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে এই রোগ আত্মপ্রকাশ করতো। ফলে অকালমৃত্যু বরণ করতে হতো শত শত শিশু, যুবা ও বৃদ্ধকে। অথচ তখন এর প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না।

কালাজ্বরের বীভৎসরূপ দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানীরা। ততদিনে অবশ্য বিজ্ঞানের কৃপায় মাত্র কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধিকে মানুষ আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্বেও ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের বিভীষিকা দমন করতে পারছিল না। এমনকি কোন্ কোন্ কারণে উক্ত রোগ দুটি সক্রামিত হয় তাও কেউ জানতো না। তাই বহুদিন থেকে পৃথিবীর বহুদেশের বিজ্ঞানী

এবং চিকিৎসকগণ ঐ দুটি রোগের কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন।

ইংরাজী ১৯০০ সাল। দীর্ঘকাল গবেষণার পর লীশম্যান নামে জনৈক ইংরাজ বিজ্ঞানী কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগী প্লীহাকে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে একদিন একরকম আকস্মিকভাবে সন্ধান লাভ করলেন এক ধরণের পরজীবী জীবাণুর। দেখলেন, ঐ জীবাণুরা প্লীহার মধ্যে এক জায়গায় অত্যন্ত গুপ্তভাবে অবস্থান করছে। লীশম্যান আরও কয়েকটি কালাজ্বরে মৃত রোগীর প্লীহাকে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। পরিশেষে বুঝতে পারলেন ঐ পরজীবী জীবাণুরাই কালাজ্বরের একমাত্র কারণ। তখন তিনি সেই জীবাণুদের নামকরণ করলেন এল. ডি. বডি।

লীশম্যানের আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। তাঁর পরীক্ষাগুলিকে ভিত্তি করে বহু বিজ্ঞানী সুস্থ দেহে এল. ডি. বডিদের অনুপ্রবেশের কারণ নির্ণয়ে হলেন যত্নবান। প্রায় চারবছর পরে রজার্স নামে এক জীবাণুতত্ত্ববিদের গবেষণায় ধরা পড়লো, কালাজ্বরের মুলে আছে এক প্রকারের মাছি। ঐ মাছির দংশনে সুস্থদেহে এল. ডি. বডিরা অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারে ব্যর্থ হলেন লীশম্যান এবং রজার্স। তার কারণ, উভয়ের কেউই ছিলেন না রসায়নবিদ।

কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তখন অধ্যাপনা এবং গবেষণা করতেন এক তরুণ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, ম্যালেরিয়া এবং তার প্রতিষেধক। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা। কিন্তু স্যার রোনাল্ড রস যখন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু এবং উক্ত রোগের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি আবিষ্কার করে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করলেন তখন ঐ ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানীটি অপর কোন্ রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করবেন—এই নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। ঠিক সেই সময়ই তাঁর হাতে এল লীশম্যান ও রজার্সের গবেষণা। তরুণটি অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন এবং কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম আরম্ভ করলেন।

কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর। তবুও ভারতের এই তরুণ বিজ্ঞানীটির গবেষণার গতি মন্দীভুত হলো না। বরং দিন যতই অতিবাহিত হতে লাগলো ততই তাঁর আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। পরিশেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি। পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিলেন "ইউরিয়া স্টিবামাইন" নামক কালাজ্বরের প্রতিষেধক ওষুধ। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আর কালাজ্বর রাক্ষসীকেও তার দলবল নিয়ে পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে হলো।

ভারতবর্ষের এই মহান বিজ্ঞানীর নাম স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। প্রসিদ্ধ মানবহিতৈষী বিজ্ঞানী ইউ. এন, ব্রহ্মচারী নামে জগতের কাছে পরিচিত। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাঁকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছিলেন।

নাইলন

আজকাল নাইলনের জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। অথচ এটি একটি কৃত্রিম তন্তু। এই তন্তুটি সাধারণতঃ অ্যাডিপিক অ্যাসিড এবং হেক্সামেথিলিন ডাই অ্যামাইনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্যারোথার্‌সই কৃত্রিম তন্তু নাইলনকে আবিষ্কার করেছেন।

নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি আবিস্কৃত হলে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, স্বাভাবিক তন্তু অপেক্ষা এই সব কৃত্রিম তন্তুর উপযোগিতা অনেক বেশি। তাছাড়া শিল্পেও এদের চাহিদা প্রচুর। তাই বিজ্ঞানীরা টেকসই ও মজবুত ঐ জাতীয় অপর কোন তন্তু আবিষ্কার করা যায় কি না—সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তারই পরোক্ষ ফল ক্যারোথার্‌স আবিস্কৃত কৃত্রিম তন্তু নাইলন।

টেরিলিনের মত নাইলনেরও উপাদান অজৈব পদার্থ। উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সমেথিলিন ডাই অ্যামাইন সংযুক্ত

হয়ে অতিকায় অণু নাইলনের সৃষ্টি করে। তন্তু প্রস্তুত হওয়ার পর তাকে বিদ্যুতের সাহায্যে গলিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রের ছিদ্র পথে বার করে ঠাণ্ডা করলে অত্যন্ত সরু সরু তন্তু পাওয়া যায়। পরে ঐ তন্তুকে মেসিনে পাঠিয়ে রোলারের সাহায্যে পাক দিয়ে প্রয়োজনানুযায়ী মোটা কিংবা সরু উভয় ধরণের সূতা তৈরি করা হয়।

দড়ি এবং বস্ত্র শিল্পে নাইলনের ব্যবহার ব্যাপক। নাইলন সূতার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ওরা জল ধারণ করতে পারে না কিংবা জলে পচেও যায় না। তাছাড়া নাইলনের কাপড়কে ইস্ত্রি করতে হয় না এবং সহজে ভাঁজও ধরে না। খুব শক্ত, টেকসই এবং রেশমের মত চিক্কন। নাইলন ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে, এবং বিদ্যুৎ পরিবহনে অক্ষম বলে অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। প্যারাসুট, ব্রাশ, মাছধরার জাল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য আজকাল নাইলনের সুতাই ব্যবহার করা হচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে নাইলনের দান তাই অপরিসীম।

জড়ের মধ্যে জীবের গুণ

লণ্ডনের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি হলে এক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল জীব ও জড়ের সম্পর্ক। জীব ও জড় পদার্থের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বিজ্ঞানী একসময় বললেন : আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, জীবের মত জড়ও উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেশ বিদেশের বহু নামকরা বিজ্ঞানী। তৎকালীন ইংলণ্ডের লব্ধ প্রতিষ্ঠ বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী স্যার মাইকেল ফস্টারও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। তরুণ বিজ্ঞানীটির কথা শুনে ফস্টার বিস্মিত বড় কম হলেন না। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল একমাত্র জীবই উত্তেজনায় সাড়া দেয়। যাদের জন্ম নেই, বৃদ্ধি নেই, মৃত্যু নেই, যাদের অবচেতন পদার্থরূপে বিজ্ঞান গণ্য করে থাকে, তাদের মধ্যে সাড়া পাওয়া যাবে—এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

তরুণ বিজ্ঞানীটির বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতিক্ষা করতে লাগলেন ফস্টার। কিন্তু বক্তৃতা শেষ করতে পারলেন না বিজ্ঞানী। মাঝখানেই উঠলো প্রতিবাদের তুমুল ঝড়। কেন না ফস্টারের মত অপরাপর সমস্ত বিজ্ঞানীরই ধারণা ছিল, সাড়া দিতে না পারার জন্যই বিজ্ঞান ওদের জড় পদার্থরূপে চিহ্নিত করছে। তাই কোলাহল উঠলো চারিদিকে। কেউ কেউ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন: ঐ অসম্ভব ব্যাপারটা আপনি সর্ব সমক্ষে প্রমাণ করতে পারবেন?

তরুণ বিজ্ঞানীটি মৃদু হেসে বললেন: আমি জানি, পরীক্ষা ছাড়া বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আপনারা যদি প্রত্যক্ষ করতে চান তাহলে আমি যন্ত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি, মুক গাছপালা থেকে আরম্ভ করে যে কোন জড় পদার্থ উত্তেজিত হলে সাড়া না দিয়ে পারে না।

ফস্টার এবার আরও বিস্ময় বোধ করলেন। চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন: আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান জীব ও জড়ের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করে এসেছে তা কী ভুল?

পুনর্বার হাসলেন তরুণ বিজ্ঞানীটি। বললেন: আমার ধারণা, জীব ও জড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানে প্রচলিত ধারণাটি ভ্রান্ত।

আপনি কী সত্যই সর্বসমক্ষে এই সত্যটি প্রমাণ করতে পারবেন? অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলেন ফস্টার।

বিজ্ঞানী দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন: পারবো।

এরপর সভার আলোচনার কাজ আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না। সর্বসমক্ষে প্রমাণ করার দিন স্থির হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হলো।

নির্দিষ্ট দিনটিতে সমবেত হলেন বহু বিজ্ঞানী এবং বহু উৎসাহী দর্শক। তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীটি তখন একখানা অভ্রের পাত গ্রহণ করে তাতে বিষ প্রয়োগ করলেন। তারপর পাতটির সম্মুখে ধরলেন নিজেরই উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র। উপস্থিত দর্শক সবাই বিস্ময় সহকারে দেখলেন, বিষ প্রয়োগের ফলে অভ্রের পাতার মধ্যে সৃষ্টি হলো এক ধরণের মৃদু কম্পন। অতঃপর একখানা টিনের পাতকে নিয়ে তাতে বিদ্যুৎ স্পর্শ ঘটিয়েও ধরলেন, যন্ত্রের

সম্মুখে। এবারও সবাই দেখলেন, টিনের পাতটির মধ্যেও পূর্বের মত কম্পন সুরু হয়েছে।

পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞানী বললেন : কেবল মাত্র অভ্র কিংবা টিনের পাতা নয়, যে কোন জড় পদার্থে বিষপ্রয়োগ করলে অথবা বিদ্যুৎস্পর্শ ঘটালে মৃত্যুকালীন অব্যক্ত যন্ত্রণার মত একধরণের সাড়া পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানী ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন : জীবের সঙ্গে জড়ের আরও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

ফস্টারই প্রশ্ন করলেন : সে সাদৃশ্যটি আবার কী? বিজ্ঞানী বললেন : জীবের মত জড় পদার্থগুলিও দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পর অবসন্ন বোধ করে। বিশ্রামের পর জীবরা যেমন কর্মদক্ষতা ফিরে পায় তেমনই জড় পদার্থকেও কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলে সে পুনর্বার লাভ করে পুর্বক্ষমতা।

হতবাক হয়ে গেলেন সমস্ত বিজ্ঞানীরা। সবার মনে একই প্রশ্ন, এরপর জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? বিজ্ঞান এবার জড় পদার্থ কাদের বলবে?

যে তরুণ বিজ্ঞানীটি জীব ও জড়ের মধ্যে এইভাবে পার্থক্যের প্রাচীরটি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন—তাঁর নাম আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। ক্রেস্কোগ্রাফ, স্ফিগমোগ্রাফ প্রভৃতি স্বয়ংলেখ যন্ত্র উদ্ভাবন করে জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এবং উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন এই দুই জগতের বহু মূল্যবান তথ্য। বিদ্যুৎতের আঘাতে লজ্জাবতী লতার শাখায় কুঞ্চন ঘটিয়ে তিনি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদদেহের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সত্য কথা বলতে কি, একমাত্র জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার থেকেই উদ্ভিদ রাজ্যের গোপনীয় তথ্যগুলি আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

দমকল ও সাধারণ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র

দমকলের নাম তোমরা সবাই শুনেছো। সাধারণতঃ বড় বড় শহরে পুলিশের তত্বাবধানে দমকল বাহিনী থাকে। কোথাও অগ্নিকাণ্ড হলে এবং সে আগুনকে আয়ত্তে আনতে না পারলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তখন অগ্নি নির্বাপনের জন্য দমকল বাহিনীকে পাঠায়। দমকল বাহিনী এক বা একাধিক গাড়ি সজ্জিত করে ঘটনা-স্থলে পৌঁছায়। তাদের গাড়িতে বাঁধা থাকে একটি বিরাট ঘণ্টা। ঘণ্টাধ্বনি শুনলে রাস্তায় যাতায়াতকারী গাড়ীগুলি একপাশে সরে গিয়ে ওদের রাস্তা ছেড়ে দেয়।

বর্তমান দককল বাহিনী ইঞ্জিনের সাহায্যে নিকটস্থ পুকুর বা নদী থেকে জল নিয়ে আগুনের উপর ঢেলে আগুনকে আয়ত্তে আনে। প্রায় সব সময় কিছুনা কিছু জল ওরা জমে রাখে। আর রাখে যান্ত্রিক মই বা টার্নটেবল ল্যাডার। বহুতলা বিশিষ্ট পাকাঘরের আগুন নেভাবার জন্য ঐ মই তারা ব্যবহার করে।

দমকলের ইতিহাস কিন্তু অতি প্রাচীন। কথিত আছে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় হাজার বছর আগে মিশর দেশই প্রথম দমকল বাহিনী গঠন করেছিল। তখন কিন্তু আগুন নেভানর জন্য পাম্প মেসিন কিংবা গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না। কতকগুলি লোক বিশেষ একধরণের ধাতব পাত্রে জল এনে আগুনের উপর ঢালতো। ধুলাবালি ব্যবহারেরও ব্যবস্থা ছিল। কারও কারও মতে গ্রীকরাও দমকল বাহিনী গঠন করেছিল। তবু সুসজ্জিত দমকল বাহিনী গঠিত হয়েছিল রোম রাজাদের আমলে। ওদের পরিবহণের জন্য ঘোড়া ছিল, একাধিক বাহিনী ছিল এবং বাহিনীতে লোক সংখ্যা ছিল প্রচুর। তবে এরাও আগুনকে আয়ত্তে আনার জন্য ব্যবহার করতো মাটি বালি ও জল।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রায় দেড় হাজার বছর কাল পৃথিবীর কোন দেশে দমকল বাহিনী গড়ে উঠেছিল কিনা—সে বিষয় কোন নির্ভর-

যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। আধুনিক দমকল বাহিনী প্রথম লণ্ডনেই গঠন করা হয়। কথিত আছে, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে এক অতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। তখনই সচেতন হয়ে উঠে রাষ্ট্র। ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন দুর্ঘঠনা ঘটলে যাতে সহজে আয়ত্তে আনা যেতে পারে তার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এবং সরকার আগুন নেভাবার জন্য স্থায়ী ভাবে কিছু লোক নিয়োগ করেন। এই ব্যবস্থা কতকটা প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের অনুরূপ ছিল। আধুনিক সুসংগঠিত দমকল বাহিনী ইংলণ্ডে গঠিত হয়েছে উপরোক্ত ঘটনার প্রায় একশ' বছর পরে। ততদিনে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করছে। বাষ্পশক্তিকে প্রয়োগ করে একশ জন মানুষের কাজ একজন মানুষ সম্পন্ন করছে। তখনই দমকল বাহিনীর দৃষ্টি পড়ে ঐ বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দিকে। পুরাতন আমলের মত আর জল ঢেলে আগুন নেভাতে হল না, বাষ্পীয় ইঞ্জিনই সে কাজ করলো। ঘোড়ার বদলে ব্যবহৃত হলো গাড়ি।

ইংলণ্ডের দেখাদেখি পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দমকল বাহিনী গঠন করে। পরিশেষে পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর একরকম বিংশ শতাব্দীতেই দমকল বাহিনীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়।

এশিয়া ভূখণ্ডে দমকলবাহিনী প্রথম শহর কলিকাতাতেই গঠিত হয়েছিল। তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতে কায়েম হয়েছে। কলিকাতা শহর তাদের প্রধান কার্যালয়। এখানে ওখানে গড়ে উঠেছে অফিস-আদালত, কল-কারখানা। চারদিকে ফলাও কারবার। বাহির থেকে বেরিয়ে আসছে রাশি রাশি কাগজপত্র ও যন্ত্রপাতি।

তখন অগ্নি দেবতাও তাঁর লোলুপ রসনাকে সংযত করতে পারলেন না। নানাস্থানে ঘটতে লাগল ছোট বড় অগ্নিকাণ্ড। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ উপায় না পেয়ে ইংলণ্ডের দমকল বাহিনীর অনুরূপ মাত্র একটি দমকল বাহিনী গঠন করে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দমকলের একমাত্র কেন্দ্র ছিল লালবাজারে। পরে দমকল বাহিনীর সংখ্যা বাড়ানো

হয় এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চত্য থেকে উন্নতমানের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রের আমদানি করা হয়।

ছোট খাটো ধরণের অগ্নিকাণ্ডকে আয়ত্তে আনার জন্য আজকাল এক ধরণের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটিকে অনেক সময় বড় বড় সভাকক্ষে, সিনেমা হলে, ডাক্তারখানায়, সরকারী ভবনগুলিতে এবং কলকারখানার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। দ্রুত কারবন ডাই-অক্সাইড উৎপাদন করে আগুনকে নেভানোর জন্যই এই যন্ত্রের ব্যবস্থা। যন্ত্রটি শঙ্কুর আকৃতি বিশিষ্ট এবং আগাগোড়া শক্ত ধাতব পাত দিয়ে তৈরি। অভ্যন্তরে দুটি কাচ নলের একটিতে থাকে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অপরটিতে থাকে সোডিয়াম কারবনেটের দ্রবণ। যন্ত্রের উপরে থাকে একটি হাতল এবং নিচে গ্যাস নির্গমনের একটি ছিদ্র। হাতলে জোরে আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের কাচনল দুটো ভেঙ্গে গিয়ে অ্যাসিড ও সোডার দ্রবণের মিশ্রণ ঘটে। ফলে উৎপন্ন হয় প্রচুর কারবন ডাই অক্সাইড। যন্ত্রের তলদেশের ছিদ্রটিকে আগুনের উপর ধরলে গ্যাস ও বিক্রিয়ায় উৎপন্ন জল প্রবল বেগে নির্গত হয় এবং অগ্নিকে নির্বাপিত করে।

তেল কিংবা পেট্রোলের আগুনকে নেভাতে হলে যে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাতে থাকে ফটকিরি ও সোডিয়াম বাই কারবনেট। এই দুই যৌগিকের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় কারবন ডাই-অক্সাইড। কিন্তু জল উৎপন্ন হয় না আদৌ।

ফসফরাস

অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থ বলে ফসফরাসকে মৌলিক হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। তার একমাত্র কারণ, ফসফরাস অতি সহজেই বায়ুতে জারিত হয়ে যায়। তবে যৌগিক হিসাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে এবং যে

কোন ফসফেট লবনে থাকে। কোন কোন খনিজ শিলাতেও ফসফরাস বর্তমান।

ফসফরাস এক অবিস্ময়কর পদার্থ। অনেকে মনে করেন অতি প্রাচীন কালে আরবীয় অ্যালকেমিস্টরাই ফসরাসকে তার কোনো না কোন যৌগিক থেকে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ যৌগিক থেকে এবং কি ভাবে যে নিষ্কাশন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন প্রামান্য তথ্য লাভ করা যায় না। তবে মধ্যযুগে ইউরোপের দু চার জন রসায়নবিদ ফসফরাস নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন নি। সম্ভবতঃ ওর ভুতুড়ে গুণ দেখে অর্থ উপার্জনের লোভ সংবরণ করতে না পেরে একেবারেই চেপে গেছিলেন।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক।

ফসফরাস আর্দ্র বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে প্রথমে ধোঁয়া উৎপন্ন করে, পরে সবুজ আলোক শিখা বিকীর্ণ করে। এই শিখা সম্পূর্ণ তাপহীন। বিজ্ঞানের ভাষায় উক্ত আলোককে বলা হয় ঠাণ্ডা আলো। যাঁরা ফসফরাসকে প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা জনসমক্ষে ঐ ঠাণ্ডা আলোক শিখা প্রদর্শন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন।

ফসফরাসকে নিয়ে আরও অনেক খেলা দেখাতেন তাঁরা। সেই খেলা-গুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এই পরীক্ষাগুলো যে কেউ হাতে নাতে করে দেখতেও পারেন।

প্রথমতঃ তাঁরা জলের তলায় এক টুকরো ফসফরাসকে রেখে নল যোগে বাহির থেকে তার উপর বায়ু (অক্সিজেন হলে আরও ভালো হয়) পাঠাতেন। তখন সেই জলের তলায়ই আগুন জ্বলতে থাকতো।

দ্বিতীয়তঃ ফসফরাসকে কারবন ডাই সালফাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত করে কোন কিছুর উপর ঐ দ্রবণকে ছিটিয়ে দিলে অল্প পরে কারবন ডাই সালফাইড উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো। দর্শক সাধারণ জল মনে করে খেলোয়াড়ের যাদু বিদ্যা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতো।

তৃতীয়তঃ ফসফরাস ও কষ্টিক সোডাকে একত্রে মিশিয়ে গরম করতেন। তারপর যে গ্যাসটি উৎপন্ন হতো তাকে পাঠাতেন জলের ভেতর দিয়ে। ফলে উৎপন্ন হতো গ্যাসীয় বলয়।

ফসফরাসকে নিয়ে আরও বহু খেলা দেখাতেন তাঁরা। প্রতিটি খেলাই দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করতো। বিশেষ করে তাপ হীন অগ্নিশিখা এবং জল ছিটিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া অথবা জলের নিচে আগুন জ্বালানো ইত্যাদি খেলোয়াড়ের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করতো। আর সাধারণ মানুষ তাঁদের সমীহ করে চলতো। তাই আবিষ্কারক কোনদিন প্রকাশ করতেন না তাঁর আবিষ্কারের কথা। কিন্তু ঐ ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো আয়ত্ত করার জন্য অনেক সুযোগ সন্ধানী তাঁদের গুরুরূপে বরণ করতো। গুরুর কৃপা হলে শেষ বয়সে বেশ কিছু উপার্জনের পর কোনও বা দুজন শিষ্যকে শিখিয়ে দিতেন। তারপর শিষ্য আরম্ভ করতো ব্যবসা। এইভাবে কয়েকশ' বছর ধরে ফসফরাস মুষ্টিমেয় দু চারজনের অর্থ উপর্জনের সহায় হয়ে এসেছিল।

যাদুকরদের যাদুকাঠি থেকে ফরফরাস প্রথম মুক্তিলাভ করে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রাণ্ড নামে এক বিজ্ঞানীর হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হল। তিনি মূত্রের জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করে অবশেষে বালি ও কাঠকয়লা দিয়ে পুড়িয়ে পতিত করলেন। সেই দিনই ব্রাণ্ড জানতে পারলেন ফসফরাসের কথা। তবে আবিষ্কার করা মাত্র তিনি প্রকাশ করেন নি। অনেকদিন ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ফসফরাস সম্বন্ধে মানুষ প্রথম জ্ঞান লাভ করলো ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে—বিজ্ঞানী 'গ্যান' এ আবিষ্কার থেকে। গ্যান প্রাণীর অস্থি থেকেই ফসফরাস নিষ্কাশিত করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে কোন প্রাণীর অস্থিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসফরাস থাকে।

সমসাময়িক কালের বিবিধ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে জীব, জন্তুর অস্থির একটা প্রধান উপাদান ফসফরাস। জীবদেহের মাংসপেশী, জীবকোষ স্নায়ু, অস্থিমজ্জা, মস্তিষ্ক প্রভৃতিতেও ফসফরাস বিদ্যমান। তাই দেহ

গঠনের জন্য ফসফরাস ঘটিত খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। ডিমের কুসুম, মাংসের হাড় ও মজ্জায় এবং সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ফসফরাস থাকে। ছোট ছোট মাছ—যাদের কাঁটা সমেত চিবিয়ে খাওয়া যেতে পারে তেমন মাছ ও শরীরে প্রয়োজনীয় ফসফরাসকে সরবরাহ করে।

আসলে মৌলিক পদার্থ হিসেবে ফসফরাস অত্যন্ত বিষাক্ত। অতি সামান্য পরিমাণ পেটে পড়লেই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ফসফরাস ঘটিত খাদ্য আমাদের দেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। মৌলিক পদার্থরূপে ওকে তিনভাবে পাওয়া যায়—সাদা, লাল ও কালো। লাল ও কালো ফসফরাসের তুলনায় সাদা ফসফরাস অনেক—অনেক বিষাক্ত।

ফসফরাসের একটা বড় গুণ হলো অনুপ্রভা বিতরণ করা। রাত্রিতে সমুদ্রের জলকে ছিটিয়ে দিলে বেশ চক চক করতে দেখা যায়। এটি সমুদ্র-জলে দ্রবীভূত ফসফরাস কর্তৃক অনুপ্রভা বিতরণ। দেখা গেছে, পাঁচ লক্ষ ভাগ জলে মাত্র একভাগ যদি ফসফরাস থাকে তাহলে অন্ধকারে নীলাভ-দ্যুতি বিকিরণ করে বা অনুপ্রভা দেখা যায়। লোনা মাছকে অন্ধকারে চকচক করতে দেখা যায়। রাতে জোনাকিরা নীলাভ আলো বিতরণ করে। তার কারণও ঐ ফসফরাস ও তার অনুপ্রভা। জোনাকির দেহে ফসফরাস বেশী থাকায় ওটি একটি বিষাক্ত পোকা! তাই বড়রা বলে থাকেন, যে খাদ্যে জোনাকি পোকা পড়ে সে খাদ্য খেতে নেই।

ফসফরাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে অনুপ্রভা বেশী বিতরণ করে। তাই বৃষ্টিকালে জোনাকির আলো বেশ উজ্জ্বল দেখায়। ঝোপেঝাড়ে দেখা যায়—যেন দলা পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোনাকিরা। এই থেকে গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ মানুষও বৃষ্টির পূর্বাভাস প্রদান করে থাকেন।

সূর্য দেহে পার্থিব বস্তু

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের ধারণা জন্মে যে, আমাদের সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ এবং উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সূর্য দেহ থেকে। কিন্তু নিছক কল্পাকে বিজ্ঞান স্বীকার করে নিতে পারে না। তার জন্য চাই বাস্তব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ।

উক্ত কল্পনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করতে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। শুধু প্রমাণ করলেন তাঁরা, সূর্যদেহে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামক দুটি গ্যাসের প্রাধান্য। কিন্তু পৃথিবীর গঠন উপাদান তো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নয়! তাহলে পৃথিবী কী সূর্য দেহ থেকে উৎপন্ন হয় নি? অথবা আদিম কালের কোন গাঢ় মেঘপুঞ্জ থেকে একসঙ্গে সূর্য এবং তার গ্রহ উপগ্রহাদি জন্মগ্রহণ করেনি?

মুষড়ে পড়লেন বিজ্ঞানীরা। বহুদিন থেকে তাঁরা পৃথিবীর জন্ম রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হলে একটি মহান সত্য ধরা পড়তো পৃথিবীর মানুষের কাছে।

তবে কী পৃথিবীর জন্মরহস্য উদ্ঘাটন করা যাবে না? চিন্তিত হলেন পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজ। কিন্তু তাই বলে হার মানলেন না তাঁরা। নিজেদের তৈরী যন্ত্রপাতি হাতে করে এগিয়ে এলেন আরও বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। দীর্ঘকাল গবেষণার পর একমাত্র কৃতকার্য হলেন তিনিই। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করলেন, পার্থির মৌলিক পদার্থগুলির সব ক'টিই অবস্থান করছে সূর্য দেহে। একটা হিসাবও দাখিল করলেন তিনি। তাঁর সেই হিসাব থেকে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারলো, সূর্যদেহে একমাত্র হাইড্রোজেনেরই পরিমাণ ৮১·৭ ভাগের মত।

অবশিষ্টের মধ্যে হিলিয়াম আছে ১৮'১৭ ভাগ এবং কারবন আছে '০৭ ভাগ। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন লোহা, দস্তা, টিন, নিকেল, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর পরিমাণ মাত্র '০৬ ভাগের মত। তাঁর এই হিসেবে এখনও ভুল ধরা পড়েনি।

ভারতীয় এই বিজ্ঞানীটির আবিষ্কার নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ তাঁর গবেষণা থেকেই হস্তগত হল পৃথিবীর জন্ম রহস্যের খবরটা। দ্বিতীয়তঃ সূর্য কিংবা যে কোন নক্ষত্রপৃষ্ঠে প্রচণ্ড তাপের কারণও ব্যাখ্যা করা গেল। তখনই পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী এক বাক্যে স্বীকার করলেন, নিউটনের আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর এতবড় আবিষ্কার হয়নি। ধন্য ধন্য পড়ে গেল পৃথিবীতে।

এই ভারতীয় বিজ্ঞানীটির নাম ডঃ মেঘনাদ সাহা। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইনিও একজন। আয়নমণ্ডল এবং বেতার তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে নানা মূল্যবান তথ্য। তাঁর আজীবন গবেষণার ফল জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের দুই শাখাকে করেছে সমৃদ্ধ।

দিয়াশলাই

সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ আগুন জ্বালাতো দুখানি শুষ্ক কাঠখণ্ডের ঘর্ষণের দ্বারা। তারপর কবে যে মানুষ চকমকি পাথরের সন্ধান পেয়েছিল—সে কথা আজ আর কেউ বলতে পারে না। তবে ঐ জিনিসটি হাতে পাওয়ায় তাদের আগুন জ্বালানর কাজ অনেকটা সহজ হয়েছিল। এখনও যে সে নিয়ম সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে—এমন নয়। আজও দেখা যায়, পূজা পদ্ধতিতে যেখানে পবিত্র অগ্নিশিখা উৎপাদন করার প্রয়োজন হয়—সেখানে থাকে চকমকির ব্যবস্থা। সাধারণতঃ পাট নারকেল ছোবড়া বা অন্য কোন শুষ্ক দাহ্যবস্তুর উপর চকমকি পাথর ধরে তাতে একটি লৌহখণ্ডের

দ্বারা আঘাত করা হয়। ফলে নির্গত হয় আগুনের ফুলকি এর সঙ্গে দাহ্য বস্তুতে ঝরে পড়লেই অগ্নিসংযোগ ঘটে।

চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাবার রীতি দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। এককালে আগুন ছিল অতিশয় পবিত্র। তাই মন্দিরে মন্দিরে পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্জলনের ব্যবস্থা ছিল এবং ঐ অগ্নিকে সাবধানে সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল। সেদিন দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্যও অনেক অগ্নি সংরক্ষণ করতেন। চকমকি পাথর রাখার সবাই সুযোগ পেতেন না। কেবল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে, পুরোহিতের কাছে এবং দেবালয়েই চকমকি পাথর থাকতো। এক রকম হাজার হাজার বছর ধরে আসছিল এই রীতি।

মানুষের শত শত বছরের ঐকান্তিক সাধনার ফলে একদিন বিজ্ঞান হল উন্নত। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনুষ্য সভ্যতাও এগিয়ে চললো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে। যে কোন কঠিন কাজকে সহজ করতে মানুষের চিন্তা ভাবনার অন্ত রইল না। তখন অনেকেরই দৃষ্টি গেল সহজভাবে আগুন জ্বালানর দিকে। কত রকমের কত প্রচেষ্টা চললো দীর্ঘকাল। কিন্তু সব চিন্তাই ঐ চকমকি পাথরের মধ্যে রইল সীমাবদ্ধ। শুধু সচেষ্ট হল এমন এক দাহ্য বস্তুর সন্ধানে—যাতে সামান্য আগুনের ফুলকি পড়লে সহজে জ্বলে উঠবে।

এই প্রচেষ্টা সার্থক হল ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে হাউক উইৎস নামক জনৈক বিজ্ঞানীর হাতে। তিনি প্রথমে নরম কাঠকে সরু সরু করে আধুনিক দিয়াশলাই কাঠির রূপ দিলেন। তারপর কাঠিকে ভালভাবে শুকিয়ে গন্ধকের প্রলেপ দিলেন। আগুন জ্বালানর কাজ এতদিনে অনেকটা সহজ হল। কাঠির উপর চকমকি ঠুকলেই অল্পায়াসে পাওয়া গেল আগুন। প্রথম কাঠির পরিকল্পনা করেছিলেন বলেই বিশেষজ্ঞদের মতে হাউক উইৎসই আধুনিক দিয়াশলাই আবিষ্কারের পথিকৃৎ।

হাউক উইৎস এর পর অতিবাহিত হয়ে গেল আরও কত কাল। ধীরে ধীরে মানুষের হাতে এল বহু রাসায়নিক পদার্থ—যেগুলো বাতাসে জারিত

হয়ে অথবা একটিকে অপরটির সঙ্গে মিশ্রিত করলে স্বতঃই জ্বলে উঠে। তখন এইসব পদার্থ নিয়েই গবেষনা সুরু হল। অবশেষে উদ্ভাবিতও হল একটি পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি শুকনো কাঠির মাথায় ক্লোরেট অফ পটাশ এবং চিনিকে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে পুঁটলির মত বেঁধে দেওয়া হল। হাতের কাছে মজুত রাখা হল ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডে ভরা একটি পাত্র। প্রয়োজনানুযায়ী কাঠির ডগাটা সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে অগ্নি উৎপাদন করা হতে লাগল।

উপরোক্ত ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত হল না। কারণ, ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড বড় ভয়ানক জিনিস। ওকে ব্যবহার করতে গেলে যে কোন মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই সহজে ও নিরাপদে অগ্নিশিখা উৎপাদনের অন্য উপায় চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানীরা।

ওয়াকার নামে এক বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, দুটি বস্তুকে ঘর্ষণ করলে অণুর গতি বৃদ্ধির জন্য তাপ উৎপন্ন হয়। অতএব দুটি বস্তুর একটি যদি সহজ দাহ্য পদার্থ হয় তাহলে ঘর্ষণে কেন আগুন উৎপন্ন হবে না?

ওয়াকার খুব ভালভাবে চিন্তা করে বসে গেলেন গবেষণায়। একদিন কৃতকার্যও হলেন তিনি। কাঠির মাথায় আঠার সাহায্যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দিয়ে অমসৃন জায়গায় দু চার বার ঘষলেন। সত্য সত্যই উৎপন্ন হল আগুন। তাঁর এই পদ্ধতিটিকে সর্বাধুনিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। কারণ, তাঁরই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে নিরাপদ ঘর্ষন দিয়াশলাই।

ওয়াকারের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন সাড়া পড়ে গেল। কত বিজ্ঞানী কত রকমের যে ঘর্ষন দিয়াশলাই আবিষ্কার করলেন তার সঠিক তথ্য এখন আর প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে ওয়াকারের আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বছর পরে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করে লুসিফার দিয়াশলাই। এই দিয়াশলাই দ্বারা আগুন জ্বালানো সহজ হলেও অনেকগুলি ত্রুটি ছিল। প্রধান ত্রুটি – শ্বেত ফসফরাসের ব্যবহার।

বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়ে শ্বেত ফসফরাস স্বঃতই জলে উঠে। যদিও অল্প শিরিষ মেশান হতো বলে ওকে জারণ থেকে রক্ষা করতো তবুও এই দিয়াশলাই একেবারে নিরাপদ ছিল না। কাঠিগুলোকে এক সঙ্গে রেখে দিলে কাঠিতে কাঠিতে মৃদু ঘর্ষণেই আগুন জ্বলে উঠতো। তাই লুসিফার দিয়াশলাই একরকম পরিত্যক্ত হল এবং বিজ্ঞানীরা অন্য উপায় চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন।

বেশ কয়েকবছর পরে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ও যত্নে আবিষ্কৃত হল সেফটি ম্যাচ বা নিরাপদ দিয়াশলাই। এই দিয়াশলাই কাঠিতে শ্বেত ফসফরাসের বদলে ব্যবহৃত হল লাল ফসফরাস। পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং লাল ফসফরাসের মিশ্রণকে কাঠির ডগায় আঠার সাহায্যে আটকে দেওয়া হল। আর বাক্সের দুদিকে আঠার সাহায্যে প্রলেপ দেওয়া হল রেড লেড, সোডিয়াম নাইট্রেট এবং বালি বা মিহি কাচের গুঁড়া। আর অতি সহজে অগ্নি প্রজ্বলনের ভয় থাকল না। ফলে দিয়াশলাই ব্যবহারে অনেকটা নিরাপত্তা এল।

পরে ঐ দিয়াশলাইকে দিয়ে আরও গবেষণা হয়েছে। কাঠি যাতে সহজে ফু দিলে নিভে যায় এবং নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছাই হয়ে যেতে পারে তার জন্য কখনও ওকে সোহাগার দ্রবণে ডুবিয়ে আবার কখনও অ্যামোনিয়াম ফসফেটের দ্রবণে ডুবিয়ে শুষ্ক করা হয়। কাঠির মাথায় থাকে রেড লেড, এন্টিমনি সালফাইড, পটাসিয়াম ক্লোরেট, লাল ফসফরাস, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট। কখনও বা লোহিত ফসফরাসের পরিবর্তে ফসফরাস সালফাইডও ব্যবহার করা হয়। আঠার বদলে ব্যবহার করা হয় শিরিষের লেই। বাক্সের দুদিকে অমসৃন কাগজটাতে পূর্বের মত লাল ফসফরাস, রেড লেড বালি প্রভৃতিকে শিরিষের লেইর সাহায্যে আটকে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি কাঠির জন্য কোন কোন দিয়াশলাইয়ের কারখানা নরম কাঠের পরিবর্তে শক্ত কাগজ ব্যবহার করছে। কাঠির মাথায় পুঁটলি তৈরি করার আগে একরকম প্লাস্টিকের মধ্যে কাঠিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। তাই ঐ

কাঠি বেশ পিচ্ছিল মনে হয়। ওতে খরচ কম এবং গুণেও ভাল। বিশেষ করে জলে ভিজে গেলেও ঐ কাঠিতে জ্বালতে অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশে প্রচুর দিয়াশলাই-এর কারখানা আছে। দিয়াশলাই এমন একটি শিল্প, যা বড় শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প উভয় শিল্পেরই আওতায় আনা যায়।

ডাকটিকিট

পৃথিবীর প্রায় সবদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহ করার নেশা অত্যন্ত প্রবল। ঐ ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয় তখনও তাদের মধ্যে সেই সখ বিদ্যমান থাকে। এখনও দেখা গেছে, অতি সাধারণ মূল্যের একটা ডাকটিকিটের জন্য তাঁরা হাজার টাকা ব্যয় করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ডাকটিকিট সংগ্রহের শখটি নিঃসন্দেহে একটি ভাল শখ বা অভ্যাস। ডাকটিকিটে সাধারণতঃ দেশের রাজা বা প্রেসিডেন্ট, কবি ও সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, দেশ বরেণ্য নেতা প্রভৃতির প্রাকৃতিক মুদ্রিত হয়। আবার কোন কোন মূল্যের টিকিটে নিসর্গ দৃশ্য, জীব জন্তু, ফুলফল, অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ছবিও থাকে। তাই ডাকটিকিটের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে বহু মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেরই এই অভ্যাস গড়ে ওঠা উচিত।

এই ডাকটিকিটের ইতিহাস কিন্তু বেশিদিনের নয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। আবিষ্কর্তা হলেন স্যার রোনাল্ড হিল নামে জনৈক পোষ্ট মাস্টার জেনারেল। তাঁর এই আবিষ্কার ডাক ব্যবস্থাকে যথেষ্ট ভাবে উন্নত করেছে।

সেদিন এক পেনি ও দুপেনি মূল্যের মাত্র দুরকমের ডাক টিকিট

বাজারে ছেড়ে ছিলেন রোনাল্ড হিল। প্রত্যেকটি টিকিটের উপরে ইংলণ্ডের রাজার ছাপ ছিল, কিন্তু আজকের দিনের টিকিটের মত চার পাশে ছিদ্র ছিল না। টিকিট যাতে জাল হতে না পারে তার জন্য কাগজের মধ্যে জলছাপের ব্যবস্থা করেছিলেন রোনাল্ড হিল। তাঁর ঐ ব্যবস্থা এখনও অনুসরণ করা হয়।

প্রথম ডাকটিকিটের পেছনে আঠা লাগানর ব্যবস্থা ছিল না। পোষ্ট-মাস্টার কাঁচিতে কেটে টিকিট সরবরাহ করতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাগজটাকে সহজ করার জন্য আর্চার নামে জনৈক যন্ত্রবিদ ডাকটিকিটের চারপাশে ছিদ্র করার জন্য এক ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। আঠা লাগিয়ে শুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় আরও অনেক পরে।

ডাকটিকিট আবিষ্কারের পূর্বে পোষ্টমাস্টার এবং পত্রদাতা উভয়েরই ভয়ানক অসুবিধা হতো। পত্রদাতাকে পোষ্ট অফিসে গিয়ে কোথায় পত্র প্রেরণ করবে জানাতে হতো। পোষ্টমাষ্টার দূরত্ব হিসাব করে মাশুলের পরিমাণ জানাতেন। তারপর পয়সা গ্রহণ করে তামার পাতে ছাপ দিয়ে চিঠির সঙ্গে আটকে দিতেন। তাতে একটা চিঠির পেছনে পোষ্টমাস্টারকে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচটা মিনিট ব্যয় করতে হতো। এখনকার মত ডাক বাক্স ছিল না এবং যখন খুশি চিঠিও ডাকে দেওয়া যেত না। এই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সেকালে অনেকেই চিন্তা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রোনাল্ড হিলের ব্যবস্থাই ইংলণ্ড গ্রহণ করে এবং দেখতে দেখতে সব দেশই উক্ত ব্যবস্থাকে স্বাগত জানায়।

ভারতবর্ষে ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর। বিশেষ আইনের বলে সেই দিন থেকে চিঠির ওজন অনুযায়ী ডাক মাশুল নির্ধারিত হয় এবং প্রেরককে ডাকটিকিট লাগাতে বাধ্য করা হয়। বলা বাহুল্য ব্যবস্থাটা ছিল ইংলণ্ডেরই অনুরূপ। এখানেও কাঁচি দিয়ে ডাক-টিকিটকে কাটতে হতো। টিকিটে থাকতো ইংলণ্ডের রাজার প্রতিকৃতি এবং লেখা থাকত "ইষ্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ"। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজের পরিবর্তে লেখা হল কেবল ইণ্ডিয়া পোস্টেজ।

ব্রিটিশ ভারতে ডাকটিকিটের উপর রাজার প্রতিকৃতিই ছাপান হতো। স্বাধীনতা লাভের পর বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে বড় বড় দেশ নেতা ভারতের অগ্রগতি, জাতীয় ফুল-পাখী—জন্তু সব কিছুই ডাকটিকিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের ডাক ব্যবস্থা অতি প্রাচীন। সুলতানি আমলে সরকারি ডাকের প্রচলন ছিল। শেরশাহের আমল থেকে এই ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ঘোড়ার ডাকের সাহায্যে সরকারি খবর পঞ্চাশ দিনের পথ মাত্র পাঁচদিনে অতিক্রম করে রাজার কানে এসে পৌঁছতো। অবশ্য আজকের মত সেকালে জনসাধারণের বাহিরে চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন হতো না। কেবল যারা রাজার চাকরি গ্রহণ করে দূরে থাকতো তাদেরই চিঠি লেখার প্রয়োজন হতো। যারা চিঠি লিখতো তারা হয় সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা নিজস্ব বাহক মাধ্যমে চিঠি পাঠাতো। বর্তমানে আমাদের কর্মক্ষেত্র যে ভাবে প্রসারিত হয়েছে তাতে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি না হলে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীত হতে হতো। তাই স্যার রোনাল্ড হিল এবং আর্চারের আবিস্কারের তুলনা হয় না।

ক্যালেণ্ডার বা বর্ষপঞ্জী

'পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত দিনগুলো' অবসানের প্রাক্কালেই নতুন বছরের একটা ক্যালেণ্ডার সংগ্রহ করার জন্য আমাদের মধ্যে এক রকম সাড়া পড়ে যায়। উদ্দেশ্য আমাদের পূজা-পার্বন, উৎসব অনুষ্ঠান, ছুটিছাটা প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বাহ্ণে অবহিত হওয়া। এক কথায় ক্যালেণ্ডার বা বর্ষপঞ্জী না হলে আজকে কর্মব্যস্ততার দিনে আমাদের প্রায় সবারই অসুবিধা হয়। এমন কি ক্যালণ্ডার ব্যতীত বর্তমান জীবন যাত্রা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ অপরাপর আবিষ্কারের মত এরও একটা

ইতিহাস আছে এবং যুগে যুগে বহু প্রতিভাও নিয়োজিত হয়েছে এর পিছনে।

বর্ষগণনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল মনুষ্য সভ্যতার সেই আদি পর্বেই। সেদিন মানুষের হাতে কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছিলনা, ছিলনা হিসেব গণনার কোন ভাল পদ্ধতি। তাছাড়া সে যুগে মানুষ বিশ্বাস করতো না যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। তারা মনে করতো পৃথিবী স্থির ভাবে অবস্থান করছে আর সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। আকাশে রাশিচক্র এবং নক্ষত্র পুঞ্জের অবস্থান ঠিক করে মনে হয় খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় একহাজার কিংবা দেড় হাজার বছর পূর্বেই বছর গণনার একটা স্থূল হিসাব মানুষ প্রচলন করেছিল।

ক্যালেণ্ডার বলতে আমরা যা বুঝি, সেটির প্রবর্তন হয়েছে খ্রীষ্ট জন্মের আগে-রোমান আমলে। রোম সেদিন সভ্যতার চরম শীর্ষে আরোহণ করে প্রচলিত বহু পদ্ধতিকে সংস্কার করেছিল। সেই পদ্ধতিগুলির মধ্যে বর্ষপঞ্জীর তালিকা প্রস্তুত প্রণালীও একটি। রোমান পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছিলেন, আকাশের রাশিগুলি বছরের সব সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে না। আজ আকাশের যে জায়গায় যে রাশিটিকে দেখা যায় পুনরায় আকাশের সেই জায়গায় সেই রাশিটিকে দেখতে হলে ৩৬৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়। কিংবা সূর্য যে রাশিকে অবস্থান করছে পুনরায় সেই রাশিতে আসতে ৩৬৫ দিনে বছর ধরেছিলেন। আবার বর্ষারম্ভ ধরেছিলেন ২৫শে মার্চকে।

২৫ শে মার্চকে বর্ষারম্ভ ধরার পেছনে একটা যুক্তিও ছিল। তাঁরা মনে করতেন, ২৫ শে মার্চ দিনটিতে পৃথিবীর দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান সমান। ঐ দিনটিকে তারা ধরে নিয়েছিলেন বাসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব। বর্তমানে বিজ্ঞানীদের গণনায় ঐ তারিখটি পড়ে ২১শে মার্চ তারিখে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আর একটি দিনেও দিন রাত্রি সমান হয়ে থাকে। সে তারিখটি ২২শে সেপ্টেম্বর। বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় ঐ দিনকে বলা হয় শারদবিষুব বা জলবিষুব। রোমানরা বাসন্ত বিষুব থেকে বর্ষগণনা করে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করলেও

তাদের হিসাবটা ছিল স্থূল। কয়েক বছর পরে দেখা গেল, রাশিপুঞ্জ নির্দিষ্ট দিনে আকাশের নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যাচ্ছেনা বা ২৫শে মার্চ তারিখে দিন রাত্রি সমান হচ্ছেনা। ত্রুটি নির্ধারণের জন্য হয়ত সেদিন গবেষণাও হয়েছিল কিন্তু ভাল ফল কিছু লাভ হয়নি।

তারপর কেটে যায় বেশ কিছু কাল। দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সিজার একদিন বসলেন সিংহাসনে! ভুল বর্ষগণনা তাঁর মনঃপুত হল না। তার উপর নিজের রাজত্বকালকে মহাকালের বুকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করারও লোভ সংবরণ করতে পারেন না। তাই বড় বড় পণ্ডিতদের নিয়োগ করেছিলেন, বছরের দিন সংখ্যা সঠিক ভাবে নির্ণয় করার জন্য। মনে হয় বেশ কয়েক বছর ধরে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র এবং রাশিচক্রের উদয় অস্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন পণ্ডিতেরা। তারপর একদিন তাঁরা হিসাব করে ঠিক করেছিলেন, বছরের দিন সংখ্যা ৩৬৫-র পরিবর্তে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ হবে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫ অব্দে পণ্ডিতদের কথা মেনে নিয়ে নতুন বর্ষপঞ্জীর প্রচলন করলেন জুলিয়াস সিজার। এবার বছরের প্রথম দিন ধরা হলো ১লা জানুয়ারীকে। ১লা জানুয়ারীকে বর্ষারম্ভ ধরার পেছনে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি নেই। অনেকের মতে জানুয়ারী মাসটিকে স্বর্গের দেবতা "জেনাসের" নামানুযায়ী নামকরণ করা হয়েছিল বলে সিজার ঐ পবিত্র নামটি থেকেই বর্ষ গণনা সুরু করেছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিবর্তে নিজের খেয়ালকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তা না হলে তিনি ২২শে ডিসেম্বর বা মহাবিষুব বা শারদ বিষুব প্রভৃতির যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে পারতেন।

সিজারের নির্দেশে বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করেছিলেন পণ্ডিতেরা। এক একটি ভাগের স্থিতিকাল তিন মাস। প্রথমভাগে নির্দিষ্ট রেখেছিলেন ৯০ দিন কিন্তু চতুর্থ বৎসরে পড়বে ৯১ দিন। দ্বিতীয় ভাগের দিন সংখ্যা ৯১ দিন, তৃতীয় ভাগে ৯২ দিন এবং চতুর্থ ভাগে ৯২ দিন একেবারেই নির্দিষ্ট। প্রথমভাগের চতুর্থ বৎসরটাকে ৯১ দিন করার কারণ হল, ৩৬৫ দিন হিসাবে বছর গণনা করলে বছরে $\frac{১}{৪}$ দিন অবশিষ্ট থেকে যায়। ৪ বছরে ঐ অবশিষ্ট সময় পুরো একদিনে পরিণত হয়। তাই সেই থেকে

৪র্থ বৎসরের দিন সংখ্যাকে ৩৬৬ দিন ধরার নিয়ম প্রচলিত হল এবং ঐ বছরকে লিপ ইয়ার নামে অভিহিত করা হল। সাধারণভাবে ফেব্রুয়ারী মাসটাকে ২৮ দিন রেখে চার বছরে ওকে ২৯ দিন করার নীতি জুলিয়াস সিজারই প্রবর্তন করেছিলেন এবং এখনও সেই নিয়ম সমানভাবে চলে আসছে।

সিজারের পর প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর পরে ধর্মগুরু পোপ নতুন ভাবে বর্ষগণনার চেষ্টা করেছিলেন এবং বর্ষারম্ভ পূর্বের মত ২৫ শে মার্চকে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

তারপর কেটে যায় প্রায় হাজার বছর। এর মধ্যে বর্ষপঞ্জী সম্বন্ধে আর বড় একটা কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করেননি বা নতুন করে বছরের প্রকৃত দিন সংখ্যা নির্ধারণের প্রয়ান হয়নি মোটামুটি সিজার প্রবর্তিত নীতিই অনুসৃত হয়ে আসছিল। এ সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করলেন ধর্মগুরু ত্রয়োদশ গ্রেগরী। তিনি বছরের দিন সংখ্যা সূক্ষ্মভাবে গণনা করে দেখলেন, বছরটা ৩৬৫ দিনেও নয় আবার ৩৬৫ $\frac{১}{৪}$ দিনেও নয়। সংখ্যাটি হবে ৩৬৫'২৪২২ দিন পূর্ববর্তী হিসাবের সঙ্গে সমতা আনতে গিয়ে দেখলেন সিজারের আমল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় দশদিনের মত বেশি ধরা হয়ে গেছে। তাই তিনি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর শুক্রবার দিনটিকে সামনে এগিয়ে এনে ১৫ই অক্টোবর পরিণত করলেন। মজার কাণ্ডও ঘটল একটা। পৃথিবীর সব মানুষের বয়স বেড়ে গেল ১০ দিন। এমন কি পূর্বের দিনে যে শিশুর বয়স ছিল মাত্র ১ দিন পরদিন প্রভাতে সেই শিশুর বয়স হয়ে গেল ১১ দিন। আশ্চর্য নয় কি?

ভবিষ্যতে এ ভুল যাতে আর না হয় তার জন্যও সচেষ্ট হলেন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী। তিনি খুঁটি নাটি ভাবে হিসেব করে দেখলেন, জুলিয়াস সিজার প্রবর্তিত ক্যালেণ্ডারটিকে সংশোধন করতে হলে প্রতি হাজার বছরে ৭'৮ দিন বা ১২৮ বছরে প্রায় ১ দিন কমাতে হবে। তাই তিনি লিপ ইয়ারের নতুন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। সেই নিয়ম অনুযায়ী, ৪ বছরে লিপ ইয়ার ধরলেও ৪০০ বছরে ১০০টির পরিবর্তে ৯৭টি লিপইয়ার গণনা

করতে হবে। তিনি নির্দিষ্ট করে দিলেন শততম সালগুলি যদি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য না হয় তাহলে সেগুলি লিপ ইয়ার বলে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০, ২১০০, ২২০০, ২৩০০ প্রভৃতি সালগুলি ৪ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য নয় বলে এগুলি পিপ-ইয়ারের আওতা থেকে বাদ পড়বে।

পোপ গ্রেগরীর বর্ষপঞ্জীকে এখনও অনুসরণ করা হচ্ছে। আধুনিক গণনায় ধরা পড়েছে তাঁর গণনার মধ্যেও অল্প ত্রুটি আছে। ত্রুটি অতি সামান্য হলেও মহাকালের দরবারে একদিন একটা বিরাট অঙ্কে পরিণত হয়ে যাবে। তাই ত্রুটি মুক্ত ক্যালেণ্ডার প্রচলন করতে পৃথিবীর সবদেশই প্রয়াসী। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বহু দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানী তাঁদের নিজস্ব মতামত রেখেছেন। কিন্তু কোন মতই যুক্তি তর্কের কাছে টিকতে পারছে না। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন কোন মত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে। সেদিনও ঘটবে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের মত মজার ঘটনা। আবার যদি ১০টা দিন এগিয়ে আসে তাহলে কোন মাসে কুড়ি কিংবা একুশ দিন খেটে মানুষ পুরো একমাসের বেতন পাবে। একদিনের শিশুর বয়স হবে এগার দিন।

খনিজ তৈল থেকে প্রোটিন

খনিজ তৈল অত্যন্ত বিশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। তাকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পাতিত করে পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, ভারী তেল প্রভৃতিকে পৃথক করে নেওয়া হয়। অবশেষ রূপেও পড়ে থাকে বহু তরল পদার্থ। চিনি পৃথক করে নেওয়ার পর অবশেষ থেকে যেমন সন্ধান ক্রিয়ার দ্বারা অ্যালকোহল. গ্লুকোজ প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, ঠিক তেমনই বিশেষ ধরণের সন্ধানক্রিয়া বা কিণ্বন পদ্ধতির দ্বারা খনিজ তৈলের অবশেষ থেকে প্রোটিন নামক আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যপাদানটি

প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর এটিও একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার।

জীবদেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনে প্রোটিনের গুরুত্ব সর্বাধিক। আমরা যে খাদ্যদ্রব্যগুলি গ্রহণ করি তাকে হজম করার জন্য এনজাইম নামক যে জৈব অণুঘটকগুলি সাহায্য করে সেগুলি প্রোটিন জাতীয়। আবার রক্ত উৎপাদনের জন্য এবং শরীরকে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা দান করার জন্য প্রোটিন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই আমরা প্রতিদিন যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকি সেই তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থাকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন এই প্রোটিন সম্বন্ধে দু-চার কথা বললেই ওর গুরুত্ব আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমিল ফিসার সর্বপ্রথম প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। অবশেষে তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় একদিন প্রোটিন তার অবগুণ্ঠন মোচন করে। তাঁদের পরীক্ষাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, প্রোটিন কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমিল ফিসার পরীক্ষার দ্বারা আরও প্রমাণ করেন, অ্যামিনো অ্যাসিডরা প্রোটিনে পর পর শৃঙ্খলের আকারে সাজান থাকে। আবার ঐ অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলির উপদান একই হলেও আনবিক ওজন ওদের ভিন্ন ভিন্ন। এক একটির আনবিক ওজন কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষও হতে পারে।

প্রোটিন দু রকমের। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং প্রাণীজ প্রোটিন। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের পুষ্টিমান এবং প্রাণীজ প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পুষ্টিমান সমান নয়। আমাদের দেহ তন্তু যে সব অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি বা আমাদের দেহে যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি—সেগুলি লাভ করা যায় ঐ প্রাণীজ প্রোটিন থেকেই। কিন্তু এমন কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে প্রাণীজ প্রোটিন সহজলভ্য নয়। আবার পৃথিবীতে জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে মন হয় ভবিষ্যতে ঐ খাদ্যোপাদানটি দুর্মূল্য হয়ে

উঠবে। তাই আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে প্রাণীজ প্রোটিন উৎপাদন করার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠেন এবং অতি অল্পখরচে যাতে পুষ্টিকর প্রোটিন উৎপাদন করা যায় তার জন্যও যত্নবান হন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই খোঁজাখুঁজি সুরু হয় বিজ্ঞানীদের। তারপর একদিন সন্ধান পেলেন, ঈষ্ট নামক এককোষী জীবাণুর কোষে যে প্রোটিন থাকে তাতেই আমাদের দেহ গঠনের উপযোগী অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান। এখন বিজ্ঞানীদের চিন্তা হল, কেমন করে সহজ ভাবে ঈষ্টকে লাভ করা যাবে ?

সুরু হল বিজ্ঞানীদের গবেষণা। শেষ পর্যন্ত জীবাণু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কারবনের উৎস খুঁজতে গিয়ে পরিত্যক্ত খনিজ তেলের উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। চললো বিভিন্ন দেশে গবেষণা। ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া কেউ বাদ পড়লেন না।

সমস্যার সমাধান হল একদিন। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, খনিজ তৈল থেকে পেট্রোলিয়ামাদি পৃথক করে নেওয়ার পর যে অবশেষ পড়ে থাকে তাতে বহু জৈব যৌগ বর্তমান থাকে। ঐ জৈব যৌগগুলি জীবাণু বৃদ্ধির পক্ষে বেশ সহায়ক। তারপর কয়েকটি ধাতব লবণ উক্ত অবশেষে যোগ করে তাপমাত্রা ও অম্লত্ব নির্দিষ্ট রেখে ঈষ্ট চাষ করতে বৃদ্ধি ঘটে অস্বাভাবিক ভাবে। তারপরই আবিষ্কৃত হয় বিশেষ ধরণের সন্ধান প্রক্রিয়ার যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে খনিক তেলের অবশেষ থেকে প্রোটন নিষ্কাশিত হল। ইউরোপের প্রায় সব দেশ বর্তমানে এই উপায়ে প্রোটন উৎপাদন করছে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। বর্তমানে তারাও কৃতকার্য হয়েছেন। দেখা গেছে, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত প্রোটিনের খাদ্য মূল্য কোন অংশে প্রাণীজ প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।

এখন প্রশ্ন, কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত প্রোটিন—যার গুণ মাছ কিংবা মাংস ভক্ষণের মতই, তাকে নিরামিষ অথবা আমিষ, কী বলা যাবে ?

কয়লাকে গুঁড়ো করে অত্যধিক চাপ ও তাপমাত্রায় তার উপর দিয়ে

হাইড্রোজেনকে পরিচালনা করে কৃত্রিমভাবে পেট্রোলিয়ামও তৈরি করা যায়। অতএব কয়লা থেকে সরাসরি এক প্লেট সুস্বাদু মাংসের তরকারি কৃত্রিমভাবে বানাতে পার কিনা—সে বিষয়ে তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পার।

জীবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া

অনেক দিন আগেকার কথা।

সেকালে মানুষের ধারণা ছিল, শরীরের মাংসপেশী, হাড় ইত্যাদির মত রক্তটাও শরীরের সর্বত্র স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ রক্তের সঞ্চালন হয় না। এই প্রাচীন ধারণায় প্রথম অসন্তোষ প্রকাশ করেন ইটালীর পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক এনড্রিয়া ভেসালিয়াস। কিন্তু বহুকাল গবেষণা করেও তিনি কোন নতুন তথ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম হলেন না।

ভেসালিয়াসের কাল গত হল। তাঁর সন্দেহ প্রভাবিত করলো অনেককে। তাঁরা সবাই আরম্ভ করলেন চিন্তা। তবে সুবিধা করতে পারলেন না কেউ। শেষে মাইকেল সারভেটাস নামে একজন দার্শনিক ও শরীরতত্ত্ববিদ এক নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন। তিনি বললেন, আমাদের কিংবা যে কোন জীবদেহে রক্ত এক জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করছে না। সবসময় ফুসফুসের মাধ্যমে হৃদয়ের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাম প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ঐখান থেকে শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হচ্ছে।

কথাটা ভাল লাগলো না অনেকের। বিশেষ করে ধর্মযাজকরা ক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ, প্রাচীন সংস্কার এবং প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রগুলি যেভাবে শরীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছে সারভেটাসের মতবাদ সেগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

তবুও চুপচাপ ছিলেন ধর্মগুরুরা। কিন্তু কী খেয়াল হল সারভেটাসের! একদিন প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, জীবের আত্মা ঐ রক্তের মধ্যেই অবস্থান করে। এবার সত্যসত্যই ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো ধর্মযাজকদের। শাস্ত্রানুযায়ী আত্মা অবিনশ্বর এবং সে দেহ ও মনের অতীত। সারভেটাসের মতবাদ মানুষকে কুপথে পরিচালিত করবে, মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরকে মানবে না, অধর্মে ভরে যাবে দেশ—এই সব অজুহাতে তাঁরা সারভেটাসকে অভিযুক্ত করলো। জনসাধারণকেও তাঁরা বুঝলেন, ধর্মদ্রোহীতার ফল আদৌ ভাল হয় না। একের পাপে সারা দেশকেই ফলভোগী হতে হয়।

ধর্মযাজকদের প্ররোচনায় জনসাধারণ একেবারে ক্ষেপে উঠলো। অবশেষে হল বিচার। বিচারক রায় দিলেন, সারভেসটাস যদি তাঁর মত প্রত্যাহার করে দোষ স্বীকার করেন তাহলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে। নতুবা ধর্মবিরুদ্ধ প্রচারের জন্য অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে।

সারভেটাস্ কিন্তু রইলেন অচল ও অটল হয়ে। ফলে একদিন সত্য সত্যই তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেল হল। সারভেটার তাঁর মতবাদকে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য একটি বইও লিখেছিলেন। সে বইটিও রক্ষা পেল না। তাকেও পুড়িয়ে ফেলা হল আগুনে। ধর্ম—যাজকগণ ভাবলেন, অতঃপর এ ধরণের কথা আর কেউ প্রচার করতে সাহসী হবে না। যেন নিশ্চিত হলেন তাঁরা।

কিন্তু সন্দেহ জিনিসটা বড় ভয়ানক। অতি সঙ্গোপনে সে সর্বত্র সমভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে ব্যক্তি আপন মতবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন, তাঁর মতবাদটি কতখানি সত্য সে বিষয়ে অনেকেই হয়ে উঠলেন আগ্রহী এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করলেন চিন্তা ও গবেষণা। অবশেষে সারভেটাসের মৃত্যুর সাত বছর পরে রিয়ালভাস কোলাম্বাস নামক এক শারীরতত্ত্ববিদের কাছে তাঁর মতবাদের গুরুত্ব ধরা পড়ল। কিন্তু কোলাম্বাস সাহসী হলেন না

মতবাদটি পুনরায় প্রচার করতে। আরও কয়েকবছর পরে ব্রুনো নামক এক বিজ্ঞানীও তারভেসটাসের মতকে সমর্থন করলেন। তবে ঐ পর্যন্তই সার হল। তাঁরা প্রচার না করে ভাবীকালের গবেষকদের জন্য লিখে রেখে গেলেন।

একদিন এল প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ উইলিয়ম হার্ভের কাল। উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মতবাদ প্রভাবিত করলো তাঁকেও। তিনি কেবলমাত্র চিন্তভাবনার মধ্যে তাঁর গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না— নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। শেষে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করলেন রক্তসঞ্চালন তত্ত্বকে—যা অনেকটা হতভাগ্য বিজ্ঞানী সারভেটাসের মতবাদের অনুরূপ। তবে হার্ভে রক্তসঞ্চালন প্রমান করতে গিয়ে আত্মাকে টেনে আনেননি।

হার্ভের পরও রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে গবেয়ণা হয়েছিল। সর্বশেষে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে সব বিতর্ক এবং সব গোড়ামির অবসান হয়।

মহাবিশ্ব

খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মনে হয় কে যেন নীল রঙের একটা চাঁদোয়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে পৃথিবীটাকে। ঐ নীল চাঁদোয়াটা আবার দূরে-বহুদূরে কালো কালো গ্রামগুলোর পেছনে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সমানে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে খুশি এবং যত জোরে খুশি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ছুটে চললেও ওর প্রান্তসীমায় পৌছান যাবে না। মনে হবে, দূরত্বটা যেন সর্বদাই স্থির হয়ে আছে। এমনটি কেন হয়?

পৃথিবী গোলাকার বলে প্রান্তদেশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উপরে আরোহণ করলে প্রান্তদেশের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে বলে মনে হবে। কিন্তু উপরের ঐ নীল চাঁদোয়াটা ?

ওটা আসলে একেবারেই ফাঁকি। মহাশূন্যই ওকে বলা হয়।

তাহলে ওকে কেনই বা নীল দেখায় ?

সূর্যরশ্মির সাতরঙের মধ্যে উপরের বিরল বায়ুকণা নীল রঙটাকে শোষণ করতে না পেরে ফিরিয়ে দেয় বলে ওকে আমরা নীল দেখি। ঐ সীমাহীন মহাশূন্যকে আমরা আকাশ বলি। অবশ্য 'আকাশ' কথাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। ওকে মহাকাশ বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

দিনের আকাশে থাকে সূর্য। আর রাতের আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, নিস্তরঙ্গ কালো এক হ্রদের বুকে অসংখ্য ছোট বড় সাদা সাদা ফুল যেন ভাসছে। কিংবা গহন কালো অরণ্যের বুকে রাশি রাশি জোনাকি পোকা যেন দলা পাকিয়ে আছে। পণ্ডিতেরা সেই প্রাচীন কাল থেকেই ঐ সীমাহীন মহাকাশ এবং জোনাকির মত মিট মিটে আলোক বিন্দু-গুলিকে নিয়ে কত যে গবেষণা করেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে একত্রিত করলে সংক্ষেপে যা দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ।

আকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দুগুলি একটি সুবৃহৎ জ্যোতিষ্ক। তাদের কোন কোনটি আবার আমাদের সূর্য অপেক্ষাও লক্ষ লক্ষ গুণে বড়। ছোটও যে নেই এমন নয়।

আকাশের জ্যোতিষ্কগুলি দুদলে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা। এক দলের নিজস্ব আলো আছে। অপর দলের নিজস্ব আলো নেই—তারা সূর্যের আলোকে আলোকিত হয়। যাদের নিজস্ব আলো আছে তাদের বলা হয় নক্ষত্র এবং যাদের আলো নেই তাদের বলা হয় গ্রহ কিংবা উপগ্রহ। নক্ষত্রের আলো মিট মিট করে আর গ্রহের আলো স্থির। নক্ষত্ররা এত দূরে আছে যে তাদের আলো সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর দিকে ছুটে এলেও সে আলো পৌঁছাতে হাজার হাজার বছর

কেটে যায়। তাহলে কত বিশাল সেই মহাশূন্য? আর তার পরিচয় বা কেমন লাভ করবে মানুষ?

মানুষ কিন্তু মহাকাশের কাছে হার মানে নি। হাতের যন্ত্রপাতি নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর গবেষণা চালিয়েছে। জানতে পেরেছে অনেক কথা। সেই সঙ্গে হাজার বৈচিত্র্যে ভরা মহাকাশটার রহস্য কিছুটা উদ্‌ঘাটন করেছে। যদিও বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তথ্যগুলি বেশীর ভাগ কল্পনা প্রসূত তবুও সেই তথ্যগুলি পেছনে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে এবং অধিকাংশ তথ্য মেনে নিয়েছেন সবাই।

বিজ্ঞানীদের সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, কয়েক হাজার কোটি গ্যালাক্সী বা নক্ষত্রজগৎ নিয়ে গঠিত বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। রাত্রির নির্মল আকাশের দিকে দূরবীনের দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, এক এক জায়গায় অসংখ্য নক্ষত্র জোট বেঁধে আছে। মনে হয়, যেন এক এক টুকরা উজ্জ্বল মেঘ। এই গুলিই এক একটি নীহারিকা লোক বা নক্ষত্র জগৎ। ইংরাজীতে বলা হয় গ্যালাক্সী। পণ্ডিতেরা দেখেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্যালাক্সী চৌদ্দ লক্ষ আলোকবর্ষ অবস্থিত এণ্ড্রোমোডা নামক গ্যালাক্সীটি। এক একটি গ্যালাক্সী বা নক্ষত্র জগতের দূরত্ব যদি এত বিশাল হয় তাহলে হাজার হাজার কোটি গ্যালাক্সীকে অবস্থান করতে হলে কত বৃহৎ জায়গার যে দরকার সেটি সহজে অনুমাণ করতে পারা যায়।

এক একটি নক্ষত্র জগতের জন্যও কত জায়গা দরকার সেটিও নির্ণয় করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে এক একটি নক্ষত্র জগতে আমাদের সূর্যের মত বা তার চেয়েও অনেকগুণে বড় সহস্র সহস্র নক্ষত্র আছে। সেই সব নক্ষত্রদের কারও গ্রহ জগৎ আছে কারও বা নেই। দুটি, তিনটি বা তারও অধিক নক্ষত্র দিয়ে গঠিত এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জও আছে। নক্ষত্রগুলির কেউ কিন্তু স্থির নয়। মহাকর্ষ বলের জন্য গ্রহরা যেমন সূর্যের চারদিকে পরিক্রমা করছে ঠিক তেমনি নক্ষত্ররাও নির্দিষ্ট কক্ষে গ্যালাক্সীর চারদিকে পরিভ্রমণ করছে। তাই এক একটি গ্যালাক্সীর এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব কয়েক হাজার এমন কি কয়েক লক্ষ আলোক-

বর্ষ। তারপর আছে বিরাট ফাঁকা জায়গা। জ্যোতির্বিজ্ঞানী "হাব্‌লের মতে সেই ফাঁকা জায়গায় অক্লেশে কয়েকটা গ্যালাক্সিকে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আরও মজার কথা, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করে ব্রহ্মাণ্ডটা নাকি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় চলেছে। পাম্প দিলে বেলুন যেমন আস্তে আস্তে ফেঁপে উঠে—এ ও যেন অনেকটা তেমনই। তার ফলে নক্ষত্র জগতের মধ্যে অবস্থিত নক্ষত্র গুলোর পারস্পরিক দূরত্বও অতি অল্প অল্প বাড়ছে। অপরদিকে নক্ষত্র জগতের আয়তন এবং সেই সঙ্গে গ্যালাক্সী গুলোর মধ্যে দূরত্বও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। আবার এই দূরত্ব বৃদ্ধির একটা গতিবেগেও ঠিক করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই গতি বেগকে বলা হয় অপসরণ বেগ। বিজ্ঞানী ডপলার কর্তৃক আবিস্কৃত একটি তথ্যকে প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা ঐ গতিবেগকে নির্ণয়ও করে নিয়েছেন। দূরত্ব বৃদ্ধির একটি কারণ নির্দেশ করেছেন মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন। তাঁর মতে বস্তুরাশির মধ্যে যেমন মহাকর্ষ বল কাজ করছে তেমনই কাজ করছে একটি মহা বিকর্ষণ বল। সেই বিকর্ষণ বলই নক্ষত্র গুলোকে বিছিন্ন করে দিতে চায়।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাব্‌ল ব্রাহ্মণ্ড সম্বন্ধে আরও একটি গুরূত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে দূরের গ্যালাক্সীগুলির অপসরণ বেগ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ পৃথিবী যে গ্যালাক্সীর অন্তর্ভুক্ত সেই গ্যালাক্সী থেকে অপর গ্যালাক্সীগুলি যাদের দূরত্ব যত বেশি তাদের অপসরণ বেগও তত প্রবল। আবার হিসেব করে তিনি দেখিয়েছেন, অপসরণ বেগ বাড়াতে বাড়াতে :৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ আলোর গতিবেগের সমান। বিজ্ঞানের আর একটি মূল্যবান তথ্য হলো, কোন কিছুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের বেশি হতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসম্ভব হওয়ার কারণ নেই। তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে কোন গ্যালাক্সীকে মানুষের পক্ষে যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করেও দেখা সম্ভব নয়। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, অতি উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মানুষের দৃষ্টি সীমা মাত্র ২০০ কোটি আলোক বর্ষ দূর পর্যন্ত যেতে পেরেছে। হয়ত পরবর্তীকালে আরও উন্নত

ধরণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হবে। তবে যন্ত্রপাতির যতই উন্নতি হোক না কেন ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরকে ছাড়িয়ে যেতে পারবেনা। তাই পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান বিশ্বের ব্যাসার্ধ ১৩০০ কোটি আলোক বর্ষ এবং ব্যাস ২৬০০ কোটি আলোকবর্ষ। (এক আলোকবর্ষ, আটান্ন হাজার ছ'শ সাতান্ন কোটি মাইলের মত।) তবে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ পরে আরও কত কোটি আলোকবর্ষ পরে পর্যন্ত মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধ তা কোন দিনই মানুষ নির্ণয় করতে পারবেনা।

এই তো গেল মহাবিশ্বের নক্ষত্র জগতের সংখ্যা। এখন প্রশ্ন, মহাকাশে এত নক্ষত্র জগৎ এল কোথা থেকে এবং এরা কী আবহমান কাল ধরে এই ভাবে অবস্থান করছে? অথবা এদেরও কী ধ্বংস এবং সৃষ্টি হয়।

পূর্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে বিজ্ঞানীরা দুটি মতবাদ রেখেছেন। প্রথম মতবাদটির প্রচারক প্রসিদ্ধ ইংরাজ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল। তাঁর মতে ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রজগৎগুলি অনাদি অনন্ত কাল ধরে অবস্থান করছে। ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হওয়ার ফলে নক্ষত্রজগৎগুলির মধ্যেও দূরত্ব বড়ে চলেছে সত্য কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থের মোট ঘনত্ব চিরকাল একইথেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী প্রসারণের জন্য ঘনত্ব কমাবার কথা। কিন্তু নতুন নতুন পদার্থকণা সৃষ্টি হওয়ার দরুণ ঘনত্ব পূর্বের মতই থেকে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য উপরোক্ত যুক্তির মূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন, এখনও মহাকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রের বর্ষণ হয়। নক্ষত্রকে ধ্বংস হতেও তারা দেখেছেন! তাছাড়া সারা বিশ্বের ফাঁকা জায়গাগুলি আপাতদৃষ্টিতে শূন্য বলে মনে হলেও সেখানে অতি বিরল ভাবে অবস্থান করছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাস ও ধূলিকণা। বিজ্ঞানীদের মতে নক্ষত্রসৃষ্টি অব্যাহত আছে এবং থাকবেও চিরকাল। কারও কারও মতে মাত্র একটি নক্ষত্রের জন্ম হয় না যখন হয় তখন ঝাঁকে নক্ষত্র জন্মলাভ করে। তবে পূর্বে নক্ষত্র বর্ষণ হতো ঘন ঘন। এখন হয় কালে ভাদ্রে। আবার পূর্বের তুলনায় সংখ্যাও কম। হয়েলের মতবাদটির নাম "সদা সাম্যাবস্থা" বা "Steady State"।

মহাবিশ্বের আঙিনায় আঙিনায় অবস্থানকারী নক্ষত্রজগৎগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিতীয় আর একটি মত রয়েছে। এই মতবাদটির প্রবক্তা বেলজিয়ামের নামকরা বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটার। তাঁর মতে, সুদূর অতীতে মহাবিশ্ব এত বিশাল ছিল না। প্রসারিত হতে হতেই আজকের এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি আরও মনে করতেন, আদিতে বিশ্বের কোথাও কোন নক্ষত্রজগৎ ছিল না। তখন মহা-বিশ্বটা ছিল গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন —যেন মৃত্যুর মত ছিল স্থির ও নিষ্পন্দ। কোটি কোটি বছর পরে একদিন শুভক্ষণে বিশ্বের এক কোণে জমেছিল এক ধরণের আদিম কণিকা। সেই কণিকা যে কেমন ছিল সে পরিচয় অবশ্য তিনি লাভ করতে পারেন নি। তবে ঐ আদিম কণিকাগুলি আরও কোটি কোটি বছর পরে রূপ নিয়েছিল একটি জমাট বাঁধা পিণ্ডের আকারে এবং সেগুলি অবস্থান করেছিল বিরাট এক জায়গা জুড়ে। তারপর পিণ্ডটির ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে এমন ঘনত্ব লাভ করে যে আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। লেমেটার অনুমান করেছেন, একগ্রাম সোনা যে পরিমাণ স্থান দখল করে ঠিক ততটুকু জায়গায় সঞ্চিত আদিম কণিকার ওজন ছিল প্রায় পাঁচ কোটিগ্রাম। তার আয়তনটাও নেহাৎ কম ছিল না। ন্যূনপক্ষে পৃথিবীর আয়তনের চার পাঁচ কোটিগুণ তো হবেই।

অপরদিকে ঘনত্ব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তাপেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এত তাপ এবং ঘনত্বে সেই জমাট বাঁধা পিণ্ডটা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। একদিন ঘটলো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। ফলে পদার্থগুলো ভেঙ্গে গিয়ে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকার ধারণ করলো এবং সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো। অপরদিকে বিস্ফোরণের ফলে ব্রহ্মাণ্ডের হলো প্রসারণ। আদিম কণিকাগুলি রূপ নিল প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের আকারে। তারপর সেগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গঠন করলো মৌলিক পদার্থকণা। অবশেষে অতি বিরল ভাবে অবস্থান করতে লাগলো মহাবিশ্বের প্রতিটি আঙিনায়। বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটারের এই মতবাদকে বলা হয় "প্রচণ্ড বিস্ফোরক" বা "Big Bang" মতবাদ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরক মতবাদকে সমর্থন করে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্র জগনের সৃষ্টি রহস্যও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁদের মতে একটি নক্ষত্রের জন্ম কদাপি হয় না এমন কি সেই আদিকালেও না। পুঞ্জীভূত ঘন গ্যাসীয় মেঘ থেকে একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল সহস্র সহস্র নক্ষত্রের এক একটি নক্ষত্রজগৎ। বিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুযায়ী নক্ষত্রজগতের সৃষ্টিরহস্য নিম্নরূপ—

বিশ্বসৃষ্টির আদিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যে গ্যাসীয় পরমাণুগুলি অতি বিরলভাবে অবস্থান করছিল তাদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল হাইড্রোজেন পরমাণু। মহাবিশ্বের আয়তন ছিল কয়েক কোটি আলোকবর্ষ। ঘনত্ব একেবারে ছিল না বললেও চলে তবে তাপমাত্রা ছিল অতি ভয়ঙ্কর। প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত। আবার সেই আদিকালে বিশ্বের কোথাও ছিল না এককণা ধূলি। তাই ধূলির সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংঘর্ষে যে হাইড্রোজেন অণু গঠন করবে সে উপায়ও ছিলনা। তেমনটি হলে তাপমাত্রা অবশ্যই কমে যেত।

নগন্য ঘনত্ব এবং প্রচণ্ড তাপমাত্রা থাকলেওএকটা মহাকর্ষীয় টান কাজ করছিল। সহস্র সহস্র বছর পরে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত মহাবিশ্বের বিশাল আয়তনের গ্যাসরাশি মহাকর্ষের টানে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করলো। তখনই আরম্ভ হল তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়া। সঙ্কোচনের ফলে গ্যাসগুলো স্তূপীকৃত হতে থাকায় কিছু কিছু তাপমাত্রা বেরিয়ে এসে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। তাপমাত্রাও কমতে লাগল অতি ধীরে ও মন্থর গতিতে। এই ভাবে একদিন ঘনীভূত গ্যাস স্তূপের তাপমাত্রা দাঁড়াল দশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি।

মহাকর্ষের টানে সঙ্কোচন কিন্তু চলতে লাগলো সমান ভাবে। ফলে তাপমাত্রা পুনরায় বেড়ে চললো। তবে সেই তাপের বেশির ভাগই বিকিরিত হয়ে গেল এবং গ্যাসীয় পরমাণুগুলি লাভ করল চলৎ শক্তি। বিরাট গ্যাসের মেঘটি এবার খণ্ড হয়ে স্তূপাকারে ছড়িয়ে পড়ল এদিকে ওদিকে। কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন স্তূপগুলিও স্থির থাকতে পারল না। মহাকর্ষের

নিয়মে পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করে সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত হতে আরম্ভ করলো।

কেটে গেল আরও কত সহস্র সহস্র বছর। সঙ্কোচনের পরিমাণ হলো আরও তীব্র। তাপমাত্রাও বেড়ে চললো অস্বাভাবিক ভাবে। আবার তাপমাত্রা বিকিরিত হওয়ার ফলে সঙ্কোচন হল স্থায়ী। তার ফলে ঘনত্বও বেড়ে গেল ভয়ঙ্কর ভাবে। সেই ঘনত্ব ও তাপমাত্রায় স্তূপগুলিও নিজেদের ঠিক রাখতে পারল না। পুনরায় খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এইভাবে বিভাজন চলতে থাকলেও অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। একদিন না একদিন বিভাজন শেষ হতে বাধ্য। বিভাজন প্রক্রিয়ায় গ্যাস স্তূপগুলি এমন এক অবস্থায় এল যখন আর বিভক্ত হয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারল না। ধীরে ধীরে সঙ্কোচনের ফলে তাপমাত্রা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। অবশেষে একদিন দপ দপ করে জ্বলে উঠল। এইভাবে সৃষ্টি হল নক্ষত্র ও নক্ষত্রজগৎ। সময়টা লেগেছিল কয়েক সহস্র কোটি বছর।

নক্ষত্রের কথা

প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদ অনুযায়ী একদিন গ্যাসীয় স্তূপগুলি বিভাজন হতে হতে নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। আদি কালের সেই সব নক্ষত্র আয়তনে খুব বড় না হলেও তারা দীর্ঘায়ু। হিসাব করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন ঐ সব প্রাচীন নক্ষত্রদের বয়স প্রায় ছ'-সাতশ কোটি বছর। ওরা জন্ম লগ্নে যে হাইড্রোজেনের ভাণ্ডারকে লাভ করেছিল তাকে ধীরে সুস্থে খরচ করে চলেছে। এই কারণে ওদের ঔজ্জ্বল্য কম। আরও শত শত কোটি বছর তারা টিকে থাকবে মহাকাশে।

আদি নক্ষত্রের পরেও নক্ষত্র সৃষ্টি অব্যাহত আছে এবং ভবিষ্যতে আরও বহু নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করবে। এখন নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার কোন অসুবিধা

নেই। মহাকাশে একদিকে যেমন আছে হাইড্রোজেন পরমাণু অপরদিকে তেমনই অবস্থান করছে প্রচুর ধূলিকণা। যাদের সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হচ্ছে হাইড্রোজেন অণু। এই অণুগুলো আমার ধূলিকণার গায়ে লেগে থাকতে পারছে না। অণু গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই মিশে যাচ্ছে মহাবিশ্বের অন্তহীন গ্যাস সমুদ্রে।

হাইড্রোজেন অণু গঠিত হলে সুবিধা হয় অনেক। একদিকে যেমন গ্যাসীয় মেঘকে শীতল করতে সাহায্য করে অপরদিকে তেমনই মহাকাশে অবস্থানকারী অক্সিজেন অণু, নাইট্রোজেন অণু প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গঠন করে জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ। ঐ জলীয় বাষ্প, এবং অ্যামোনিয়া অণুই গ্যাসীয় মেঘের অভ্যন্তরে উৎপন্ন তাপকে বাহিরে যেতে দেয় না। আদিম নক্ষত্রগুলির ক্ষেত্রে এ রকমটি সম্ভব হয়নি। সে সময়ে উৎপন্ন মেঘকে কেবলমাত্র মহাকর্ষ বল দ্বারা সঙ্কুচিত হতে হয়েছিল এবং বারবার শতধা বিভক্ত হতে হয়েছিল।

আদিম মহাবিশ্বে ধূলিকণা আদৌ ছিল না। পরের দিকে এত ধূলিকণা এলো কোথা থেকে? তার উত্তরে বিজ্ঞানীরা অনেকগুলি কারণ দেখিয়েছে প্রথম ও প্রধান কারণ হলো, গ্যাসীয় অণুগুলি ঠাণ্ডা হয়ে যখন তরল বা কঠিনে রূপান্তরিত হয় তখন তারা ধূলিকণার মতই ব্যবহার করে। দ্বিতীয়তঃ যে সব নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা কম, তাদের দেহ থেকে যে রশ্মি বিকিরিত হয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে থাকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কয়লা কণা বা ঝুল। তৃতীয়তঃ নক্ষত্রের অভ্যন্তরে প্রবল উত্তাপ হেতু যে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে তা থেকে উৎপন্ন হয় বহু মৌলিক পদার্থ। সে গুলির অধিকাংশই আবার গঠন করে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের অণু। চতুর্থতঃ নক্ষত্রের মৃত্যুর প্রাক্কালে যে বিস্ফোরণ ঘটে তার ফলে নক্ষত্র পৃষ্টের মৌলিক ও যৌগিক পদার্থগুলি মহাকাশের আঙিনায় ভাঙিনায় ছড়িয়ে পড়ে এবং এক সময় তাপ হারিয়ে তরল ও কঠিন পদার্থ কণায় রূপান্তরিত হয়ে গ্যাস সমুদ্রের ধূলিকণার সৃষ্টি করে।

ধূলার মেঘ থেকে যখন নক্ষত্রের জন্ম হয় তখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মানুষ

যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেও দেখতে পায় না। তার একমাত্র কারণ, যে পুঞ্জীভূত গাঢ় মেঘ নক্ষত্রের জন্মদান করে সেই মেঘের আবরণ, ভেদ করার শক্তি মনুষ্যসৃষ্ট কোন যন্ত্রেরই নেই। তাছাড়া পৃথিবী থেকে একশ'—দেড়শ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যে সব নক্ষত্রের জন্ম হচ্ছে তাদের আলো এসে পৌঁছাতে একশ কিংবা দেড়শ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। মানুষের স্বল্প পরমায়ুতে তাই কখনও দেখা সম্ভব নয়। অতএব নক্ষত্ররে জন্মরহস্য সম্বন্ধে কল্পনা করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। আর এই ঘটনা চিরকালই রহস্যাবৃত থেকে যাবে। তাই বড় বিস্ময় ও বড় বৈচিত্র্যে ভরা আকাশের ঐ নক্ষত্রদের কাহিনী।

খালি চোখে আকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, কোথাও এককভাবে আবার কোথাও পাশাপাশি অবস্থান করছে দুটি তিনটি বা তারও বেশি এক একটি নক্ষত্রপুঞ্জ। আকাশে একক নক্ষত্রের সংখ্যা যথেষ্ট। তবে আপাতদৃষ্টিতে নক্ষত্রকে একক দেখলেও দূরবীনের দৃষ্টিতে ওদের অনেকেই এক একটি পুঞ্জ।

সাধরণতঃ আমরা নক্ষত্রদের আকাশে স্থির হয়ে অবস্থান করতে দেখি। আসলে ওরা কিন্তু স্থির নয়। এরাও নিজের মেরুকে অবলম্বন করে আবর্তন করছে এবং একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গতি ভয়ায়নক দ্রুত হলেও নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সীর চারদিকে তাকে ঘুরতে হয়। তার চারপাশে একটিবার পরিক্রমা করে আসতেই কয়েক কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ওদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে কম নয়। তাই আমাদের স্বল্প জীবনকালে তাদের স্থান পরিবর্তন বুঝতে পারি না। কিন্তু আজ যদি আকাশের একটি ফটো তুলে রেখে দিই তাহলে পাঁচ সাতশ বছর পরে গ্রহণ করা ফটোর সঙ্গে আজকের ফটোর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একক নক্ষত্র যুগল নক্ষত্র বা Binary stars, নক্ষত্রমণ্ডল বা Constellations, নক্ষত্র

গুচ্ছ বা Star clusters এবং স্পন্দনশীল নক্ষত্র বা cepheid yariadles।

একক নক্ষত্র আকাশে অনেক আছে। যেমন, আমাদের সূর্য একটি একক নক্ষত্র। যুগল নক্ষত্র বলতে কাছাকাছি অবস্থান করে এমন দুটি নক্ষত্র, এরা আপন আপন কক্ষ অবলম্বন করে ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে উভয়ে উভয়ের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাছাকাছি বলতে অবশ্য দু-দশ মাইল দুরে' পাঁচশ' মাইল দূরে নয়। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব হাজার হাজার মাইল এমন কি লক্ষ লক্ষ মাইলও হয়ে থাকে। পৃথিবী থেকে তারা অতিদূরে অবস্থান করছে বলে কাছাকাছি দেখায়। খালি চোখে অনেক সময় ওদের পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়ে না।

যুগল নক্ষত্রদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা কখনও ম্লান হয়ে পড়ে আবার কখনও বেশ উজ্জ্বল দেখায়। তার কারণ, আবর্তন করতে করতে যখন একটি অপরটির পশ্চাতে এসে যায় তখন উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় এবং ম্লান বলে মনে হয়। আবার ঘুরতে ঘুরতে যখন পশ্চাৎ থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসতে থাকে তখন উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে বাড়ে এবং নক্ষত্রটিকে তখন বড় দেখায়। আকাশে যুগল নক্ষত্রদের সংখ্যাই বেশি। আমাদের পরিচিত ধ্রুবতারা একটি যুগল নক্ষত্র।

আকাশের কোন কোন জায়গায় একসঙ্গে এমন কতকগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়—যাদের কতকগুলি কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে পৃথিবীর কোন বস্তু বা প্রাণীর রূপ গ্রহণ করে। সেই গুলিকে বলা হয় নক্ষত্র মণ্ডল। আমাদের পরিচিত "কালপুরুষ" একটি নক্ষত্র মণ্ডল। কাল্পনিক রেখা দিয়ে সেখানকার নক্ষত্রগুলিকে যোগ করলে মনে হবে, একজন মানুষ তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার কোমরে ঝোলনা আছে একটি তরোয়াল। অগ্রহায়ণ-পৌষে সন্ধ্যার সময় এই নক্ষত্রমণ্ডলকে পূর্বাকাশে দেখা যায়। সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি তারাও একটি নক্ষত্র মণ্ডল। তাদের কয়েকটি রেখা দিয়ে যোগ

করলে লাঙ্গলের ফলার মত মনে হবে। যদিও সাতটি তারার মধ্যে কয়েকটি যুগল নক্ষত্রও আছে।

দূরবীনের সাহায্যে দেখা যায়, আকাশের স্থানে স্থানে যেন অসংখ্য নক্ষত্র দলা পাকিয়ে আছে। ওদের মাঝখানে হয়ত এক একটা বড় নক্ষত্র আছে, আর তাকে ঘিরে রেখেছে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নক্ষত্র। খালি চোখে তেমন একটা ধরা পড়ে না। জোতির্বিজ্ঞানীরা ওদেরই নাম দিয়েছেন এক একটি নক্ষত্র পুঞ্জ—যা শত শত আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত এক একটি নক্ষত্রজগৎ বা নীহারিকা লোক ছাড়া আর কিছুই নয়। পৃথিবী থেকে ওদের সঠিক খবর সংগ্রহ করা যায় না। অনেকে মনে করেন, বিশ্বসৃষ্টির আদিতে ওদের জন্ম হয়েছিল।

আকাশে আরও কিছু কিছু নক্ষত্রকে দেখা যায়, যারা যুগল নক্ষত্র নয় অথচ উজ্জ্বলতার পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা ওদেরই স্পন্দনশীল নক্ষত্র বা সেফাইড তারা নামে অভিহিত করেছেন। কারণও একটা খাড়া করেছেন তাঁরা। তাঁদের অনুমান, মহাকর্ষ বলের জন্য কোন কোন নক্ষত্র মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। যখন সঙ্কুচিত হয় তখনই তার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা বেড়ে উঠে এবং উজ্বল দেখায়। অপরদিকে তার আয়তন বেড়ে উঠে এবং আয়তন বেড়ে গেলেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। উজ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধির জন্যই ওরা স্পন্দনশীল তারা।

আগেই বলা হয়েছে, আজও নক্ষত্র সৃষ্টি অব্যাহত আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, প্রাচীন কালের তুলনায় এখন কিন্তু নক্ষত্রসৃষ্টি কম হচ্ছে। অপরদিকে প্রাচীনকালে যেমন লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের বর্ষণ হতো এখন তেমনটিও হচ্ছে না। বর্ষণ হয় মাত্র কয়েক'শ পর্যন্ত। তার কারণ হিসাবে ফ্রেড হয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আগে যেমন প্রকাণ্ড গ্যাসীয় মেঘের সৃষ্টি হতো এখন তেমনটি হতে পারছে না। এরও কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা। বলেছেন ক্রমাগত নক্ষত্রজগৎ সৃষ্টি হওয়ার ফলে মহাকাশে গ্যাসের পরিমাণ কমে আসছে ধীরে ধীরে। আবার যে সব নক্ষত্র এখন সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারছে

না। পাশাপাশি বড় বড় নক্ষত্রগুলো আকর্ষণের আওতায় পেয়ে অনেককে গ্রাস করে নিজের কলেবর বাড়িয়ে নিচ্ছে।

এখন প্রশ্ন, আমরা সব নক্ষত্রকে দেখছি ওরা কি অমর? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অমর বলতে কোন কিছুই নেই। তারকার জন্ম যখন আছে তখন তার মৃত্যু একদিন অবশ্যই হবে। কিন্তু তাদের মৃত্যু কেমন করে আসে?

যে কোন নক্ষত্রপৃষ্ঠে হাইড্রোজেন গ্যাসেরই প্রাধান্য। ওদের ভয়ঙ্কর আকর্ষণ বলের জন্য সেই হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার সব সময় যেন জমাট বেঁধে আছে। নক্ষত্রদের আয়তন আবার খুব কম নয়। পৃথিবী অপেক্ষা তের লক্ষ গুণ বড় যে আমাদের সূর্য—তার চেয়েও হাজার হাজারগুণে বড় নক্ষত্র আছে। অবশ্য ছোট নক্ষত্র যে নেই এমন নয়। তবে যার আয়তন যত বেশি তার হাইড্রোজেনের পরিমাণও তত অধিক। নক্ষত্রপৃষ্ঠে তাপমাত্রাও প্রচণ্ড। তাই সেখানকার হইড্রোজেন এত তাপে নিজেদের আবিকৃত রাখতে পারেনা। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় সব সময় হাইড্রোজেন গ্যালগুলো হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। জন্ম মুহূর্তে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাসীয় মেঘ থেকে শোষণ করে নিজের কলেবরটা বাড়িয়ে ফেলেছিল সেই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে পারমাণবিক বিক্রিয়া এবং সেই বিক্রিয়ার ফলেই অবিরত উৎপন্ন হচ্ছে প্রচণ্ড তেজ। সেই তেজের অতি সামান্য অংশ ছুটে যাচ্ছে মহাকাশের বুক চিরে।

খরচ হলেই জমা ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যায়। কলসী জল থেকে বিন্দু বিন্দু করে খরচ করলেও যেমন একদিন কলসী শূন্য হয়ে পড়ে ঠিক তেমনই নক্ষত্রের হাইড্রোজেন ভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন নক্ষত্রের অবস্থাটা কেমন দাঁড়বে?

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখছেন, নক্ষত্রপৃষ্ঠে হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার মাত্র এক চতুর্থাংশ খরচ হয়ে গেলেই তার আয়তনটা বাড়তে আরম্ভ করবে। তারপর হাইড্রোজেন যত কমবে ততই আয়তন যাবে বেড়ে এবং ঘনত্বও ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। সেই সঙ্গে কমবে নক্ষত্রপৃষ্ঠের

তাপমাত্রাও। অবশেষে নক্ষত্রটির বর্ণ হয়ে উঠবে ঘোরতর লাল। তখনই তার মৃত্যুকাল আসন্ন বলে গণ্য করা হয়।

নক্ষত্রদের সবার পরমাণু কিন্তু সমান নয়। যারা তার হাইড্রোজেন ভাণ্ডারকে ধীরে ধীরে খরচ করে তাদের জীবন্কাল সুদীর্ঘ। তবে সবাই মিতব্যয়ী নয়। এমন অনেকে আছে, যারা হাইড্রোজেনকে বেশি মাত্রায় খরচ করে ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চায়। যেন পাশাপাশি নক্ষত্রের উপর টেক্কা দিয়ে জাহির করতে চায় নিজের পরাক্রম। অমিতব্যয়িতার ফল তাদের হাতে নাতে পেতে হয়। সামান্য দু-এক কোটি বছরের মধ্যে বরণ করতে হয় মৃতু কে।

যারা মিতব্যয়ী-অর্থাৎ যারা হাইড্রোজেনকে ধীরে ধীরে খরচ করে তারা আকারে ছোট, পৃষ্ঠদেশের তাপমাত্রা কম এবং পরমায়ুও এক হাজার কোটি থেকে দু' হাজার কোটি বছর পর্যন্ত। তবে যে কোন নক্ষত্র হোক না কেন, ওদের প্রত্যেকের মৃত্যুদৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর। বৃহদায়তন নক্ষত্রদের যখন হাইড্রোজেন ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায় তখন তার আয়তন বেড়ে যায় অনেকগুণে। ফলে তার তেজ যায় কমে। কিন্তু পূর্ণ তেজ বজায় রাখার জন্য পৃষ্ঠদেশকে ধসিয়ে আনে কেন্দ্রের দিকে। তখন পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত হয়ে পড়ার ফলে পুনরায় ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? ধস নামার ফলে নক্ষত্রের আকার ছোট হয়ে যায় বলে পূর্বের তুলনায় আকর্ষণ বেগ প্রবল হয়। সেই সঙ্গে পৃষ্ঠদেশ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ড। যেন সাঁড়াশি দিয়ে তার পিঠের মাংসকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এক একটি গোলার আয়তন কিন্তু খুব কম নয়। কোন কোনটির আয়তন পৃথিবীর প্রায় সমতুল। এই অবস্থায়ও তার ঔজ্জ্বল্য বেড়ে উঠে। কারণ কেন্দ্রভাগ তখন সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এই ধরণের তারাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাম দিয়ে থাকেন নবতারা বা "নোভা"। তাঁরা প্রতিবছর আকাশে বেশ কয়েকটি নবতারাকে দেখতে পান।

অপেক্ষাকৃত ছোট নক্ষত্রদের ক্ষেত্রে বস্তুপিণ্ডগুলি বহির্বিশ্বে ছুটে বেরিয়ে যায় না। তবে আয়তন বাড়ে এবং ধসও নামে। অবশেষে আভ্যন্তরীণ

তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। তখন সেই প্রচণ্ড তাপে হিলিয়াম অনুগুলি ভারী মৌলিক পদার্থ সমূহ গঠন করে। তারপরেই ঘটে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মূল নক্ষত্রটির একটা বড় অংশ অবশ্য তখনও অবশিষ্ট থাকে। বলা বাহুল্য তখন তার আয়তন পূর্বের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে যায়। সেইজন্য তার আকর্ষণ বল হয় প্রবলতর। ঘনত্বও বেড়ে উঠে অবিশ্বাস্যভাবে। ফলে সঙ্কোচন আরম্ভ হয় এবং আয়তনে হয়ে যায় অনেক ছোট। গাত্রবর্ণ হয় বেশ উজ্জ্বল। এই অবস্থায় তাকে বলা হয় "সুপার নোভা" বা অতি উজ্জ্বল নবতারা।

নবতারার আকারে বেশি দিন থাকতে পারে না নক্ষত্র। গাত্রবর্ণ ক্রমশ নীল হতে হতে একেবারে সাদা হয়ে যায়। নক্ষত্রের এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলেন white dwarf বা শ্বেত বামন। শ্বেত বামনকেও বিজ্ঞানীরা প্রতিবছর আকাশের দেখে থাকেন। পরিশেষে একদিন যখন ওরা নিভে যায় তখন আর দেখা যায় না। তারা তখন তার অবশিষ্ট দেহটাকে নিয়ে অন্ধকারে প্রেতের মত মহাকাশ পরিক্রমা করতে থাকে।

গ্রহদের জন্মকথা

গ্রহদের জন্ম সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরাতন মতবাদ হলো স্যার জেম্‌স জীনস্‌ এর মতবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী এককালে ভ্রাম্যমান এক বিরাট নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে সূর্যের সন্নিকটবর্তী হয়। তার আকর্ষণ বল ছিল সূর্যের চেয়ে প্রবল। যখন সেটি ঘুরতে ঘুরতে পুনরায় দূরে সরে গেল তখনই সূর্য দেহের একটি বিরাট অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারল না। সূর্যের আকর্ষণের আওতায় থেকে গেল কালক্রমে বিছিন্ন অংশটি কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। মহাকর্ষ

বলের প্রভাবে ছোট খণ্ডগুলি বড়দের চারপাশে ঘুরতে লাগালো আর বড়রা পরিভ্রমণ করতে লাগলো সুর্যের চারদিকে। সেই বিচ্ছিন্ন অংসগুলিই গ্রহ এবং উপগ্রহ।

জীন্‌স এর উপরোক্ত মতবাদ বিজ্ঞানীরা প্রথম মেনে নিলেও পরের দিকে মানতে পারলেন না। তার প্রধান কারণ, গ্রহরা যদি সুর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হয় তাহলে সূর্য দেহ যে উপাদানে গঠিত পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের গঠন উপাদানও একই হবে। কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা জানা গেল সব গ্রহের উপাদান সমান নয়। কোন কোন গ্রহে লৌহশিলা বেশি, কোন কোন গ্রহে জল ও অ্যানোনিয়ার প্রাধান্য, আবার সূর্যের দূরতম গ্রহগুলিতে মিথেন গ্যাসের প্রাচুর্য। তা ছাড়া যে সূর্য থেকে গ্রহদের সৃষ্টি হয়েছে সেই সূর্যের আলোককে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, সূর্যদেহে পার্থিব বস্তুর পরিমাণ অতি সামান্য। সূর্যদেহের শতকরা প্রায় নিরানব্বুই ভাগ হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। বাকী মাত্র এক ভাগ হচ্ছে পার্থিব বস্তুকণা। তাই জেম্‌স জীন্‌স এর মতবাদ হলো পরিত্যক্ত। বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভাবতে সুরু করলেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন্‌ উইৎসেকার এক নতুন মতবাদ প্রচার করলেন। তাঁর মতে, গ্যাস ও ধূলির মেঘের মধ্যে যখন সূর্যের সৃষ্টি হয়েছিল তখন ধূলিকণার একটা বিরাট অংশ সূর্যের বাহিরে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছিল। প্রদক্ষিণরত ধূলিকণার ভর ছিল বর্তমান পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রদের ভরের প্রায় শতগুণ। তাতে হাইড্রোজেন হিলিয়াম যেমন ছিল, তেমনই ছিল পার্থিব বস্তুকণার মেঘই কালক্রমে শীতল হয়ে গ্রহ উপগ্রহদের সৃষ্টি করেছে।

উইৎসেকারের মতবাদটি বিজ্ঞান সম্মত হলেও একটা বড় অসঙ্গতি বিজ্ঞানীদরে চোখে ধরা পড়লো। তাঁরা দেখলেন, উইৎসেকারের মতবাদ অভ্রান্ত হলে আকাশে মত সূর্য আছে প্রত্যেকেরই গ্রহজগৎ থাকবার কথা। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বিজ্ঞানীরা আমাদের নক্ষত্রজগতে একমাত্র সূর্য ছাড়া অপর নক্ষত্রের গ্রহের সন্ধান পেলেন না। তাছাড়া

তাঁদের মনে প্রশ্ন এলো, সেই অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা কেমন করেই বা গঠন করলো এত বড় বড় গ্রহ উপগ্রহদের দেহকে?

উইৎসেকারের মতবাদকে বিজ্ঞানীরা তাই সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে পারলেন না। কেবল প্রথম অংশটিকেই মেনে নিলেন। অর্থাৎ স্বীকার করলেন, মহাশূন্যের গ্যাসীয় মেঘ থেকেই গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি তবে অন্য ভাবে। কালে কালে উইৎসেকারের মতবাদকে ভিত্তি করে দুটি মতবাদের জন্ম হলো। একটির নাম উল্কা মতবাদ এবং অপরটির নাম বলয় মতবাদ। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা এই দুই মতবাদকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

উল্কা মতবাদ অনুসারে ধূলি মিশ্রিত গ্যাস সমুদ্রের মাঝে যেদিন সূর্যের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন তার চারপাশে বহুদূর অবধি বিস্তৃত ছিল আরও প্রচুর গ্যাস ও ধূলিকণা। সূর্যের জন্মলাভের পর মহাকর্ষ শক্তির নিয়মে গ্যাস ও ধূলিকণাগুলি সুরু করলে সূর্য পরিক্রমা তাদের মধ্যে ছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ, রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়া, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি যৌগিক গ্যাস এবং ধাতু, ধাতব অক্সাইড ও সিলিকেট।

দীর্ঘকাল পরে তাপ হারাতে হারাতে গ্যাসীয় পদার্থগুলি—যারা বেশি তাপমাত্রায় কঠিন ও তরল অবস্থায় থাকে কেবল সেইগুলিই ধীরে ধীরে কঠিন ও তরলের রূপান্তরিত হয়ে ছোট ছোট কণার আকারে উপবৃত্তকার পথে সূর্যকে পরিভ্রমণ করতে আরম্ভ করলো। অকল্পনীয় ছিল তাদের সংখ্যা। মৌচাককে ঘিরে মৌমাছিরা যেমন ঘুরে বেড়ায় অনেকটা সেইভাবেই তারা ঘুরছিল। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলোর একে অপরের সঙ্গে হলো সংঘর্ষ। গায়ে গায়ে আটকে গিয়ে সৃষ্টি হল বস্তুখণ্ডের। বস্তুখণ্ডগুলি এইভাবে বড় হতে হতে একদিন লাভ করলো আকর্ষণ বল। এর ফলে বড়গুলোরই লাভ হলো। তারা আশে পাশে ছোট ছোট টুকরাগুলিকে টেনে নিয়ে নিজের কলেবরখানা বাড়িয়ে ফেললো। আর

গ্যাসীয় মেঘের মধ্যে যেগুলি ঘনীভূত হতে পারলো না তারা দূরে সরে গেল কালক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে সেগুলিও ঘনীভূত হয়ে পূর্বের মত সৃষ্টি করলো বস্তুপিণ্ড। উল্কার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার দ্বারা গ্রহদের সৃষ্টি হয়েছে বলে যাঁরা মত প্রকাশ করেছেন তাঁদের মতবাদকে বলা হয় উল্কামতবাদ।

বলয় মতবাদের যাঁরা সমর্থক তাঁরা মনে করেন, সূর্য যেদিন গ্যাসীয় মেঘ থেকে জন্ম নিয়েছিল, সেদিন তার অভ্যন্তর ভাগ ছিল ভয়ানক অস্থির। সেই কারণে তার আবর্তন বেগ ছিল অত্যন্ত প্রবল। মেরুদেশ অবলম্বন করে সূর্যকে আবর্তন করতে করতে হচ্ছিল বলে কালক্রমে সূর্যের দুটি মেরুই ভেতরের দিকে ঢুকে যায় এবং পৃষ্ঠদেশ স্ফীত হয়ে উঠে। তারপর একদিন স্ফীত অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে সূর্যের চারদিকে সৃষ্টি করে বিশাল আয়তনের একটি বলয়। অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে প্রাথমিক অবস্থায় সূর্যের আয়তন এত বিশাল এবং আবর্তনের বেগ এত প্রবল ছিল যে তার দেহ থেকে বলয় আকারে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব ছিল না।

প্রথম প্রথম বলয়টা সূর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবর্তন করছিল। কিন্তু সেটি বলয় ছিল বলে ধীরে ধীরে তার গতিটা মন্থর হয়ে পড়লো। অপর-দিকে সূর্য লাভ করেছিল চৌম্বক শক্তি। বলয়কে নিয়ে আবর্তন করতে গিয়ে তারও গতি হলো মন্থর। এই সুযোগে বলয়টা একটু একটু করে সরে যেতে লাগলো দূর থেকে দূরান্তরে।

সূর্য থেকে বলয়ের দূরত্ব যত বাড়ল ততই সে তাপ হারাতে আরম্ভ করলো। তখন ধীরে ধীরে বলয়স্থিত উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের বস্তুকণাগুলো ঘনীভূত হয়ে তরল ও কঠিনে রূপান্তরিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো। আরও দূরে এগিয়ে গেল বলয়। সূর্যের কাছ থেকে দূরত্ব অত্যাধিক হয়ে পড়ায় অত্যন্ত ঠাণ্ডায় নিম্ন স্ফুটনাঙ্কের পদার্থগুলো ঘনীভূত হলো। এইভাবে বস্তুকণা ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চললো দূরে—আরও দূরে। তবুও সব গ্যাস ঘনীভূত

হতে পারল না। যেগুলি অবশিষ্ট থাকল, সেগুলি সৌরজগতের বাহিরে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

কালক্রমে উল্কামতবাদে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক সেই ভাবেই ক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে সৃষ্টি হলো বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ড। সূর্যের নিকটবর্তী অঞ্চলে উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের পদার্থ, যেমন লোহা, অন্যান্য ধাতু এবং ধাতব অক্সাইড ও সিলিকেট প্রভৃতি ঘনীভূত হয়েছিল। তাই বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ও কয়েকটি গ্রহাণুর উপাদান ভারি বস্তুকণা। তাই সৌরজগতের এই অঞ্চলটাকে বলা হয় লৌহশিলা অঞ্চল। অপরদিকে এদের পরিমাণ বলয়ে কম ছিল বলে লৌহশিলা অঞ্চলের গ্রহগুলি ছোট এবং উপগ্রহের সংখ্যাও কম। আবার বুধ এবং মঙ্গল লৌহশিলা অঞ্চলের দু-প্রান্তে অবস্থান করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় বেশি বস্তুকণা উদরসাৎ করতে পারেনি। তাই ওরা আয়তনে ছোট। কিন্তু শুক্র ও পৃথিবী মাঝখানে অবস্থান করার জন্য চতুর্দিক থেকে বস্তুকণাকে সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল সেই কারণে ওদের আয়তন অপেক্ষাকৃত বড়। বিজ্ঞানীরা আরও অনুমান করেন, লৌহশিলা অঞ্চলে ধাতু, ধাতব অক্সাইড প্রভৃতি যেমন ঘনীভূত হয়েছিল তেমনই কিছু ভারি হাইড্রোকার্বনও ঘনীভূত হয়েছিল। ওরা সাধারণতঃ তেলতেলে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার সঙ্গে যখন সংঘর্ষ হয়েছিল তখন ঐ হাইড্রোকার্বনই গায়ে গায়ে আটকে থাকতে সাহায্য করেছিল।

গ্যাসঙ্কুবলয়টি লৌহশিলা অঞ্চল ত্যাগ করার পর প্রধানতঃ তেল ও জল ঘনীভূত হয়েছিল। লৌহ ও অন্যান্য ধাতু কিংবা ধাতব অক্সাইড আদৌ যে ছিলনা এমন নয়। তবে পরিমাণে নিতান্তই ছিল কম। আবার বলয়ে জল ও অ্যামোনিয়া সর্বাপেক্ষা বেশি থাকায় লৌহশিলা, জল ও অ্যামোনিয়ার দ্বারা গঠিত হল কয়েকটি গ্রহাণু এবং বৃহৎ দুটি গ্রহ—বৃহস্পতি ও শনি। ওদের উপগ্রহের সংখ্যাও হলো প্রচুর। জল ও অ্যামোনিয়া দিয়ে গঠিত বলে এই অঞ্চলটাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন "জল-অ্যামোনিয়া" অঞ্চল।

অতঃপর বলয় থেকে ঘনীভূত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল হালকা হাইড্রো-

কার্বন এবং নিয়ন গ্যাস। ইউরেনাস, নেপচুন প্লুটো—এই তিনটি গ্রহেই হাইড্রোকার্বন তথা মিথেন গ্যাসের প্রাচুর্য। তাই এই অঞ্চলটি মিথেন অঞ্চল নামে খ্যাত। বাদ বাকি গ্যাস হাইড্রোজেন ঘনীভূত হতে পারেনি। আবার গ্রহগুলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি লাভ করার পূর্ব্বেই হাইড্রোজেন গ্যাস দূরে সরে গেছিল। তাই হাইড্রোজেনকে বিশেষ কেউ বন্দী করতে পারেনি। সে অনন্ত মহাশূন্যেই মিশে গেছে।

এতগুলি গ্রহের মধ্যে একমাত্র ভাগ্যবতী পৃথিবীই। কারণ, লৌহশিলা অঞ্চলে অবস্থান করার জন্য সে লাভ করেছে মূল্যবান ধাতু ও পাথর। তাই উর্বর তার মৃত্তিকা—জীব ও উদ্ভিদ বাসের অত্যন্ত উপযোগী। অপরদিকে ক্ষুদ্র বস্তুকণা থেকে সুবৃহৎ এক গ্রহে পরিণত হতে যে দীর্ঘ সময় লেগেছিল তাতে গ্যাস বলয় অনেক দূরে সরে গেছিল কিন্তু পৃথিবীর আকাশকে সে তখনও পরিত্যাগ করেনি। তাই বুধ ও শুক্রের আবহমণ্ডল জলীয় বাষ্প লাভ করতে পারেনি। কিন্তু পৃথিবী পেয়েছিল কিছু। তাই সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর বুকে বিচিত্র জীব ও উদ্ভিদ জগৎ। মঙ্গল অবশ্য সেদিন জলীয়-বাষ্পকে লাভ করলেও তার ক্ষীণ আকর্ষণবল ধরে রাখতে পারেনি। বৃহস্পতি ও শনি আয়তনে বিরাট বলে তার আকর্ষণবলও অতি ভয়ঙ্কর। সেই কারণে উভয়ে ধরে রেখেছে বিস্তৃত এক আবহামণ্ডলকে। কিন্তু সেই আবহামণ্ডলে জলীয় বাষ্প নেই। অত্যধিক ঠাণ্ডার জন্য বরফের আকারে জমা হয়ে আছে ওদের পৃষ্ঠদেশে।

গ্রহদের উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ঐ উল্কা মতবাদ অনুযায়ী। বড় বড় পিণ্ডগুলির প্রত্যেকেই লাভ করেছিল আকর্ষণ শক্তি। অত্যধিক দূরত্ববশতঃ পিণ্ডগুলির সঙ্গে ছোট পিণ্ডগুলি মিশে যেতে পারল না। আবার বড় বড় পিণ্ডগুলির আকর্ষণকে তুচ্ছ করে স্বাধীন ভাবে সূর্যের চারদিকেও ঘুরতে পারল না। ঘুরতে হল ঐ বড় পিণ্ড বা গ্রহের চতুর্দিকে।

বলয় মতবাদ এবং উল্কা মতবাদ দুটি মতবাদই যথেষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত ও যুক্তি নির্ভর। তবুও দুই মতবাদের কোনটিই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে না। যতদিন অপর কোন যুক্তি নির্ভর তথ্য আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন উপরোক্ত দুই মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ফেজ কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ

এক ছিলেন কিশোর। নাম তাঁর ফ্রিট্স জার্নিক। আমষ্টারডাম শহরের একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। ভারি বুদ্ধিমান ছিলেন জার্নিক। স্বভাবটাও ছিল খুব সুন্দর। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে কক্ষনো ঝগড়াঝাটি করতেন না। শ্রদ্ধাবান ছিলেন শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি।

সেই ছোটবেলা থেকে জার্নিকের অজানাকে জানার কৌতূহল ছিল প্রবল। একদিন স্কুল যাওয়ার পথে দেখলেন, এক ফেরিওয়ালা পেতলের তৈরী খেলনা দূরবীন বিক্রী করছে। বালক জার্নিক দূরবীন একটা হাতে নিয়ে বেশ ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ভারি সুন্দর এই খেলনাতো ? চোখের সামনে ধরলে দূরের বস্তুকে বেশ বড় দেখাচ্ছে।

টিফিনের জন্যে পয়সা দিয়েছিলেন বাবা। ভাবলেন জার্নিক, একদিন স্কুলে না খেলে এমন কিছু অসুবিধা হবে না। তার চেয়ে এই খেলনা দূরবীনই একটা কেনা যাক বেশ মজা হবে তাহলে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পয়সাগুলো বার করে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিলেন একটা দূরবীন।

স্কুল ছুটির পর বাড়ীতে এসে দূরবীন নিয়েই মেতে উঠলেন জার্নিক। যন্ত্রটির সাহায্যে দূরের বস্তুর দিকে কেবল তাকিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, ওর ভেতরটায় কী রহস্য লুকিয়ে আছে তাই জানার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর। ভাবলেন, একবার খুলেই দেখা যাক।

যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু খুলে ফেলতেই তাঁর চক্ষুস্থির। পেতলের নলের ভেতর কেবলমাত্র হু'খানা গোল কাচের চাকতি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঐ কাচগুলোর একটু বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ল। ভাবলেন, এমন কাচের চাকতি পেলে তিনিও দূরবীন তৈরী করতে পারেন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এই ধরণের কাচের চাকতি ?

অনেক চিন্তা করে মোটা মোটা কাছের টুকরাকে ঘষে ঘষে দূরবীনের কাচের মত বানাতে সচেষ্টা হলেন, কিন্তু পারলেন না সেদিন। তবে লেন্স ও আলোর সম্বন্ধে ভালভাবে জানার দুর্বার এক কৌতূহল অনুভব করলেন মনে মনে। ভাবলেন, বড় হয়ে তিনি এই দুটি বিষয়ে গবেষণা করবেন।

কতদিন কেটে গেল। ফ্রিট্স জার্নিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করলেন পদার্থবিদ্যার উপর সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি। কিন্তু ভুললেন না সেই ছেলেবেলায় দেখা দূরবীনের কথা। একদিন সত্যসত্যিই গবেষণা আরম্ভ করলেন লেন্স ও আলোককে নিয়ে। তৈরী করলেন উত্তল অবতল প্রভৃতি কত ধরণের লেন্স। রাতদিন চলল কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা। শেষে তৈরী করলেন এক অদ্ভুত রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্র—যার কার্যকরী ক্ষমতা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা অনেক—অনেকগুনে বেশি। সেই বিশেষ ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির নাম রাখলেন "ফেজ কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ"।

ফেজ কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ আজকে সকল রকমের সূক্ষ্ম গবেষণায় অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে তন্তুর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা এবং জীবনের মূল রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা করা। তাই জীবন বিজ্ঞান এত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

যন্ত্রটির বিস্ময়কর কার্যকারিতা দেখে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্নিককে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে।

কোথায় সেই খেলনা দূরবীন আর কোথায় ফেজ কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ? অজানাকে জানার কৌতূহল, অধ্যবসায় এবং উচ্চাকাঙ্খা ছিল বলে জার্নিক এত বড় হতে পেরেছিলেন।

শনির বলয়, গ্রহানুপুঞ্জ ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো

প্রাচীন কালেই মানুষ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই পাঁচটি গ্রহকে আকাশে দেখতে পেয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল খালি, চোখে এদের সবাইকে দেখা যায় বলে। কিন্তু শনিগ্রহের বলয়ের কথা কেউ জানতো না। বলয় ধরা পড়ল গ্যালিলিও দূরবীন তৈরী করার পর থেকেই।

আকাশে শনিগ্রহের স্বাতন্ত্র ওর বলয়ের জন্যই। বহুদিন থেকে এই বলয় ভাবিয়ে এসেছিল বিজ্ঞানীদের। দূরবীনের সাহায্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, শনির নিরক্ষবৃত্তের চারদিক বেষ্টন করে আছে পর পর নীচ থেকে উপরের দিকে তিনটি বলয়। বলয়গুলির উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলি সবসময় অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করছে বলয়ের মধ্যে। বোধ হয় এই কারণেই শনি মানুষের মনে এত ভীতির সঞ্চার করে এসেছিল।

দীর্ঘদীন ধরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেও শনির বলয়ের মীমাংসা করতে পারেন নি। শেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে "রচি" নামে এক বিজ্ঞানী এই রহস্যের সমাধান করেছেন এবং তাঁর সেই মতবাদকে মেনে নিয়েছেন সমস্ত বিজ্ঞানীরা।

রচি প্রদত্ত তত্ব অনুযায়ী শনির বর্তমান উপগ্রহের সংখ্যা ন'টি হলেও পূর্বে উপগ্রহের সংখ্যা ছিল দশটি। নিকটতম উপগ্রহের সংখ্যা ছিল দশটি। নিকটতম উপগ্রহটি শনির কাছাকাছি এসে পড়ায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে বলয়ের সৃষ্টি করেছে এবং আজও সেই টুকরোগুলো সমানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলয়ের আকারে।

উপগ্রহটি ভেঙ্গে পড়ার কারণও নির্দেশ করেছেন রচি। বলেছেন, যদি কোন গ্রহের উপগ্রহ তার ব্যাসার্ধের মাত্র ২'৪৫ গুণ দূরে এসে পড়ে তাহলে উপগ্রহটি ভেঙ্গে পড়বেই। তবে এই ব্যাপারটি সম্ভব কেবলমাত্র

বড় বড় গ্রহদের ক্ষেত্রে। পৃথিবী প্রভৃতি ছোট ছোট গ্রহ—যাদের আকর্ষণ বল কম তাদের ক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়। এই একই কারণে বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের কাল আসন্ন। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সেই উপগ্রহটিও বৃহস্পতিপৃষ্ঠে ভেঙ্গে পড়বে এবং শনির মত তারও সৃষ্টি হবে বলয়।

ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। খালি চোখে ওদের দেখা যায় না। তাই ওদের আবিষ্কার করা হয়েছে অনেক পরে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরেনাস, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপচুন এবং প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এদের আবিষ্কারের পেছনে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বোড এবং তাঁর সহকর্মী টিসিয়াস কর্তৃক প্রদত্ত গ্রহদের দূরত্বসূচক এক বিশেষ ধরণের গণনা। এই গননার ফলেও আবিষ্কৃত হয়েছে মঙ্গল ও বৃহস্পতি মধ্যে অবস্থানকারী গ্রহাণুপুঞ্জ।

এককালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে বিরাট ফাঁকা জায়গা দেখে অবাক হয়ে গেছিলেন। পরে বোড এবং টিসিয়াসের সূত্র হাতে পেয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন, এই দুই গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্ভব। তখন তাঁরা সবাই সচেষ্ট হলেন ফাঁকা জায়গাটায় কোন গ্রহ অবস্থান করছে কিনা তা আবিষ্কার করার জন্য। শেষে সিসিলির প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াজী আবিষ্কার করলেন গ্রহদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুপিণ্ডকে। যার আকৃতি ঠিক ঠিক গ্রহের মত না হলেও আচরণে গ্রহের মতই। শিয়াজী রোমক দেবতার নামানুসারে ক্ষুদ্র গ্রহটির নামকরণ করলেন "সিরিস"। সিরিসের ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল।

পিয়াজীর আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল। অনেকেই চালালেন অনুসন্ধান কার্য। একে একে আবিষ্কৃত হল ৩০০ মাইল ব্যাসের বস্তুপিণ্ড থেকে মাত্র একমাইল ব্যাসের অসংখ্য বস্তুপিণ্ড। এদের ছাড়াও বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, নগন্য ব্যাসের বস্তুপিণ্ডে সংখ্যাও কিছু কম নয়।

লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি ওরা প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে। তাদের আকৃতি কোনটি গোল, কোনটি বেলনাকার, কোনটি মোচার খোলের মত, কোনটি পিরামিডের আকৃতি আকৃতির বিশিষ্ট, আবার কোনটির আকৃতি শিল নোড়ার মত। অধিকাংশই চরকির মত পাক খেতে খেতে ঘুরছে তাদের কক্ষপথে। একত্রে ওদের সবাইকে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। বড়গুলি নামকরণ করেছেন। বিজ্ঞানীরা। তাদের নাম হল সিরিস, ঈরস, ভেষ্টা, পেলাস প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যস্থিত গ্রহটি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অথবা সেই সুদূর অতীতে গ্রহদের উৎপত্তির সময় এখানকার বস্তুপিণ্ডগুলি একত্রিত হয়ে বড় গ্রহের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি।

এবার আসা যাক সূর্যের দূরের গ্রহগুলির কথায়। বলা বাহুল্য এগুলিও আবিস্কৃত হয়েছে বোড ও টিসিয়াসের সূত্রকে অনুসরণ করে। সূত্র প্রকাশের পর বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, শনির পরেও গ্রহ থাকা সম্ভব। অনেকেই এগিয়ে এলেন গবেষনা করতে। কিন্তু আবিষ্কার করা সম্ভব হল না কারুর পক্ষে। কিন্তু প্রসিদ্ধ জ্যোর্তিবিজ্ঞানী হার্শেল এ বিষয়ে গবেষণা না করেই আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন ইউরেনাসকে।

হার্সেল তাঁর মানমন্দিরে বসে দৈনিক আকাশ পর্যবেক্ষন করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ হাতে তৈরী করেছিলেন একটি খুব শক্তিশালী দূরবীন। একদিন রাতে তিনি মিথুন রাশিকে পর্যবেক্ষন করার সময় দেখলেন, আকাশের গায়ে উঁকি দিচ্ছে অস্পষ্ট এক আলোর চাকতি। হার্শেল প্রথমে মনে করেছিলেন এটি একটি ধুমকেতু ছাড়া আর কিছুই নয়। শেষে অনেক গবেষণার পর বুঝতে পারলেন তিনি একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। এটি হল সূর্যের সপ্তম গ্রহ।

ইউরেনাস আবিষ্কারের পর আবার বিজ্ঞানীদের মধ্যে সুরু হল তোড়জোড়। সূর্য থেকে ইউরেনাসের দূরত্ব এবং গতি নির্ণয় করার জন্য আরম্ভ হল অঙ্ক কষা। এবার বিজ্ঞানীরা সত্যই বড় গোলমালে পড়লেন। আকাশে ইউরেনাসের গতির সঙ্গে গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা গতির

মধ্যে দেখা গেল বেশ একটু গরমিল। মহা ভাবনায় পড়লেন বিজ্ঞানীরা। গণিত তো আর মিছে কথা বলবে না?

বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে চিন্তা করতে বসলেন। পরে ঠিক করলেন গতির গরমিল হতে পারে—যদি অজ্ঞাত কোন গ্রহের আকর্ষণ ইউরেনাসের উপর পড়ে থাকে।

আবার তৎপর হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানীরা। কোথায় সেই অজ্ঞাত গ্রহ? যে কোন প্রকারে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে!

সুরু হল অঙ্ক কষা—অঙ্ক কষা—আর অঙ্ক কষা। অঙ্কের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন ইউরেনাস থেকে কতদূরে এবং আকাশের কোন অংশে এই গ্রহটির অবস্থান সম্ভব।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অ্যাডামসই প্রথম গণনা করে নতুন গ্রহটির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি নিজে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে তাঁর পরিচিত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে অনুসন্ধান করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম ছিল চ্যালিস। চ্যালিস সহজেই রাজি হলেন। কিন্তু তখন ইংলণ্ডের কোন মানমন্দিরে আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির ভাল নকসা না থাকায় গবেষণা চালাতে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হলেন তিনি। তখন বাধ্য হয়ে চ্যালিসকে কেম্ব্রিজ মানমন্দিরে গিয়ে আগে নকসা প্রস্তুত করতে হল।

অপরদিকে 'লেভেরিয়ে' নামে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যাডামসের মত অঙ্ক করে নতুন গ্রহটি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিও অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'গ'লকে। গাল কিন্তু বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই দূরবীন নিয়ে বসে গেলেন বার্লিন মানমন্দিরে। আকাশের নক্সা পেতেও অসুবিধা হল না তাঁর। কারণ বার্লিন মানমন্দিরে পূর্ব থেকে রক্ষিত ছিল নিখুঁত নক্সা। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের একদিন রাতে লেভেরিয়ে যে জায়গায় নতুন গ্রহটি থাকার সম্ভাবনার কথা নির্দেশ করেছিলেন ঠিক সেই জায়গায় নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে একটু বড় ম্লান আলোর চাকতির মত গ্রহটির সন্ধান লাভ করলেন গাল।

রোমে সমুদ্রের দেবতাকে বলা হয় নেপচুন। সদ্য আবিষ্কৃত এই গ্রহটি অন্ধকার মহাসমুদ্র সদৃশ মহাকাশে বিচরণ করছে বলে নাম রাখা হল নেপচুন।

সংবাদটা শ্রবণ করে ব্যথিত হয়েছিলেন অ্যাডাম্স ও চ্যালিস। কারণ লেভেরিয়ের মতই নির্ভুল ভাবে অঙ্ক কষে নির্দেশ দিয়েছিলেন অ্যাডামসও। অ্যাডামস অবশ্য সম্মানিত হয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য। কিন্তু বেচারা চ্যালিস। দীর্ঘদিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেও আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করতে পারলেন না।

সূর্য থেকে ২৭৯৩ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত নেপচুনকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখার উপায় নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর শীতল এই গ্রহটি। ভোরের আকাশে শুকতারাকে যতবড় দেখায় নেপচুন থেকে সূর্যকেও দেখা যায় তত বড়। অথচ গ্রহটি পৃথিবীর প্রায় চার গুণ বড়। একটা আবহ-মণ্ডলকেও বন্দী করে রেখেছে সে। কিন্তু আবহমণ্ডলের বেশীর ভাগই হচ্ছে মিথেন গ্যাস। দুটি উপগ্রহও আছে নেপচুনের। একটির নাম ট্রাইট্রন, অপরটির নাম নেরিড।

সূর্যের নবম গ্রহের নাম প্লুটো। নেপচুন আবিষ্কারের পরও বিজ্ঞানীদের অঙ্ক কষা সমানে চলতে লাগল। ধারণাটা এই, নেপচুনের পর গ্রহ থাকলেও থাকতে পারে। কতদিন কেটে গেল। শেষে উত্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল একদিন বুঝতে পারলেন, আবিষ্কৃত সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসাব করলেও ইউরেনাসের গতির গরমিল থেকে যাচ্ছে। অনেক চিন্তা করে ফ্ল্যাগষ্টাফ মানমন্দির থেকে তিনি ঘোষণা করলেন নেপচুনের পরও গ্রহ আছে। লাওয়েল কেবল ঘোষণা করে ক্ষান্ত হলেন না, নিজেই সচেষ্ট হলেন গ্রহটি আবিষ্কারের জন্য।

কেটে গেল সুদীর্ঘ আট বছর। লাওয়েলের গবেষণা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর! ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিক ভাবে পরলোক গমন করলেন তিনি। সুসম্পন্ন করতে পারলেন না নিজের কাজ।

লাওয়েল একা গবেষণা করতেন না। কয়েকজন সহকর্মীও তাঁর ছিল। মৃত্যুর পর সেই সহকর্মীরাই এগিয়ে এলেন হতুন গ্রহটির খোঁজে। এদিকে লাওয়েল যে মানমন্দিরে কাজ করতেন সেই মান মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু সেখানে কোন শক্তিশালী দূরবীন ছিল না। লাওয়েলের মৃত্যুর পর মানমন্দিরটির নামকরণ করা হল লাওয়েল মানমন্দির এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় তের বছর পরে সেখানে বসান হল একটি মহাশক্তিশালী দূরবীন। তরুণ গবেষক টমবাউ ঐ মানমন্দির থেকেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করলেন নতুন গ্রহ। এই গ্রহটি আবিষ্কারের পেছনে আছে দুজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব। একজন হলেন পার্সিভাল লাওয়েল এবং অপরজন টমবাউ। তাই দুই-বিজ্ঞানীর নামকে জড়িয়ে গ্রহটির নামকরণ করা হল Pluto (প্লুটো)। অন্য দিক দিয়েও প্লুটোর নামকরণের সার্থকতা আছে। গ্রীকপুরানের পাতাল পুরীর দেবতার নাম প্লুটো। ঘন তমসাচ্ছন্ন পাতাল পুরীতে নিঃশব্দে পদচারনা করেন প্লুটো। সূর্য থেকে বহুদূরে অর্থাৎ ৩৬৭ কোটি মাইল দূরে অন্ধকারচ্ছন্ন পথে ২৪৮ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে প্লুটোর নামানুসারে এই গ্রহটির নাম। এর আয়তন বেশ ছোট। বিজ্ঞানীরা এখনও গ্রহটির সমূহ তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি।

বিজ্ঞানীরা সূর্যের দশম গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ "যোসেফ ব্রাডি"ও এই মতের সমর্থক। তিনি অজানা এই গ্রহটির গতিপথ, দূরত্ব এবং আয়তন কেমন হবে সে সম্বন্ধেও আভাস দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, সূর্য থেকে ছশ' কোটি মাইল দূরে থেকে বিশাল আয়তনের এই গ্রহটি ছশ' বছরে একবার মাত্র সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। এর অবস্থান আমাদের সৌরজগতের একেবারেই প্রান্তদেশে। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ আজও দেখেনি সেই গ্রহটিকে।

বিজ্ঞানীদের গণনায় ভুল থাকে না। এই গণনার উপর ভিত্তি করেই আবিষ্কৃত হয়েছে নেপচুন এবং প্লুটো। তাই অজানা এই গ্রহাণুর অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। একদিন না একদিন আবিষ্কৃত হবে গ্রহটি।

ধূমকেতু, উল্কা ও প্রতিবস্তু

মহাকাশের এক অতি অদ্ভুত ধরণের বাসিন্দা ঐ ধূমকেতুরা। নিকষ কালো আকাশের গায়ে এক একসময় আকস্মিক ভাবে আগমন ঘটে এদের। পৃথিবীর মানুষ রহস্যভরা অদ্ভুত আকৃতির এই জ্যোতিষ্ককে দেখে বরাবর ভয় পেয়ে এসেছে। মানুষের ধারণা, ধূমকেতুর আকাশে আবির্ভাব ঘটলেই বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ঘটে। এখনও যে সেই ভয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে, এমন নয়। অন্যদিকে ঐ জ্যোতিষ্কটিকে দেখে পুলকিতও হয় পৃথিবীর মানুষ যারা কবি, যারা সাহিত্যিক, তাঁরা তাঁদের রচনায় টেনে এনেছে ধূমকেতুকে আর যারা বৈজ্ঞানিক তাঁদেরও গবেষণার বিষয় হয়েছে ধূমকেতু।

দীর্ঘদিন ধরে বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বর্তমানে উন্মোচিত হয়েছে জ্যোতিষ্কটির রহস্য। তাঁদেরই আবিষ্কারের ফলে আজ আমরা জানতে পেরেছি এদের আবাস কোথায়? কেমন করে এদের উৎপত্তি হয়েছে, আর কেন ওদের আকস্মিক ভাবে আগমন হয় এবং একদিন আকস্মিক ভাবেই বিদায় গ্রহণ করে?

বিজ্ঞানীদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, এরা আমাদেরই সৌর-জগতের বাসিন্দা। গ্রহদের মত সমূহ নিয়মকানুন ওরা সব সময় মেনে চলেনা। অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল ধরণের ওরা এবং প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

আমরা আকাশে কালে ভদ্রে যে সব ধূমকেতুকে দেখি, তাদের প্রধানতঃ তিনটি অংশ থাকে। প্রথম অংশ মুণ্ড, দ্বিতীয় অংশ মুণ্ডটিকে ঘিরে একটি বাহিরাবরণ, তৃতীয় অংশ একটি সুদীর্ঘ পুচ্ছ। ধূমকেতুর পুচ্ছটিকে ঘিরেই মানুষের মনে যত রকমের জল্পনা কল্পনা ও কুসংস্কার। আকাশের কোন জ্যোতিষ্কেরই এই ধরণের ঝাঁটার মত পুচ্ছ থাকে না।

আবার এই পুচ্ছটি এত বৃহৎ যে আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অপরদিকে পুচ্ছটি এমন পাতলা যে, তার ভেতর দিয়ে অতি ক্ষুদ্র তারাগুলোও অক্লেশে দেখা যায়।

খালি চোখে ধূমকেতুর কেন্দ্রস্থল বা মুণ্ডটি ভালভাবে দেখা না গেলেও এই অংশটি একটি তারার মত। এটি একটিমাত্র বস্তুপিণ্ড নিয়ে গঠিত নয়। ছোট বড় কোটি শিলাখণ্ড এবং মহাজাগতিক ধূলিকণা দিয়ে গঠিত এই মুণ্ড। শিলাখণ্ডের উপাদান পার্থিব বস্তুর মতই। সমস্ত ধূমকেতুর মুণ্ডের ব্যাস সমান নয়। সাধারণতঃ বিশ হাজার থেকে বিষ লক্ষ্য কিলোমিটার পর্যন্ত ওদের এক একটির ব্যাস হয়ে থাকে। তবে এর চেয়ে কম বা বেশি ব্যাসের ধূমকেতুরও পরিচয় পেয়েছেন।

মুণ্ডটিকে ঘিরে রেখেছে যে গ্যাসীয় আবরণ, সেই আবরণটিকে বলা হয় "কোমা"। কোমা থেকেই "কমেট" নামের উৎপত্তি। "কমেট" শব্দের অর্থ কেশযুক্ত তারা। আমরা বলি ধূমকেতু। কোমার উপাদান সাধারণতঃ জলীয়বাষ্প, মিথেন গ্যাস ও অ্যামোনিয়া। গ্যাসীয় আবরণটির গভীরতা আবার সব ধূমকেতুর সমান নয়। তবে ঐ আবরণটির জন্যই ওদের চেনা যায়।

ধূমকেতুর তৃতীয় অংশ তার সুদীর্ঘ পুচ্ছ। অথচ ওরা যখন সূর্যের কাছে আসে তখনইউৎপত্তি হয় পুচ্ছের। ধূমকেতুরা যতই সূর্যের নিকটস্থ হয় ততই তাদের পুচ্ছ বাড়তে থাকে। আবার সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে পুচ্ছটি ছোট হতে হতে এক সময় লুপ্ত হয়ে যায়। এমন কিছু কিছু ধূমকেতুকে দেখা যায় যাদের আদৌ পুচ্ছ নেই। আবার এমন কিছু কিছু আছে যাদের একাধিক পুচ্ছ।

পুচ্ছ উৎপত্তির কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ধূমকেতুরা যখন সূর্য সন্নিধানে গমন করে তখন তার মুণ্ড ও বহিরাবরণের ধূলিকণা ও গ্যাসরাশি সূর্যরশ্মির চাপে আলগা হয়ে যায় এবং তাপে উত্তোজিত হয়ে পুচ্ছরূপে বেরিয়ে আসে। গ্যাসকণা এবং ধুলিকণার উপর সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় বলে দূর থেকে এত উজ্বল দেখায়। প্রকৃতপক্ষে পুচ্ছের

মধ্যে বস্তুকণা অতি বিরলভাবে অবস্থান করে। আকাশের এ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত পুচ্ছের সমস্ত বস্তু কণাকে একত্রিত করলে হয়ত কয়েক গ্রামের মতই হবে। সূর্যরশ্মির চাপে পুচ্ছের উৎপত্তি হয় বলে সূর্যের বিপরীতে দেখা যায়। ধূমকেতুর আরও বৈশিষ্ট্য, সূর্যোদয়ের পূর্বে ধূমকেতুদের দেখা যায় পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে দেখা যায় পশ্চিমাকাশে।

ধূমকেতুদের পুচ্ছ কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। কয়েকবার সূর্য সান্নিধ্যে গমন করলে আপনা হতেই পুচ্ছটি লুপ্ত হয়। তখন ওদের আর ধূমকেতু বলে চেনা যায় না। প্রসিদ্ধ ব্যায়েলার ধূমকেতুকে প্রথমে দেখা গেছিল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী "ব্যায়েলা" এই ধূমকেতুটিকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং ভবিষ্যবাণী করেছিলেন প্রতি ৬¾ বছরে উক্ত ধূমকেতুটি একবার করে সূর্য প্রদক্ষিণ শেষ করছে ব্যায়েলারের কথা অবশ্য সত্য হয়েছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্বার আবির্ভাব হয়েছিল। তার পর এসেছিল ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এবার তার পুচ্ছ ছিল না।

ধূমকেতুদেরও গ্রহের মত সূর্যের চারদিকে ঘুরতে হয়। কিন্তু পথ তাদের বড় বেশি উপবৃত্তাকার। কেউ কেউ যেমন অতি অল্প কয়েক বছরে সূর্য প্রদক্ষিণ করে, তেমনই এমন অনেক ধূমকেতু আছে যাদের পরিক্রমা শেষ করতে শত শত বছর লেগে যায়। তবে অভিমুখ সবার সমান নয়। এমন কিছু কিছু ধূমকেতু দৃষ্ট হয় যাদের পরিভ্রমনের অভিমুখ গ্রহদের ঠিক বিপরীত। এই হিসাবে ধূমকেতুরা উচ্ছৃঙ্খল।

আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, ওরা বহির্জগতের বাসিন্দা। প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে একদিন এসে পড়ে পৃথিবীর আকাশে। তারপর ছুটতে ছুটতেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু একথা সত্য নয়। বিজ্ঞানী এডমণ্ড হ্যালিব প্রমান করেছেন কথাটা। হ্যালি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে ওরা আমাদের সৌরজগতেরই বাসিন্দা। সূর্যের কাছে এলে এদের গতিবেগ অসম্ভব রকমের বেড়ে য়ায়। তারপর দূরে সরে গেলে গতি হয় মন্দীভূত এবং পুচ্ছটিও ধীরে ধীরে হয় লুপ্ত।

ধূককেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আজও একমত হতে পারেননি।

অনেকের ধারণা, ওরা বৃহস্পতি ও শনি গ্রহ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সূর্য পৃষ্ঠে একটি বিক্ষোভের ফলে সূর্যদেহ থেকেই উৎপত্তি হচ্ছে ওদের। তৃতীয় আর একটি মতবাদ আছে। সেই মতবাদ অনুযায়ী ধূমকেতুরা নক্ষত্রের দেহাবশেষ। তবে কোন মতবাদই সর্বজন গ্রাহ্য নয়। বিজ্ঞানীরা এখনও সমানে চেষ্টা করে চলেছেন সঠিক তত্ত্ব নির্ধারণের জন্য।

গ্রহ নক্ষত্রের মত ধূমকেতুরও শেষ আছে। বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ করেছেন ধূমকেতুর শেষ পরিণতি। দেখা গেছে বেশির ভাগ ধূমকেতু ধ্বংস হয়ে পরিণতি হয় উল্কায়! যে ব্যায়েলার ধূমকেতুর কথা আগে বলা হয়েছে, সে ধূমকেতুটি যখন ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর আকাশে উদিত হয়েছিল তখন তার পুচ্ছ তো ছিল না অধিকন্তু তার মুণ্ডটা হয়ে গিয়েছিল ঠিক একটা মোচার মত। তারপরে মুণ্ডটা ভেঙ্গে যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে এসেছিল মাত্র একটি খণ্ড। বিজ্ঞানীরা উৎসুক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যায়েলার ধূমকেতুর শেষ পরিণতি দেখার জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হল তাঁদের প্রতীক্ষা। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেও এল না এবং ১৮৬৬ সালেও না! তবুও বিজ্ঞানীরা ৬¾ বছর অন্তে তাকাতে লাগলেন আকাশের দিকে! শেষে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী পৃষ্ঠে হল উল্কাপাত। ঐ উল্কা ছিল ব্যায়েলার ধূমকেতুর দেহাবশেষ।

বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েকটি ধূমকেতুর পরিচয় লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ধূমকেতুটি হল "হ্যালির ধূমকেতুর"। আবিষ্কারক হ্যালির নামানুসারেই নামকরণ করা হয়েছে। এটির সূর্য পরিক্রমার কাল শেষ হয় প্রায় ৭৫ বছরে। সর্বশেষ ওকে দেখা গেছে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। পুনর্বার উদিত হবে ১৯৮৫ কিংবা ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রহদের বিপরীত অভিমুখেই এটির গতি। এমন সুন্দর যে ধূমকেতু সেও সূর্য থেকে দূরে গেলে অতি ধীরে অনন্ত মহাশূন্যে প্রেতের মত নিঃশব্দে পদচারনা করে। সূর্যের কাছে এলেই উৎপন্ন হয় তার অতি চমৎকার পুচ্ছটি।

সৌরজগতে ধূমকেতুদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লাক্ষের কাছাকছি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের চোখে এ পর্যন্ত ধরা পড়েছে মাত্র হাজারটির মত। এখনও প্রতিবছরে গড়ে প্রায় পাঁচটি অজনা ধূমকেতুর পৃথিবীর আকাশে বেড়াতে আসে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইবেরিয়ার তুঙ্গুস্কা নদীর কাছে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। দিনটি ৩০শে জুন এবং সময় ছিল সকাল ৭টা। এক বিশাল অংশে অধিবাসীরা অকস্মাৎ দেখতে পেল হঠাৎ আকাশে নিক্ষিপ্ত হল সুবিশাল এক অগ্নিময় গোলক। এমন তার ঔজ্জল্য যে, মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল প্রভাতের সূর্যের রশ্মি। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে সেই অগ্নিগোলকের ঘটল বিস্ফোরণ। বিভ্রান্ত হয়ে গেল সেখানকার মানুষ। কী এই প্রচণ্ড শক্তিধর অগ্নিময় গোলক?

বিজ্ঞানীরা জানালেন, এটি ছিল একটি পথভ্রষ্ট ধূমকেতু। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ কেন পাওয়া গেছিল? তারও উত্তর দিলেন বিজ্ঞানীরা।

ওয়াশিংটন ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ক্লাইভ কাওয়ান, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী উইলার্ড লিবি এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী অ্যাটলুরি জানালেন তুঙ্গুস্কা নদীর কাছে যে ধূমকেতুটির হঠাৎ আবির্ভাব হয়েছিল সেটি "অ্যান্টিম্যাট্যর" বা "প্রতিবস্তু" দিয়ে তৈরি ছিল। কক্ষচ্যুত হয়ে পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে আসায় বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং উৎপন্ন হয়েছে প্রচুর শক্তি।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পরমাণুর কেন্দ্রকে যেমন, প্রোটন, নিউট্রন ইলেকট্রন ইত্যাদি থাকে, তেমনিই থাকে নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত অ্যান্টিপ্রোটন এবং পজিটিভ তড়িৎযুক্ত পজিট্রন। এরা প্রোটন ও ইলেকট্রনের বিপরীত কণা। নিউট্রনেরও বিপরীত কণা থাকে। এইগুলিকে বলা হয় অ্যান্টিম্যাটার। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সম ভর সম্পন্ন কোন পার্থিব বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে উভয়েরই ধ্বংস ঘটবে এবং উৎপন্ন হবে প্রচুর শক্তি। সে শক্তি শত শত পরমাণু বোমাকেও হার মানবে।

বিজ্ঞানীদের অনেকে এখন ধূমকেতুকে ঐ অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিবস্তু দিয়ে তৈরি বলে যুক্তি দেখাচ্ছে। তবে কোন সিদ্ধান্তে এখনও আসতে পারেননি। হয়ত ভবিষ্যতে এই সমস্যার সমাধান হবে।

এবার উল্কার কথায় আসা যাক। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে দেখা যায় হাউইর মত আগুনের ফুলকি ঝরাতে ছরাতে কি যেন মাঝে মাঝে নেমে আসছে উপর থেকে। এই গুলোকেই বলা হয় উল্কা। আমরা সাধারণ কথায় ঐ ঘটনাকে "তারাখসা" বলি। যদিও কথাটা একেবারেই ভুল।

রাতের মত দিনের বেলায়ও উল্কাপতন হয়। তবে সূর্যের আলোর জন্য আমরা দিনের বেলায় উল্কা পতন দেখতে পাই না। বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের সাহায্যে দেখছেন, পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে উল্কাপতন ঘটে। আবার বছরের বিশেষ বিশেষ তারিখে ঐ উল্কাপতন অনেক বেশি। বিশেষতঃ জুলাই ও নভেম্বর মাসের মাঝামাঝির দিকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি উল্কাপতন হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমার পথে যখন কোন ধূমকেতুর ধ্বংসাবশেষের কক্ষপথের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে তখন উল্কাপতনের পরিমাণ বাড়ে। পূর্বে যে ব্যায়েলার ধূমকেতুর কথা বলা হায়ছে যেটির কক্ষপথের কাছে পৃথিবী আসে নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখ নাগাদ। হিসেব করে দেখা গেছে ঐদিন পৃথিবীর কোন না কোন জায়গায় প্রচুর উল্কা বর্ষণ হয়।

এখন প্রশ্ন, ঐ উল্কা কি? ওরা কেনইবা ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে? দীর্ঘ গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা যা নির্দেশ করেছেন তা নিম্নরূপ —

মহাকাশে বিরলভাবে অবস্থান করছে অসংখ্য ধূলিকণা ও গ্যাসকণা। তাছাড়া আছে যথেষ্ট সংখ্যক ছোট বড় শিলাখণ্ড। এগুলি আবার আকাশে স্থিরভাবে নেই। সৌরজগতের নিয়ম অনুযায়ী ওদেরও ঘুরতে হচ্ছে আপন আপন কক্ষপথে সূর্য বন্দনার জন্য। তবে অতিশয় ক্ষুদ্র বলে এদের কক্ষপথ বড় বেশি উপবৃত্তাকার।

শিলাখণ্ডগুলির উৎপত্তি সাধারণতঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত ধূমকেতু থেকে। ধূমকেতু মুণ্ডটি যেহেতু অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ডের সমষ্টি, সেইহেতু ধ্বংস হয়ে গেলেও বিচ্ছিন্ন শিলাখণ্ডগুলি ধুমকেতুর মতই আকাশ পরিক্রমা করে। ধুমকেতুর দেহাবশেষ ছাড়াও সৌরজগতে বিচরণ করছে হাজার হাজার গ্রহাণু। যাদের আয়তন নিতান্তই ক্ষুদ্র।

পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে হয় এতসব বিরলভাবে অবস্থানকারী ধুলিকণা, গ্যাসকণা শিলাখণ্ডের পাশ দিয়ে। পৃথিবীর নিজস্ব আকর্ষণ বলও আছে। যখন যে অঞ্চল দিয়ে সে গমন করে তখন তার আকর্ষণের আওতায় যত ধুলিকণা এবং বস্তুখণ্ড পড়ে সেগুলি প্রবল বেগে ছুটে আসে ভূ-পৃষ্ঠের উপর। কিন্তু পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে গভীর বায়ুর স্তর। যদিও স্তরটি উপরের দিকে ক্রমশ হালকা হয়ে গেছে তবুও পৃথিবী পৃষ্ঠের পঞ্চাশ থেকে সত্তর মাইল উপরে বায়ুর সংঘর্ষে ছুটে আসা বস্তুপিণ্ডগুলি জ্বলতে আরম্ভ করে। তারপর ত্রিশ চল্লিশ মাইল উর্ধ্বে আসতে আসতেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে বস্তুখণ্ডগুলি আকারে বড় তারা জ্বলতে জ্বলতে আরও নিম্নে নেমে আসতে পারে। সবচেয়ে বড়খণ্ডগুলি সরাসরি পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমেও আসে।

জ্বলন্ত অবস্থায় যখন উর্ধ্বাকাশ থেকে বস্তুপিণ্ডগুলি ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে তখনই আমরা বলি উল্কাপতন ঘটাল। এগুলোর আকার সাধারণত এক একটি মার্বেলের মত। কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে যে সব উল্কা নেমে আসে তাদের কোন কোনটির ব্যাস যাট সত্তর ফুটেরও বেশি।

ধুমকেতু প্রসঙ্গে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তুঙ্গুস্কা নদীর তীরে যে ভয়াবহ ধুমকেতুর ধ্বংসাবশেষ উল্কারূপে পতিত হয়েছিল তার ব্যাস ছিল অনেক বেশি। প্রায় চার হাজার বর্গমাইল এলাকাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সৌভাগ্য যে উল্কাটি সাইবেরিয়ার মত জনবিরল স্থানে পড়েছিল। তা না হলে কত হাজার হাজার মানুষ ও জীবজন্তু যে প্রাণ হারাত তার ঠিকঠিকানা নেই। শোনা যায়, সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে মানুষ উত্তাপ অনুভব করেছিল। গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল অনেকগুলি।

সবচেয়ে বড় গহ্বরটির ব্যাস ছিল ১৫০ ফুট। এতবড় উল্কাপতন পৃথিবীতে আর হয়েছে বলে কারও জানা নেই। চাঁদ কিংবা মঙ্গলপৃষ্ঠে যে বড় বড় খাদগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই উল্কাদের দ্বারা সৃষ্ট। চাঁদে ও মঙ্গলে বায়ুমণ্ডল নেই বলে ছোট বড় সব রকমের উল্কা নেমে আসে তাদের পৃষ্ঠ। যে গভীর ক্ষতচিহ্ন তারা অঙ্কিত করে যায় সেগুলোও মুছে যেতে পারেনা কোনদিনও। ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত বুকেই তাদের সূর্য পরিক্রমা করতে হচ্ছে আবহমানকাল। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থাকায় এবং বৃষ্টিপাত বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে কোন ক্ষতই দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারেনা।

যে সব উল্কা পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসে তাদের নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা। জানা গেছে, ওদের উপাদান পার্থিব বস্তুকণা। অনেক যাদুঘরে রক্ষিত আছে উল্কার পাথর।

ইংরাজীতে উল্কাকে বলে Meteor বা মেটিওর। যে উল্কা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তাদের বলা হয় Meteorite। প্রকৃতপক্ষে কক্ষচ্যুত গ্রহাণু বা ধ্বংসপ্রাপ্ত ধূমকেতুর শিলাখণ্ডই Meteorite। তবে একথাও সত্য যে, গ্রহাণুর মধ্যেও আছে অসংখ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত ধূমকেতুর দেহাবশেষ।

পার্থিব বস্তুর শেষ অবস্থা

আমাদের চারদিকে যে বিশাল বস্তুজগৎ ছড়িয়ে আছে তাদের আমরা সাধণারতঃ তিনটি অবস্থায় দেখতে পাই। সে অবস্থাগুলি হল কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। তিনটি অবস্থার কোনটিই বস্তুর স্থায়ীরূপ নয়। একমাত্র তাপের প্রভাবেই বস্তুর রূপান্তর ঘটে। সীসা লোহা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সন্দেহ নেই। সেই সীসাকে গনগনে আগুনের উপর রেখে

দিলে একটু পরেই চকচকে তরল পদার্থে পরিণত হয়। কামারশালায় লোহাকে তরল করতে কে না দেখেছে? আবার কঠিন পদার্থ বরফকে তাপপ্রয়োগ করলে জল হয়ে যায়। পরে সেই জলকেও উত্তপ্ত করলে বাষ্পে পরিণত হয়।

এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বস্তুমাত্রই কঠিন তরল কিংবা বায়বীয় যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে এবং আমরা চেষ্টা করলে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটাতে পারি। আবার সে অবস্থান্তর আসে একমাত্র তাপমাত্রার হেরফেরের জন্যেই। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যেতে পারে, এই পৃথিবীটাই জন্মলগ্নে ছিল অতিতপ্ত গ্যাসীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। কালক্রমে পৃথিবী তাপ হারিয়ে শীতল হতে থাকায় প্রথমে গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হয়ে হল তরল, তারপর আরও শীতল হয়ে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা এখনও প্রচণ্ড বলে সেখানকার সমূহ পদার্থ তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। তার কারণ, একই তাপমাত্রায় সব গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হতে পারেনা কিংবা সমূহ কঠিন পদার্থ একই তাপমাত্রায় গলেনা। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে সব গ্যাস অবস্থান করছে তারাও স্থায়ী নয়। যতখানি শীতল করলে তারা ঘনীভূত হয় সে পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল নয় বলেই ওরা গ্যাসীয় অবস্থায় আছে।

এককালে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কঠিন তরল অথবা বায়বীয় যে কোন একটি অবস্থায় আছে। এদের মধ্যে কঠিন ও তরলকে আমরা চোখে দেখতে পাই কিন্তু বায়বীয় পদার্থকে আমরা দেখতে পাইনা। দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছিল এই ধারণা। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা পদার্থের আর একটি অবস্থার সন্ধান পেয়েছেন। সেই অবস্থানটির নামে রেখেছেন প্লাজমা। আগে যেখানে পদার্থের শেষ অবস্থা বলতে গ্যাসীয় পদার্থকে বোঝান হত, এখন সেখানে শেষ অবস্থা প্লাজমাকে বোঝায়।

আবার বহু বৈজ্ঞানিকের মতে পদার্থের শেষ অবস্থা প্লাজমাও নয়।

তার পরেও বস্তুর আর এক অবস্থা থাকা উচিত। সেইটিই হবে বস্তুর পঞ্চম ও শেষ অবস্থা। অবশ্য বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক ভাবে মেনে নিয়েছেন একথা। এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে প্লাজমা অবস্থার পরিচয় বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন?

প্লাজমা অবস্থা আবিষ্কারের মূলে আছে পরমাণু বিজ্ঞানীদের অবদান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পদার্থের সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম অন্তিম কণাই হচ্ছে পরমাণু তাঁরা আরও মনে করতেন, পরমাণুরা অবিভাজ্য কণা—ওকে ভাঙ্গা যায় না এবং গড়াও যায়না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা অসাধ্য সাধন করলেন। পৃথিবীকে তাঁরা শোনালেন, পরমাণুরা নিরেট, ঠাণ্ডা বা অবিভাজ্য কণা নয়। ওদের ভাঙ্গা যায় এবং গড়াও যায়। তাঁরা আরও জানালেন, পরমাণু বস্তুর অন্তিম কণাও নয়। খালি চোখে অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম যে পরমাণু তার কেন্দ্র পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় থাকে প্রোটন, নিউট্রন, মেসন প্রভৃতি কণা। পরমাণুর মধ্যস্থিত এই জায়গাটির নাম কেন্দ্রক। কেন্দ্রকের চারপাশে বিরাট ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গাটায় দলে দলে ঘুরছে ইলেকট্রনরা। সূর্যের চারপাশে যেমন বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহরা পরিভ্রমণ করে ঠিক তেমনটি ইলেকট্রনরা পরিভ্রমণ করে কেন্দ্রকের চারপাশে। তবে গ্রহরা ঘুরে একক ভাবে আর ইলেকট্রন কোথাও একা, কোথাও ঘুরে দলে দলে।

বিজ্ঞানীরা জেনে নিয়েছেন, কেন্দ্রকে যতগুলি প্রোটন থাকে বাহিরে পরিভ্রমণ করে ঠিক ততটা ইলেকট্রন স্বভাবের দিক থেকে প্রোটনরা-তড়িৎ ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনরা তড়িৎ ঋণাত্মক। তাই পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান সমান থাকায় বাহির থেকে পরমাণুকে তড়িৎ নিরপেক্ষ মনে হয়।

আগে বলা হয়েছে, ইলেকট্রনরা দলে দলে বিভিন্ন কক্ষপথে কেন্দ্রকক্ষে পরিক্রমা করে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি বেশি থাকে তাহলে সর্বশেষ কক্ষের মধ্যে ইলেকট্রনদের দূরত্ব কেন্দ্রক থেকে বেশ দূরে হয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই কেন্দ্রকের আকর্ষণ তাদের উপর কিছুটা

কম। বিজ্ঞানীদের ভাষায় সেই সব ইলেকট্রনরা একটু আলগাভাবে অবস্থান করে এবং এই ধরণের ইলেকট্রনদের অল্পায়াসে সরিয়েও নেওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণুদের (ওদের প্রোটন ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি) উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে কিন্তু প্রোটন বিচ্যুত হয় না। কারণ হিসাবে তাঁরা জানিয়েছেন, কেন্দ্রকের মধ্যে কাজ করে করে প্রবল কার্কর্ষণ বল। তাকে বিচ্ছিন্ন করতে এমন প্রচণ্ড তাপমাত্রার প্রয়োজন যে, উক্ত তাপ সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক।

বিজ্ঞানীরা প্রোটনকে সরাতে না পারলেও উচ্চ উষ্ণতায় পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে সরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু যখনই পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই মূল পরমাণুটি হয়ে পড়ে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট। কেননা পরমাণুর মধ্যে যতটা প্রোটন থাকে ঠিক ততটা থাকে ইলেকট্রন। মাত্র একটা ইলেকট্রনকে খসিয়ে আনলেই তড়িৎ সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। পদার্থটি যদি কঠিন কিংবা তরল না হয়ে গ্যাস হয় তাহলে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগের ফলে বিচ্যুত ইলেকট্রনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং অপরদিকে ধনাত্মক আধানের সংখ্যাও বেড়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা বলেন অত্যধিক তাপপ্রয়োগের দ্বারা গ্যাসকে এমন এক অবস্থায় আনা সম্ভব—যে অবস্থায় গ্যাসের মধ্যে থাকবে কেবলমাত্র মুক্ত ইলেকট্রন কণিকা এবং ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কনিকা। এই অবস্থারই নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা 'পদার্থের চতুর্থ অবস্থা' বা "প্লাজমা"।

প্লাজমার দুটি স্তর। কোন গ্যাসের সমুহ পরমাণু যদি বিয়োজিত হয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন বলা হয় 'সম্পুর্ণ আয়নিত প্লাজমা"। আর বিয়োজন সম্পুর্ণ না হয়ে যদি কিছু কিছু তড়িৎ নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে যায় তাহলে তাকে বলা হয় আংশিক আয়নিত প্লাজমা। প্রকৃতপক্ষে বিয়োজন সম্পূর্ণ হলেই আসে গ্যাসের প্লাজমা অবস্থা। এই অবস্থায় সমুহ ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান

পৃথক পৃথকভাবে গ্যাসের মধ্যে অবস্থান করলেও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গ্যাসটি তড়িৎ নিরপেক্ষ।

গ্যাসের এই ধরণের বিপর্যয় ঘটাতে গেলে প্রচুর তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—২৭০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অণু পরমাণুর মধ্যে কোন গতিবিধি থাকে না। অবশ্য একথাও ঠিক যে—"২৭৩" সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত কোন গ্যাস তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে না, বহু পূর্বেই তরলে পরিণত হয়। সে যাই হোক না কেন তাপমাত্রা বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন, তরল বা বায়বীয় সব রকমের অণু পরমাণুর গতি বেড়ে যায় এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তাদেব পরমাণুর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, বায়ুকে প্লাজমা অবস্থায় আনতে হলে প্রায় দশ হাজার সেন্টিগ্রেডেরও বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। কোন কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে উক্ত তাপমাত্রায় দ্বিগুন তাপমাত্রারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন গ্যাস বা বায়ু প্লাজমা অবস্থায় এলে তার মধ্যে বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবহন ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা সহজেই প্রভাবান্বিত করা যায়। এই গুণগুলির জন্যই বর্তমান কালে প্লাজমার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে প্লাজমা তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উর্ধ্বের স্তর—যেটিকে আয়নমণ্ডল বলা হয় সেখানকার বিরল বায়ুকণা আয়নিত হয়ে প্লাজমা অবস্থায় আছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। ঐ কারণে সুবিধাও কিছু হয়েছে মানুষের। আমরা পৃথিবী থেকে যে সব বেতারতরঙ্গ আদান প্রদান করি, সেগুলির প্রতিফলন ঘটাতে ঐ আয়নিত প্লাজমার স্তরগুলি যথেষ্ট সাহায্যে করে। বর্তমানে কিছু কিছু অসুবিধাও হচ্ছে। পৃথিবী থেকে যে সব মহাকাশযানগুলি উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে, সেগুলি পৃথিবীর বুকে যখন ফিরে আসে তখন তাকে আয়নমণ্ডল অতিক্রম করে ফিরে আসতে হয় বলে তাদের গায়ে জমা হয়ে যায় একটা প্লাজমার স্তর। তারজন্য মহাকাশযানের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করতে যে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় সেটি প্লাজমার স্তরে বাধা

প্রান্ত হয়ে বিস্মিত হয়। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উক্ত বাধাকে দূর করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা বড় আশাবাদী। তাঁরা প্লাজমার মধ্যে এমন একটি গুণের সন্ধান লাভ করেছেন যে তাতে মনে করেছেন, মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ প্লাজমাই গ্রহণ করবে মুখ্য ভূমিকা। বিশেষতঃ মহাকাশযানকে ঠিকপথে চালিত করা যাবে ঐ প্লাজমার সাহায্যেই।

এখন প্লাজমাকে কিছু কিছু কাজে নিয়োগও করা হয়েছে। বিশেষ করে পারমাণবিক চুল্লিতে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্লাজমার তাত্ত্বিক দিক ছাড়া প্রয়োগের দিকটা তত বেশি বিস্তারিত নয়। প্লাজমা সম্পর্কে বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত। তবুও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীই গবেষনায় লিপ্ত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাত্ত্বিক দিক থেকে বিজ্ঞানীরা প্লাজমাকে পদার্থের শেষ অবস্থা বলে মনে করছেন না। তাঁদের মতে পদার্থে পঞ্চম অবস্থা থাকা সম্ভব এবং সেই অবস্থাই হবে পদার্থের শেষ অবস্থা।

এখন প্রশ্ন, পদার্থের ঐ শেষ অবস্থাটা কেমন হবে?

বিজ্ঞানীরা বলতে চান, প্লাজমান পরবর্তী স্তর বা পদার্থের সর্বশেষ স্তর আসবে তখনই, যখন গ্যাসীয় পরমাণু থেকে কেবলমাত্র ইলেকট্রন গুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করবে না—কেন্দ্রক থেকে প্রোটন ও নিউট্রনরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্যাসের মধ্যে অবস্থান করবে। তখন সেই গ্যাসকেও প্লাজমা অবস্থার মত তড়িৎ নিরপেক্ষ মনে হবে।

বিজ্ঞানীদের উক্ত তত্ত্বে এখনও সংশয় আছে যথেষ্ট। পরমাণুর কেন্দ্রকের বাহিরে ইলেকট্রনরা আলতো ভাবে অবস্থান করে পরিভ্রমণরত আছে বলে তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তাও আবার প্রয়োজন হয় হাজার হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রায়। কিন্তু কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রনরা প্রচণ্ড শক্তিতে পরপর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। তাদের বিচ্ছিন্ন করা মানুষের

একরকম সাধ্যাতীত। কারণ বিজ্ঞানীদের মতে পদার্থকে সর্বশেষ অবস্থায় আনতে হলে কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হবে।

এই প্রচণ্ড তাপমাত্রা কী সৃষ্টি করা সম্ভব? এমন যে তাপমাত্রা যা আংশিক প্রয়োগ করলে পৃথিবীর সব কিছুই বাষ্প হয়ে মিশে যাবে মহাশূন্যে। তাই বিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটা খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তটি যদি সত্য বলে ধরা হয় তাহলে বলতে হবে বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্বের এক কোনে যে ঘন পুঞ্জীভূত মেঘের সৃষ্টি হয়েছিল সেই মেঘটি ছিল বস্তুর শেষ অবস্থার স্তরে।

সৌরশক্তি

সূর্যরশ্মির ভয়ঙ্কর শক্তির কথা বোধহয় প্রথমে মহাত্মা আর্কিমিদিসই টের পেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি নিম্নরূপ—

আর্কিমিদিস ছিলেন সাইরাকিউসের রাজার বন্ধু। একবার রোমানরা বিশাল এক নৌবহর সজ্জিত করে এগিয়ে এসেছিল সাইরাকিউস আক্রমণ করতে। তাদের প্রতিহত করার সাধ্য সাইরাকিউসের রাজার ছিল না। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিজ্ঞানী বন্ধু আর্কিমিদিসকে। জানিয়েছিলেন রাজ্যের আসন্ন বিপদের কথা।

আর্কিমিদিস অনেক চিন্তা করে তৈরি করে নিয়েছিলেন কয়েকটি যড়ভুজাকৃতি দর্পণ। যখন রোমান রণতরীগুলি এগিয়ে এসে নোঙর করলো তখন আর্কিমিদিস দর্পণগুলি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। নিদাঘের নির্মেঘ মধ্যাহ্ন আকাশে তখন দ্বাদশ সূর্যের দীপ্তি। আর্কিমিদিস দর্পণের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে প্রতিফলিত করলেন রণতরীগুলির পালের উপর। অকস্মাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো পাল।

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রোমান বাহিনী। অধিকাংশ রণতরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নিমজ্জিত হলো সাগরে।

কাহিনীটি ২১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে আর্কিমিদিসই প্রথম সৌরশক্তিকে মানুষের কাজে নিয়োগ করে-ছিলেন। যদিও কাজটি ছিল ধ্বংসাত্মক।

আর্কিমিদিসের অনেক পরে ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রোকাস নামে কনষ্টান্টি-নোপলের এক বিজ্ঞানীও উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিদেশী রণতরীগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন। তবে সূর্যরশ্মি থেকে অগ্নিউৎপাদন পদ্ধতি বেশ পুরাতন। কথিত আছে এথেন্সবাসীরা তাঁদের আরধ্যাদেবী ভেষ্টার পূজার জন্য পবিত্র অগ্নিশিখার সৃষ্টি করতেন মসৃন সোনার পাতে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে। তবে এসব অত্যন্ত পুরাতন দিনের কথা।

বর্তমানকালে সূর্যরশ্মিকে নানাভাবে কাজে লাগানর প্রচেষ্টা চলেছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অদূর ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে সভ্যতার অগ্রগতি বজায় থাকবে না। তাঁরা চিন্তিতও হয়ে উঠেছেন। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যবহৃত শক্তির একটা বিরাট অংশ আসছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে। অপরদিকে মানুষের শিল্পের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ভূগর্ভ থেকে যে হারে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচ্ছে তাতে আগামী কয়েক দশকের পরেই পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত ওদের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

তেল এবং কয়লার বিকল্প হিসাবে পরমাণুশক্তিকে মানুষ এখন ব্যবহার করছে। পরমাণুশক্তির উৎস হচ্ছে ইউরেনিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় ধাতুটি। কিন্তু ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। ব্যবহার করতে করতে মানুষ ওকেও শেষ করে ফেলবে। তাহলে ভবিষ্যতে মানুষ কি করবে? মানব সভ্যতার জয়যাত্রা কি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয়ে যাবে?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে রোধ করে এমন সাধ্য কার? কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর

ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে কিন্তু সূর্য আকাশ থেকে যাবে কোথায়? তার যে অফুরন্ত শক্তি, কণামাত্র ব্যবহার করার উপায় উদ্ভাবন করতে পারলেই ভবিষ্যতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাঁরা হিসেব করে জানিয়েছেন, প্রতি ১০০ বর্গফুট জায়গায় যেটুকু সৌরশক্তি এসে পড়ে তার পরিমাণ একলক্ষ কিলো ক্যালরি। [ক্যালরি তাপশক্তির একক। এককিলো ক্যালরি=এক হাজার ক্যালরি।] শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই শক্তির পরিমাণ আরও বেশী। যদি স্বল্প ব্যয়ে সৌরশক্তিকে সংগ্রহ করা যায় তাহলে কয়লা, খনিজতৈল, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতু প্রভৃতি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেলেও কোন অসুবিধা হবে না।

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করে এসেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকগুলি পদ্ধতিও তাঁদের কৃপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পদ্ধতিগুলির কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

(১) বাস গৃহকে শীতের দিনে গরম রাখার পদ্ধতি।

অনেকগুলি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজতম এবং ব্যয়বহুল নয় এমন পদ্ধতি হলো, সৌরশক্তিকে সঞ্চয় করার জন্য সোডিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির টুকরাকে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটি পাত্রে আবদ্ধ রাখা হয়। পাত্রটিকে বলা হয় "সৌরশক্তির সংগ্রাহক" পাত্রটির মুখে ঢাকা থাকে স্বচ্ছ কাচের পাত এবং অভ্যন্তরে থাকে কয়েক সারি কালো কাচের পাত। কালো পদার্থ তাপ শোষণ করার কাজে বিশেষ উপযোগী বলেই সংগ্রাহকে কালো কাচের পাত ব্যবহার করা হয়। সূর্যরশ্মি সংগ্রাহকের মুখের ঢাকনার ভেতর দিয়ে কালো কাচের পাতের উপর পড়লেই উত্তপ্ত হয়। পাত্রের মধ্যে নালীপথ থাকে। বাসগৃহের শীতল বায়ু সেই নালী পথে প্রবেশ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। তারপর সেই উত্তপ্তবায়ুকে বাসগৃহের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পরিচালনা করার ব্যবস্থা থাকে। এইভাবে ক্রমাগত পরিচালনা করা

এবং সংগ্রাহক প্রকোষ্ঠে পুনরায় প্রেরণ করার ফলে বাসগৃহ উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

(২) রান্নার কাজে সৌর উনান।

একটি বিশেষ ধরণের তাপঅন্তরক ও বায়ুনিরোধক বাক্সের মুখ স্বচ্ছ কাচের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বাক্সের ভেতরের দেওয়ালে থাকে গাঢ় কালো প্রলেপ। অনেক সময় অবতল দর্পনের সাহায্যে সূর্যকিরণকে কেন্দ্রীভূত করে বাক্সের উপর ফেলা হয়।

সুখের কথা, এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে ভারতবর্ষের "ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি"। ঐ একই পদ্ধতিতে ইসরায়েল তৈরি করেছে সৌর জলাশয়। তারা সূর্যরশ্মিকে সৌর জলাশয়ে সঞ্চিত করে তাকে রূপান্তরিত করেছে বাষ্পীয় শক্তিতে এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে।

(৩) সূর্যরশ্মিকে উত্তল লেন্সের দ্বারা কেন্দ্রীভূত করে অতি অল্প জায়গায় প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত তাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আজকাল যে সব সৌরচুল্লী নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে এই উপায়েই তাপ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

(৪) আমরা জানি, তাপশক্তি থেকে সরাসরিভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়। দুটি ভিন্ন ধাতুর তারের দুটি প্রান্ত জোড়া লাগিয়ে সেই জোড়া দেওয়া স্থানটিকে বিভিন্ন উষ্ণতায় গরম করলে তারের প্রান্তদ্বয়ে তড়িচ্চালক বলের তারতম্য ঘটে বলে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত তড়িৎপ্রবাহ পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তড়িৎকে বলা হয় থার্মোইলেকট্রিসিটি। থার্মোইলেকট্রিসিটির জন্য ধাতব তারগুলির প্রান্তদ্বয়কে সূর্যরশ্মির দ্বারা গরম করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

(৫) সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগিয়ে এক রকমের বিদ্যুৎকোষও তৈরী করা হচ্ছে। এই জাতীয় কোষের নাম "ফটোগ্যালভানিক সেল"

(৬) সৌরশক্তিকে কাছে লাগিয়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পাতিত করার প্রচেষ্টা সবদেশেই সুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাই

এ বিষয়ে অগ্রণী। বেশ কিছুদূর তাঁরা এগিয়েও গেছেন। পদ্ধতিটি কার্যকরী হলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা খুব সহজ হবে।

(৭) বয়লারের জলকে বাষ্পীভূত করে বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কলকারখানায়। জলকে বাষ্পীভূত করতে তাই প্রয়োজন হয় প্রচুর জ্বালানী। বিশেষতঃ কয়লাকেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই জ্বালানীর সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এক ধরনের সৌরযন্ত্রের আবিষ্কার করেছেন। ঐ যন্ত্রটির দ্বারা সূর্যরশ্মির সাহায্যে তাঁরা বয়লারের জলকে বাষ্পীভূত করছেন। এক বিশেষ ধরণের বড় দর্পণ ছাড়া এই যন্ত্রের অন্য কোন উল্লেখযোগ্য অংশ নেই। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে প্রচুর কয়লার সাশ্রয় হতো।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনীয় প্রোটিনও স্নেহজাতীয় খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত এখন সৌরশক্তির সাহায্যে গ্রহণ করছে। এই উদ্দেশ্যে তারা চাষ করছে ক্লোরেলা নামক এক জাতীয় শ্যাওলা। ওদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করে এবং অপরাপর উদ্ভিদের তুলনায় বাড়েও দ্রুত। ক্লোরেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ওরা প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থে ভয়ানক সমৃদ্ধ। খাদ্য হিসাবে ক্লোরেলা তাই অত্যন্ত মূল্যবান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় জলাভূমিতে সৌরশক্তির সঞ্চয়ন করে ক্লোরেলার চাষ করছে। খাদ্যসমস্যা সমাধানে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার আরও বহু পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এই উদ্দেশ্যে আজ গবেষণারত। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে আর হয়ত অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই সৌরশক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। সেদিন মানুষ কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের দিকে বড় একটা নজর দেবে না। বর্তমানে অনেক পদ্ধতিই আবিস্কৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্য জনপ্রিয় হচ্ছে না। অল্প ব্যয়ে যেদিন মানুষ সৌরশক্তিকে উৎপন্ন করতে সমর্থ হবে সেদিন অবশ্যই পৃথিবীর বুকে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ভারতের বহু গবেষণা গারেই এই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চন্দ্রপৃষ্ঠ যাতায়াতের সুবিধা এবং সেখানে

উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে এ কাজটা আরও সহজ হবে। হয়ত একদিন দেখা যাবে পৃথিবীর থার্মাল ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রধান ঘাঁটি চন্দ্র। সেখান থেকে পৃথিবীর সর্বত্রই সরবরাহ করা হচ্ছে বিদ্যুৎ। লোডশেডিং আর হচ্ছে না। কবে আসবে সেই দিন? অজকের দিনে তরুণ যারা— তারাই প্রশ্নটির উত্তর দিও।

কতকগুলি যুগান্তকারী যন্ত্রপাতি

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ	সাল
ছাপার যন্ত্র	গুটেনবার্গ	জার্মানী	১৪৫০
দূরবীক্ষণ যন্ত্র	লিপারসে, জানসেন	—— নেদারল্যাণ্ড	সম্ভবতঃ ১৬০৪
অণুবীক্ষণ যন্ত্র	জানসেন, লিউয়েন হোয়েক	নেদারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড	—, —
বায়ু নিষ্কাশক যন্ত্র	অটোভন গেরিক	জার্মানী	১৬৫০
ব্যারোমিটার	টরিসেলি	ইতালি	১৬৫৩
পেণ্ডুলামযুক্ত ঘড়ি	হাইগেনস	নেদারল্যাণ্ড	১৬৫৬
পারদ থার্মোমিটার	ফারেনহাইট	জার্মানী	১৭১৪
স্টীম ইঞ্জিন	জেমস্ ওয়াট	স্কটল্যাণ্ড	১৭৬৫
সুতো তৈরির কল	হারগ্রীব্‌স	ইংল্যাণ্ড	১৭৬৭
বেলুন	মণ্টগলফ্‌ইয়ার ব্রাদার্স	ফ্রান্স	১৭৮৩
স্টীম লকোমোটিফ	ট্রেফিথিক	ইংল্যাণ্ড	১৮০১
স্টীম বোট	রবার্ট ফুলটন	আমেরিকা	১৮০৩
ক্যালিডো স্কোপ	ডেভিড ব্রিউ স্টার	ইংল্যাণ্ড	১৮০৯
সেফটি ল্যাম্প	হামফ্রে ডেভি	ইংল্যাণ্ড	১৮১৬
প্রসব সাঁড়াশি	চেম্বারলেন	,,	১৮১৯
স্টেথসস্কোপ	লেনেক	ফ্রান্স	১৮১৯
নিরাপদ দেয়াশলাই	ওয়াকার	ইংল্যাণ্ড	১৮২৭
ইলেকট্রিক জেনারেটার	মাইকেল ফ্যারাডে	,,	১৮৩১
টেলিগ্রাফ	স্যামুয়েল মোর্স	আমেরিকা	১৮৩২

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ	সাল
রেফ্রিজারেশন	পারকিনস	,,	১৮৩৪
শস্য কাটার যন্ত্র	সি, ম্যাকেরমিক	,,	১৮৩৪
পিস্তল	কোল্ট	,,	১৮৩৫
ফটোগ্রাফি	লুইস ড্গোরে	ফ্রান্স	১৮২৭
ভালকানাইজড	রবার গুডইয়ার	আমেরিকা	১৮৩৯
বাইসাইকেল	ম্যাকমিলান	স্কটল্যাণ্ড	১৮৪২
পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট	অ্যাস্পডিন	ইংল্যাণ্ড	১৮৪৫
সেলাই কল	ইলিয়াস হাউই	আমেরিকা	১৮৪৬
সেফটিপিন	ওয়ালটার হান্ট	,,	১৮৪৯
বেসিমার চুল্লী	বেসিমার	ইংল্যাণ্ড	১৮৫৬
স্পেকরট্রোস্কোপ	কিরসপ বুনসার	জার্মানী	১৮৫৯
ডায়নামো	পিকিপট্‌টি	ইতালি	১৮৬০
মেশিনগান	আর. জে. গ্যাটলিং	আমেরিকা	১৮৬১
টরপেডো	ওয়াইট হেড	ইংল্যাণ্ড	১৮৬৬
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	সুইডেন	১৮৬৬
টাইপ রাইটার	সি মোলস	আমেরিকা	১৮৬৮
সেলুলয়েড	জোহান ডাব্লু হোয়াট	আমেরিকা	১৮৭০
টেলিফোন	গ্রেহাম বেল	,,	১৮৭৬
মাইক্রোফোন	বারলাইনার	,,	১৮৭৭
ফোনোগ্রাফ	এডিসন	,,	১৮৭৭
ইলেকট্রিক বাল্ব	এডিসন	,,	১৮৭৯
কারবুরেটার	ডেমলার	জার্মানী	১৮৭৯
রেয়ন	সোয়েন	ইংল্যাণ্ড	১৮৮৩
ফাউন্টেন পেন	ওয়াটার ম্যান	আমেরিকা	১৮৮৪
ইন্টারন্যাল কম্বাসন	ইঞ্জিন ডেমলার	জার্মানী	১৮৮৫
লাইনোটাইপ	মার্গেনথেলার	আমেরিকা	১৮৮৫
মোটর সাইকেল	ডেমলার	জার্মানী	১৮৮৫
গ্রামোফোন	বারলাইনার	আমেরিকা	১৮৮৭

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ	সাল
কোডাক	জর্জ ইস্টম্যান	,,	১৮৮৮
রবারের টায়ার	ডানলপ	আয়ারল্যাণ্ড	১৮৮৮
ফটোগ্রাফি	লিপম্যান	ফ্রান্স	১৮৯১
সাবমেরিন	জোহান পি হল্যাণ্ড	আমেরিকা	১৮৯১
ইলেকট্রিক মোটর	সিকোলা তেসলা	,,	১৮৯২
মুভি প্রোজেক্টর	এডিসন	,,	১৮৯৩
কোক ওভেন	হফম্যান	অস্ট্রিয়া	১৮৯৩
ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	জার্মানী	১৮৯৫
রেডিও	মার্কনি	ইতালি	১৮৯৫
এক্সরে	রয়েন্টগেণ	জার্মানী	১৮৯৫
সেফটিরেজার	জিলেট	আমেরিকা	১৮৯৫
ট্রাকটার	বি. হোল্ড	,,	১৯০০
এরোপ্লেন	উইলবার রাইট অর ভিল রাইট	,,	১৯০৩
ব্যাকে লাইট	এল. এইচ ব্যাকল্যাণ্ড	,,	১৯০৭
ভ্যাকুয়াম টিউব	এল. ভি. ফরেস্ট	"	১৯০৭
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ	ডব্লু. এইচ. ক্যারিয়ান	,,	১৯১১
হাইড্রোপ্লেন	গ্লেন কারটিস	,,	১৯১১
ট্যাঙ্ক	ই. সুইলটস	ইংল্যাণ্ড	১৯১৪
রেডার	টেলার ইয়ং	আমেরিকা	১৯২২
আয়ানো স্কোপ	জোরিকিন	অমেরিকা	১৯২৩
লাইড স্পীকার	পিন কেলয়	,,	১৯২৪
টেলিভিসন	বেয়ার্ড	ইংল্যাণ্ড	১৯২৬
তরল জ্বালানি যুক্তরকেট	হাচিন্স গজার্ড	আমেরিকা	১৯২১
নাইলন	ক্যারুথার্স	,,	১৯৩০
জেট প্রপাল সান	ফ্রাঙ্ক হুইটলি	ইংল্যাণ্ড	১৯৩০

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ	সাল
সিনেমাস্কোপ	হেনরি ক্রেটিয়াস	ফ্রান্স	১৯৩১
সাইক্লোটোন	ই. ও. লরেন্স	আমেরিকা	১৯৩১
হেলিকপটার	সিবরসকি	”	১৯৩৯
নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর	এনরিকো ফার্মি	ইতালি আমেরিকায় প্রবাসী	১৯৪২
অ্যাটম বোমা কর্মকাণ্ডের নেতা	রবার্ট ওপেন হাইমার	আমেরিকা	

কতকগুলি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক তথ্য

উদস্থিতি বিদ্যা	আর্কিমিদিস	গ্রীস	খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী
স্থিতি বিদ্যা	গ্যালিলিও	ইতালি	ষোড়শ শতাব্দী
ভূচুম্বকত্ব ও তড়িতাহিত করণ পদ্ধতি	গিলবার্ট	ইংল্যাণ্ড	১৬০০
আলোকের কণিকা তত্ব	নিউটন	”	—
প্রবাহী তড়িৎ -	গ্যালভানি	ইতালি	১৭৮৬
তড়িৎ কোষের কার্যনীতি	ভোল্টা	”	১৮০০
তড়িতের চৌম্বক ধর্ম	ওরস্টেড	ডেনমার্ক	১৮২০
প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র	জর্জ সাইমন ও হম	ইংল্যাণ্ড	১৮২৬
তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ	ফ্যারাডে	ইংল্যাণ্ড	১৮৩১
তড়িৎ বিশ্লেষণ সূত্র	”	”	১৮৩৩
তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ফল	জন প্রেসকট জুল	ইংল্যাণ্ড	১৮৪১
আলোকের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব	ম্যাক্সওয়েল	ইংল্যাণ্ড	১৮৬৪
বেতার তরঙ্গ	হার্ৎস	জার্মানী	১৮৮৭
পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে মতবাদ	রাদার ফোর্ড	ইংল্যাণ্ড	—
	নীলস বোর	ডেনমার্ক	—
ইলেকট্রন	জে. জে. টমসন	ইংল্যাণ্ড	১৮৯৭
গামা রশ্মি	ভিলার্ড	—	১৯০০

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ	সাল
মহাজাগতিক রশ্মি	সি. টি. আর উইলসন	ইংল্যাণ্ড	১৯০০
মেসন	যুকাওয়া	জাপান	৯০০
কোয়ান্টাম তত্ত্ব	ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক	জার্মানী—	—
গ্যাসের সূত্রাবলী	গেলুসাক	ইংল্যাণ্ড	
	রবার্ট বয়েল	আয়ার্ল্যাণ্ড	
	চার্লস	ফ্রান্স	
গ্যাসের ব্যাপন	গ্রেহাম	ইংল্যাণ্ড	
প্রোটন	রাদাদ ফোর্ড	ইংল্যাণ্ড	১৯১৪
সমস্থানিক মেটল	জে. জে. টমসন	,,	১৯১১
কৃত্রিম উপায়ে মৌলান্তর	রাদার ফোর্ড	,,	১৯১৯
ইউরেনিয়াম লবণের তেজস্ক্রিয়তা	বেকারেল	ফ্রান্স	১৯০৬
পজিট্রন	অ্যাণ্ডারসন	আমেরিকা	১৯৩২
নিউট্রন	ম্যাডউইক	ইংল্যাণ্ড	১৯৩২
আপেক্ষিক বাদ	এলবার্ট আইনস্টাইন	জার্মানী	১৯০৬

কতকগুলি মৌলিক পদার্থ

হাইড্রোজেন	হেনরি ক্যাভেতিস	ইংল্যাণ্ড	১৭৬৬
অক্সিজেন	শীলে	সুইজারল্যাণ্ড	১৭৭২
	জোসেফ প্রিস্টলী	ইংল্যাণ্ড	১৭৭৪
ক্লোরিন	শীলে	সুইজারল্যাণ্ড	১৭৭৩
ফ্লোরিন	ময়সাঁ	ফ্রান্স	১৮৮৬
অ্যালুমিনিয়াম	চার্লস মার্টিন হল	আমেরিকা	১৮৮৬
বাতাসের নিষ্ক্রিয় গ্যাস	র‍্যামজে	ইংল্যাণ্ড	
রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম	পিয়ের কুরি, মাদাম কুরি	ফ্রান্স	১৮৯৮

যুগান্তকারী ওষুধ ও টীকা

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার	ইংল্যাণ্ড
রোগীকে অচেতন করার উপায়	সিম্পসন	ইংল্যাণ্ড
অ্যানথ্রাক্স ও জলাতঙ্কের টিকা	লুই পাস্তুর	ফ্রান্স
শল্যচিকিৎসায় বীজ বারক পদার্থের ব্যবহার	লিস্টার	ইংল্যাণ্ড
কলেরার প্রতিষেধক	রবার্ট কোখ	জার্মানী
ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক	স্যার রোনাল্ড রস	ইংল্যাণ্ড
কালাজ্বরের প্রতিষেধক	উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	ভারত
পেনিসিলিন	স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং	ইংল্যাণ্ড
স্প্রু রোগের ওষুধ ও অরিও মাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক	সুব্বা রাও	আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়
পোলিও রোগের টিকা	জোনাস সাল্ক	ইংল্যাণ্ড
যক্ষ্মার প্রতিষেধক	ওয়াক্সম্যান	রাশিয়া

জ্যোতির্বিজ্ঞানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

পৃথিবীর আহ্নিকগতি	কোপর্নিকাস	পোল্যাণ্ড
	আর্যভট্ট	ভারত
অয়নচলন	হিপারকাস	গ্রীস
গ্রহ কক্ষের পরিচয়	জোহন কেপলার	জার্মানী
অভিকর্ষ	নিউটন	ইংল্যাণ্ড
	ভাস্করাচার্য	ভারত
চন্দ্রপৃষ্ঠ ও শনি এবং বৃহস্পতির উপগ্রহ	গ্যালিলিও	ইতালি
সিরিস নামক গ্রহাণু	পিয়াজী	সিসিলি
ইউরেনাস	হারশেল	ইংল্যাণ্ড
প্লুটো	পার্সিভাল লাওয়েল, টমবাউ	আমেরিকা

আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
নেপচুন	অ্যাভামস গ্যাল	
গ্রহের জন্মকথার আধুনিক মতবাদ	কার্লফন উইৎসেকার	জার্মান
ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব	হাবল জি. ই. লেমেটার	আমেরিকা বেলজিয়াম
সূর্য রশ্মির বিশ্লেষণ	মেঘনাদ সাহা	ভারত
আয়ন মণ্ডলের D স্তর	শিশির কুমার মিত্র	ভারত
ধূমকেতু সম্বন্ধে তথ্য	হ্যালি	ইংল্যাণ্ড

অঙ্কশাস্ত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার

জ্যামিতির কতকগুলি মূল সূত্র	থেলস ইউক্লিড পিথাগোরাস	প্রাচীন গ্রীস
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি নিয়ম	আর্যভট্ট	ভারত
বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়	মহাবীরাচার্য ব্রহ্মগুপ্ত	ভারত
দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্র	শ্রীধরাচার্য	ভারত
ক্যামকুলাস সম্বন্ধে সুপ্রাচীন উল্লেখ	ভাস্করাচার্য	ভারত
আধুনিক ক্যালকুলাস	নিউটন লাইবনিটস	ইংল্যাণ্ড জার্মানী
বৈশ্লেষিক জ্যামিতি	দেকার্ত ফেরমা	ফ্রান্স ফ্রান্স
সম্ভাব্যবাদ	পাস্কাল ফেরমা	ফ্রান্স ফ্রান্স